প্রথম সংস্করণ : মাঘ ১৩৫৬

প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক। ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলকাতা ৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : ইন্দ্রজিৎ নারায়ণ

অক্ষরবিন্যাস ও মুদ্রণ : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৬

সহজিয়াদের ব্রাত্যগান ও পল্লীসমাজ

১

হাজার বছর ধরে আমরা সকলেই পথ হেঁটেছি। এখনো হাঁটছি। পরেও হাঁটব। অবশ্য কেউ একা-একা হাঁটছি না। হাঁটিওনি একা-একা। আসলে প্রত্যেকটি মানুষেরই ব্যক্তিগত জীবনের অবসান তো আছেই। কিন্তু মানবপ্রবাহ দু'-দুটি বিশ্বযুদ্ধের পরেও যখন এখনো অব্যাহত আছে, তখন আপাতত মনে হয়, সেই প্রবাহ বুঝি অন্তহীন। 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়।' মানব তাহলে থেকে যাচ্ছে।

মানুষ থাকলে মানুষের কাজও থাকে। বিশ্বসংসারে মানুষের কাজের কোনো সীমাসংখ্যা নেই। অসংখ্য অগণিত কাজ মানুষের করতে হয়। বিশ্বলোকে মানুষের কাজের সেই ধারাবিবরণী ইতিহাসবেত্তা ও সমাজবিজ্ঞানীরা তথ্য ও পরিসংখ্যানভিত্তিকভাবে যতদূর সংগ্রহ করতে পেরেছেন, তার পরিধি খুবই স্বল্প। মাত্র হাজার দুই-আড়াই বছরের সেই বৃত্তান্ত। তার পূর্ববর্তী হিসাবনিকাশ অনুমানভিত্তিক।

আমরা যখন হাজার-হাজার বা লক্ষ-লক্ষ বছরের কথা বলতে থাকি, তার ভিত্তিটা আবেগমূলক। হাজার-হাজার বছরের তথ্যপ্রমাণভিত্তিক কোনো ইতিহাস মানুষের হাতে নেই। লক্ষ-লক্ষ বছর তো দূরের কথা। নেই, কেননা, মানুষের সেই দূর ইতিহাস রচনার সামর্থ্যও মানুষ তখনও অর্জন করেনি। শিলালিপি বা শিলাচিত্র পর্বতগাত্রে বা গুহায় যা কিছু পাওয়া গেছে অথবা মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে, তারও সময়সীমা বা কালপর্যায় নির্ধারণ চিরকালই অনুমাননির্ভর হয়ে আছে আর থাকবেও। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ্য, সিন্ধুনদের আঞ্চলিক কীর্তিকথা—এ সবই কি হাজার পাঁচেক বৎসর আগের মানবসভ্যতার ও সংস্কৃতির নিদর্শন? মিশরের পিরামিড তথা নীলনদের তীরবর্তী সভ্যতার বৃত্তান্তকেও নিশ্চিত সময়সীমায় নির্ধারণ সম-পরিমাণেই সুকঠিন কাজ। ভারতবর্ষ নামে উপমহাদেশের প্রেক্ষিতেও যদি দেখি তা হলেও মনে রাখা জরুরি যে, মহেঞ্জোদড়ো আর হরপ্পার অতি উন্নতমানের সভ্যতা-সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের বৃত্তান্ত কিন্তু ভারতে আর্য-আগমনের বেশ পূর্ববর্তী ঘটনা। বলা যেতে পারে, প্রাক্-আর্যযুগের এই দ্রাবিড় সংস্কৃতির অতি-উন্নতমান অন্-আর্য (other than Aryan) সভ্যতা সংস্কৃতিরই পরিচয়বহ।

ভারতে আর্য অনুপ্রবেশের পরেও দেখা যায়, পূর্বভারত তথা ভারতের পূর্বাঞ্চলে আর্যদের কর্তৃত্ব আদৌ প্রতিষ্ঠিত হলো না। বস্তুত, অদ্যাবধি সমগ্র উপ-মহাদেশের নিরিখে পূর্বভারত আর্য সংস্কৃতির কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়নি।

তাই রবীন্দ্রনাথ, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রমুখের আলোচনার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করার সময়ে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন প্রতিবাদী বাংলা (বঙ্গদেশ) তথা প্রতিবাদী পূর্বভারতের ভাবমূর্তিটিকেই সযত্ন সতর্কতায় উপস্থাপিত করেন।

যে শতাব্দী শেষ হতে চললো তারই প্রাক্-সাতচল্লিশে কবি সুকান্ত যখন লিখলেন—'বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত'—তখন আসলে তিনি চির-প্রতিবাদী বাংলার তথা পূর্ব ভারতের ইতিহাসের স্বরূপ উপস্থাপনার কাজটি করেছেন : যে-কাজ একজন মনন ও কল্পনাপ্রতিভাসম্পন্ন ইতিহাস-সচেতন কবির পক্ষেই সম্ভবপর।

আর্য-অভিভাবকেরা তরুণ আর্যদের পূর্বভারতে গমন ও বিবাহ নিষিদ্ধ করেছিলেন, এই তথ্য ইতিহাসভিত্তিক। কেন? কারণ, আর্য-অভিভাবকেরা হাজার চেষ্টাতেও পূর্বভারতকে তাঁদের কব্জায় আনতে পারেননি। তাই, তাঁদের ভয় ছিল, তরুণ আর্যরা পূর্বভারতে প্রবেশ করলে তাদের তথাকথিত 'আর্য'ত্ব আর থাকবে না। এমন কী তারা আর তাদের বিজিত অংশে অর্থাৎ আর্যাবর্তে ফিরেই যেতে পারবে না নিজস্ব আর্য-সংস্কৃতি নিয়ে। এখানে আরও একটি সামাজিক সাংস্কৃতিক দ্বান্দ্বিক সত্যের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

আর্য-সংস্কৃতির ধারক-বাহক প্রবক্তারা বুঝেছিলেন, অন্-আর্য বা দ্রাবিড় বা লোকায়ত সংস্কৃতির সঙ্গে সংঘাতে আর্যসংস্কৃতি বা জীবনদর্শনের জয় নিশ্চিত তো নয়ই বরং পরাজয়ের আশঙ্কাই বিদ্যমান। দাক্ষিণাত্য নিয়েও আর্যদের সমস্যা ছিল। উত্তর ভারতে তথা আর্যাবর্তেই তাদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সুরক্ষিত ছিল বলে মনে করতেন। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোয় বলা হয়েছে, এই ধরনের সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বে সমাজের অধিপতি শ্রেণীর সংস্কৃতিই বিজয় অর্জন করে। আর্যদের আশঙ্কা থেকেই প্রমাণিত , ভারতের পূর্বাঞ্চলেও তাঁরা সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার করতে পারেননি। পূর্বাঞ্চলের লোকায়ত সংস্কৃতির সতেজ প্রাণবন্ত স্বতোচ্ছল অপরাজেয় মৌলিক স্বভাব চিনে নিতে ভুল হয়নি আর্যদের।

স্বভাবতই তাই, বাংলাসাহিত্য লোকায়ত উৎসেই জন্মপরিগ্রহ করেছিল একহাজার বছর আগে। চর্যাপদগুলি অথবা গানগুলিতে লোকজীবনেরই বৃত্তান্ত। এই চর্যাগানগুলির ভাষাতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক, ভৌগোলিক ও জনপদ-জীবন সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যগুলি তাই শুধু বাংলা ও বাঙালির সঙ্গেই মেলে না, পূর্বভারতের অন্যান্য ভাষা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেও কম-বেশি সাদৃশ্য-যুক্ত। সেই কারণেই বাংলা-ওড়িয়া-অসমিয়া-হিন্দী প্রভৃতি এবং এগুলির সঙ্গে

সংশ্লিষ্ট যাবতীয় উপভাষাগোষ্ঠী ও উপজাতীয় ভাষা-সংস্কৃতির বিচিত্র-বিমিশ্র উপকরণ চর্যাগুলির বিভিন্ন ছত্রে সুড়ঙ্গগভীর সম্পর্কে মিলে-মিশে আছে। কেউ কারও গৌরব হ্রাসবৃদ্ধি করছে না।

জয়দেব বাঙালি না ওড়িয়া ছিলেন তা খুব বড়ো কথা নয়, তাঁর কাব্যের ভাষা ও রূপ, বক্তব্য ও জীবনদর্শন সমগ্র পূর্বাঞ্চলীয় মানস-গতিপ্রকৃতির পরিচয়বহ : এটাই আসল কথা। জয়দেবের ব্যবহৃত ভাষা বহিরঙ্গে সংস্কৃত, এতো সকলেরই জানা আছে কিন্তু জয়দেবের ভাষা সংস্কৃতের নির্মোক ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে লোকায়ত বাংলা-ওড়িয়া-অসমিয়া-হিন্দী প্রভৃতি ভাষার দিকে। লোক-প্রচলিত কৌতুকটি হলো : অনুস্বর ও বিসর্গ বাদ দিলেই গীত-গোবিন্দের ভাষা বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা! এই কৌতুকটির উৎসে আছে বাস্তব একটি সত্য।

'এতাস্তা দিবসান্ত ভাস্করদৃশো ধাবন্তি পৌরাঙ্গনাঃ···' প্রভৃতি 'সদুক্তি কর্ণা-মৃত'-এর একটি শ্লোকের বাংলা ভাবানুবাদ হলো এইরকম :

এই ছুটে চলেছে চাষী বৌ আর মেয়েরা, তাদের চোখ আর গায়ের রঙ এখন রোদ্দুরের তাপে রাঙা, কাঁধের উপর থেকে খসে পড়া শাড়ির আঁচল ঠিক করতে-করতে ব্যস্ত-সমস্ত তারা ছুটছে, কোন্ সকালে খেত-খামারের কাজে বেরিয়ে গেছে চাষী-কর্তারা, ক্ষুধার্ত চাষীকর্তারা পাছে তাদের আগেই ফিরে আসে ঘরে, সেই চিন্তায় লাফিয়ে লাফিয়ে চাষী বৌ-মেয়েরা পথ সংক্ষেপের চেষ্টা করছে, হাটে কিনবার জিনিসের দাম আঙুলের গাঁটে গুণতে ব্যস্ত তারা।

হাট-যাত্রী মেয়েদের এই বর্ণনা পাই আদিপর্বের বাঙালির সাহিত্যে। বাঙালির সাহিত্য, কিন্তু বাংলা সাহিত্য নয়। অর্থাৎ বাংলা ভাষায় সাহিত্য-চর্চার আগেও বাঙালির সাহিত্য-চর্চার নমুনা পাই সংস্কৃত ভাষায় এবং অবশ্যই প্রাকৃত আর অবহট্‌ঠেও। গবেষণা থেকে জানা গেছে, বাংলা ভাষা জন্মানোর অনেককাল আগে থেকেই এদেশের কবিরা সাহিত্যচর্চা করে এসেছেন। তাঁদের সংস্কৃতে সাহিত্য রচনার তিনটি ধারার কথা জানা যায়। দেখা যাচ্ছে, বড়ো কাব্য, নাটক এবং প্রকীর্ণ শ্লোক : সাহিত্যের তিনরকম ফর্ম বা আঙ্গিক-প্রকরণ তাঁরা ব্যবহার করেছিলেন।

বঙ্গভাষীদের সাহিত্য-সৃষ্টি-প্রতিভা লিরিকধর্মী, বহু পণ্ডিত গবেষকরা এমন কথা বলে থাকেন। ছোটো-ছোটো গীতধর্মী কবিতা রচনায় তাঁদের প্রতিভার স্ফূর্তি প্রথম থেকেই লক্ষণীয়। যাকে বলে প্রকীর্ণ শ্লোক অর্থাৎ যেগুলি

মিতায়তন ও গীতধর্মী, কোনো-কোনো পণ্ডিত যাকে বলেছেন : চুটকি, কবিতা, সে ধরনের লেখায় সেই প্রথম পর্বের কবিরাও প্রথম শ্রেণীর প্রতিভারই পরিচয় দিয়ে গেছেন। বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি হিসেবে যেমন এই ধরনের নিদর্শন পাওয়া যায়, তেমনি অন্তত ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগে রচিত হয়েছিল এমন দু-দুটি বড়ো কবিতা-সঙ্কলনও পাওয়া গেছে।

প্রথম সঙ্কলনটির নাম মূলে পাওয়া যায়নি। কেননা, একটিমাত্র পুঁথি যা নেপালে পাওয়া গিয়েছিল, তা ছিল খণ্ডিত। এফ ডবলিউ টমাস সম্পাদিত বইটি প্রকাশ করেন এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯১২ সালে। সম্পাদক সঙ্কলনটির নাম দেন : কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত কবিতাগুলির রচয়িতাদের নাম থেকে স্পষ্ট, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন নিশ্চিতভাবে বাঙালি। বীর্য মিত্র, রতি পাল, বিনয় দেব, ভ্রমর দেব, শ্রীহর্ষ দেব, ধরনী ধর, শ্রীধর নন্দী : এইরকম কয়েকটি নাম। এমন বাঙালি নাম অবশ্য আরো অনেক আছে।

দ্বিতীয় সঙ্কলনগ্রন্থ 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সমাপ্তির তারিখ হলো ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১২০৭ সাল। এই সঙ্কলনের লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন, বাসুদেব সেন, ধোয়ী, উমাপতি ধর, গোবর্ধন আচার্য, কমল গুপ্ত, যজ্ঞ ঘোষ, দিবাকর দত্ত, কালিদাস নন্দী, ত্রিপুরারি পাল প্রমুখ কবিদের নাম থেকেই বোঝা যায়, তাঁরা ছিলেন বাঙালি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতারাই জানিয়েছেন, সেকালের কবিরা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেননা। বৈদ্য, কায়স্থ, নট, কেওট ইত্যাদি সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষও কবিতা-রচনায় নিজেদের সুচিহ্নিত করেছিলেন।

এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, চারটি অনুচ্ছেদ আগেই উদ্ধৃত, লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ পণ্ডিতাগ্রগণ্য কবি শরণের শ্লোকাংশ ও শ্লোকটির বাংলা ভাবানুবাদে শ্রমজীবী মেয়েদের যে-অনবদ্য চলমান চিত্র ফুটে উঠেছে, তা' কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম নয়। বাঙালির লেখা আদিপর্বের সাহিত্যে শুধু অভিজাতবর্গের জীবন-চিত্রই নয়, জনজীবন তথা শ্রমজীবী মানুষের ছবিও পাই।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে শ্রমজীবী নরনারী, শ্রমিক-কৃষক নরনারীর চিত্র-চরিত্র তেমন অপ্রতুল নয়। যদিও তার পরিমাণ ও প্রকৃতি কোনোটাই আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে না। বস্তুত, গত শতাব্দীতে, ঊনবিংশ শতকের আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও শ্রমজীবী জনসাধারণ তাঁদের উপযুক্ত স্থান ও মর্যাদা পাননি , এ কথা সকলেই মানবেন। এর কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন না-হলেও এ বিষয়ে তেমন যথাযোগ্য আলোচনা-গবেষণাও কিন্তু হয়নি। এখানেও সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিষয়টি বিস্তারিত না-করে উল্লেখমাত্র করা হলো।

পক্ষান্তরে লক্ষণীয়, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে তথা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে (নবম-দশম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী) নানা রকম সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ কিছুকিঞ্চিৎ আত্মপ্রকাশের অবকাশ পেয়েছে। মনে রাখতে হবে, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই 'ম্যাটার অব বেঙ্গল' অর্থাৎ লোকসাহিত্যগত ও লোকসাংস্কৃতিক বিষয় ও প্রেরণাকে 'ম্যাটার অব স্যান্‌সক্রিট'-এ রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ জনসাহিত্যকে শিষ্ট তথা অভিজাত সাহিত্যের মোড়কে পুরে তার 'ধাত' পরিবর্তনের অপচেষ্টা চলতে থাকে। এই 'উলট পুরাণে'র যুগে, উলটোমুখী প্রবণতার কবলে পড়ে যায় মূলত যা জনসাধারণের সাহিত্য, জনসাধারণের সংস্কৃতি। তথাপি সাধারণ মানুষ কোনোক্রমে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রবল প্রভাবের যুগে ভালো-মন্দ দু'রকমের ফলাফলই লক্ষণীয় হয়। তার কারণ আছে। আগেই বলেছি, সে কারণ অন্বেষণে ও বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়ার উপযুক্ত পরিসর এখানে নেই। এখানে শুধু বিষয়টি উল্লেখ করলাম। কেন না, বিষয়টি ভেবে দেখার যোগ্য এবং আধুনিক সাহিত্য-বিচারে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

এই ছুটে চলেছে চাষী বৌ আর মেয়েরা, তাদের চোখ আর গায়ের রঙ এখন রোদ্দুরের তাপে রাঙা···কোন্ সকালে খেত-খামারের কাজে বেরিয়ে গেছে চাষী-কর্তারা···

তারও আগে 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র কোনো-কোনো কবিতায় বাঙালি জন-জীবনের বিশ্বস্ত চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে, দেখা যাচ্ছে। গ্রামীণ জীবনধারায় তার দারিদ্র্য ও সমস্যা এবং তারই ফাঁকে-ফাঁকে ছোটো-ছোটো সুখস্বপ্নের ছবি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। অধ্যাপক সুকুমার সেন বিষয়টির বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ না নিলেও, যথার্থ কারণ নির্দেশে যথোচিত সযত্ন ও সচেষ্ট না হলেও একটি অশেষ গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন এই সূত্রে : 'ভারতীয় সাহিত্যে এ বর্ণনা অভিনব'।

বিশেষজ্ঞের এই মন্তব্য থেকেও স্পষ্ট, ভারতীয় সাহিত্য ব্যাপকভাবে (অর্থাৎ বাঙালির সাহিত্যসমেত) দ্বাদশ শতাব্দীর কালেই শিষ্ট তথা অভিজাত সাহিত্যের প্রবক্তাদের প্রভাবে জনজীবনের বস্তুনিষ্ঠ রূপায়ণের দায়িত্ব অস্বীকারের ঐতিহ্য প্রায় পাকা করে ফেলেছিল। অধ্যাপক সেন যাকে বলেছেন, 'দারিদ্র্যের অতিরঞ্জিত চিত্র' তাই যে সমকালীন ভারতীয় জনজীবনের যথার্থ ছবি, সে কথা আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসগুলিতে এখনও লেখা হয়

না, তার কারণ সমকালীন আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে কৃষকের বেদনা-বঞ্চনার বারোমাসের ছবিটি 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র নিম্নোক্ত শ্লোকটির মধ্যেই পাওয়া যায় :

কাঠ খসে-খসে পড়ছে, দেওয়াল গলে পড়ছে, চালের খড় জায়গায় জায়গায় জট পাকিয়ে গেছে, আমার জীর্ণ কুটির কেঁচোর শিকারী ব্যাঙে ভর্তি হয়ে গেছে (চলৎকাষ্ঠাং··· শ্লোকটি দ্রষ্টব্য)

কিন্তু চাষীর ঘরে ধানকাটার অব্যবহিত পরবর্তী সাময়িক আনন্দোজ্জ্বল ছবিটিও সেকালের বস্তুনিষ্ঠ কবিরা তুলে ধরেছেন, দারিদ্র্য-দুঃখ-বিলাসের অবসর তাঁদের সত্যিই ছিল না, তাঁরাও তো চেয়েছেন মানুষের সুখী-সচ্ছল জীবনই—

ধানকাটার পরে চাষীদের আনন্দ। নীলোৎপলের সংযোগে নবপ্ররূঢ় শ্যামল যবাঙ্কুর খেতের সীমানা দীর্ঘায়িত। গাই-বলদ-ছাগল ঘুরে ফিরে নতুন পোয়াল খুশিমতো খাচ্ছে। আখমাড়াই কলের ঘরঘর শব্দে মুখরিত গ্রামগুলি গুড়ের গন্ধে আকুল (শালিচ্ছেদসমৃদ্ধ হালিকগৃহাঃ···ইত্যাদি শ্লোকটি দ্রষ্টব্য)।

কাঠ খসে-খসে পড়ছে, দেওয়াল গলে পড়ছে, চালের খড়···আমার জীর্ণ কুটির···। ধানকাটার পরে···আখমাড়াই কলের ঘরঘর শব্দে মুখরিত গ্রামগুলি গুড়ের গন্ধে আকুল।···

অভিজাত ভারতীয় সাহিত্যে স্বীকৃতি পাওয়ার বাসনায় সেকালের বাঙালি কবি ও বুদ্ধিজীবিগণের একাংশ সংস্কৃত ভাষায় রচিত শিষ্ট সাহিত্য অনুশীলনে ও সাহিত্য-রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। বাংলা ভাষা জন্মানোর আগে এদেশে 'ভদ্র' ও 'শিষ্ট' জনের সাহিত্যচর্চার 'সাধুভাষা' এমনিতেই ছিল সংস্কৃত। সংস্কৃতই ছিল উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলের সাহিত্যে ব্যবহার্য ভাষা। সেই 'ভদ্র' ও 'সাধু' সাহিত্যের লেখক-পাঠকও ছিলেন পণ্ডিতসমাজ।

এই 'পণ্ডিতি, সাহিত্যের লোকদের সংস্কৃতচর্চার আতিশয্য ও প্রাকৃত ভাষাচর্চার অনীহা লক্ষ করে কবি রাজশেখরের ব্যঙ্গোক্তি ফুটেছে 'পঠন্তি সংস্কৃতং সুষ্ঠু কুণ্ঠা প্রাকৃতবাচি চ' ইত্যাদি শ্লোকাংশে, যার বাংলা ভাবানুবাদ হলো :

বারাণসীর পূর্বে মগধ প্রভৃতি দেশবাসীরা সংস্কৃত সুন্দরভাবে পড়ে কিন্তু প্রাকৃত বাক্যে তাদের জিভ আড়ষ্ট হয়। নিজেদের অধিকারে জলাঞ্জলি দিয়েই বলছি, হয় গৌড়বাসীরা লোকগাথা রচনা ত্যাগ করুন, নয়তো সারস্বতচর্চা ভিন্ন পথে চালিত করুন।

আসলে ভারতবর্ষে বিকাশমান লোকায়ত দর্শনের পুষ্ট ধারাটিকে শাসক-

শ্রেণীগুলি সমূলে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। লোকায়ত দর্শনের প্রাণশক্তি ও বলিষ্ঠতা লোকসাহিত্যেও প্রচুর মাত্রায় সঞ্চারিত হয়েছিল। শাসকশ্রেণীগুলি বুঝেছিল, শিষ্ট ও অভিজাত দর্শন-সাহিত্য-সংস্কৃতির বেড়াজালেই ঘিরে ধরতে হবে লোকায়ত সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শনকে। এক্ষেত্রেও পরিণামে তাই দেখি, অধিপতি শ্রেণীর ধ্যানধারণাই একটি বিশেষ যুগের ধ্যানধারণা রূপে অবশেষে আধিপত্য বিস্তার করেছে। 'রুলিং ক্লাসে'র 'আইডিয়াজ'ই 'রুলিং আইডিয়াজ'-রূপে দেখা দিয়েছে।

কিন্তু লোকসাধারণ, শোষিত-বঞ্চিত শ্রেণী সংগ্রামের ময়দান কোনোকালেই পরিত্যাগ করে যায় না। তাই দেখি, দ্বাদশ শতাব্দীর ধারে কাছে রচিত ও পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত সরহপাদের দোহাকোষ, কাহ্নপাদের দোহাকোষ ও তিল্লোপাদের দোহাকোষ, তিন-তিনটি দোহাকোষেই সাধারণভাবে তথাকথিত শাস্ত্রবাক্য এবং উচ্চতর বর্ণের অনুশীলিত ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে অনাস্থা ঘোষিত হয়। তিল্লোপাদের দোহা থেকেই উদ্ধৃত করছি :

দেব ম পূজহু তিত্থ ন জাবা।
দেবপূজাহি ন মোক্খ পাবা।

অর্থাৎ, দেবতার পূজা করো না, তীর্থে যেয়ো না, দেবপূজায় মোক্ষ পাওয়া যায় না।

ধনিক-বণিক-অভিজাতদের তথাকথিত ধর্মশাস্ত্র ও বচনাদি যে জন-সাধারণকে ধোঁকা দিয়ে শাসকশ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা ও সিদ্ধিরই কৌশলমাত্র, সেই প্রতারণাও লোকায়ত দর্শন-সাহিত্যের প্রবক্তা ও প্রতিনিধিরা সঠিক অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, আজ থেকে আটশো বছর আগেও :

কজে বিরহিঅ হুঅবহ হোমেঁ।
অকখি উহাবিঅ কড়ুঅঁ ধুমোঁ।
ঘরহী রইসী দীবা জালী।
কোনহি বইসী ঘণ্ডা চালী॥
অক্খি নিবেসী আসন বন্ধী।
কন্নেহী খুসখুসাই জন ধন্ধী॥

অর্থাৎ আসল কথা, 'জনাধন্ধী' মানে জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়া। সম্পূর্ণ বাংলা ভাবানুবাদ হলো : বাস্তব সংসারের কাজকর্ম ছেড়ে হোমযজ্ঞযাগের আগুনে ধোঁয়া তৈরি করে, ঘন্টা বাজিয়ে, আসনবন্দী হয়ে দৃষ্টি-নিবদ্ধ করে, কানে কানে খুসখুস গুজগুজ করে মন্ত্র দিয়ে জনসাধারণকে ওরা ধোঁকা দেয়।

সুতরাং :

> দেবতার পূজা করো না, তীর্থে যেয়ো না, দেবপূজায় মোক্ষ পাওয়া যায় না·· । কী হবে ধূপদীপ জ্বেলে? যাগযজ্ঞের ধোঁয়ায় চোখ অন্ধ করে?

বাংলা ভাষা পূর্ণাঙ্গ রূপলাভের আগে, বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করার আগে, সংস্কৃতে, প্রাকৃতে ও অবহটঠে বাঙালির সাহিত্যচর্চার যে-সব নমুনা পাওয়া যায়, তা থেকে এমনি আরো অনেক দৃষ্টান্ত চয়ন করা সম্ভব। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য দৃষ্টান্ত ও তথ্যাদিসহ আরো বিস্তারিত করাও প্রয়োজন।

তার আগে আমার বক্তব্যের সারাৎসারটুকুর দিকে কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হোক। পাঠক অনুভব করুন : সমগ্র ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গ ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর প্রথম পর্যায়ের সাহিত্যচর্চাতেও সেকালের কবিরা জনমুখী তথা লোকায়ত জীবনদর্শনকেই তুলে ধরেছেন, শ্রমজীবী নরনারীর জীবনের বস্তুনিষ্ঠ জীবনচিত্রকেই সাহিত্যরসে সঞ্জীবিত করেছেন, শিল্পের ফ্রেমে ধরে দিয়েছেন। কিন্তু যতই করুন, 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'য় বিধৃত মার্কস-এঙ্গেলসের সমাজবীক্ষার যাথার্থ্য এক্ষেত্রেও সত্য-রূপেই প্রমাণিত : শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শাসকশ্রেণীগুলির ধ্যানধারণাই আধিপত্য বিস্তার করে। তাই দেখা যায়, শাসকশ্রেণীগুলির কাছে বিবিধ সুযোগ-সুবিধা-স্বীকৃতি-প্রতিষ্ঠা-পুরস্কার প্রভৃতি লাভের লোভে আকৃষ্ট সেকালের কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবি-গণের বড়ো একটি অংশের সুবিধাবাদী ভূমিকা এবং শাসকশ্রেণীর প্রচার-মাধ্যমের দৌলতে ক্রমশ ভদ্র, শিষ্ট ও অভিজাত দর্শন-সাহিত্যই লোকায়ত দর্শন ও লোকসাহিত্যকে খর্ব করে অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। দর্শন-সাহিত্যের স্বাভাবিক স্রোতটাকে উলটো দিকে প্রবাহিত করে দেওয়া হয়েছিল শাসকশ্রেণীগুলির স্বার্থে : আজ আমাদের কাজটা হলো, উলটো ও অসত্যমুখী সেই স্রোতকে সোজাসুজি স্বাভাবিক সত্যের খাতে চালিত করা।

'দোহাকোষ'-এর পদগুলি জীবনবোধের ঐশ্বর্যে এবং প্রকাশরূপের সাবলীলতায় সাহিত্যানুরাগীকে মুগ্ধ করবে। শিষ্ট ও অভিজাত আর্য-সংস্কৃতির চেতনালোক থেকে অবহট্ঠে রচিত বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সহজিয়া ও শৈবযোগী নাথ-পন্থী সিদ্ধাচার্যদের এই সব পদ স্বভাবতই ভিন্নতর একটি পরিচয় তুলে ধরে। এই সব পদ একাল পর্যন্ত সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতাদেরও মন ভুলিয়েছে। অধ্যাপক সুকুমার সেন থেকে অধ্যাপক গোপাল হালদার সকলেই উদ্ধৃত করেছেন এমন কিছু পদ—যেগুলি পাঠযোগ্যতা ও তাৎপর্য, সাহিত্যরস, জীবনবোধ ও সাবলীল রূপরীতি—সবদিক থেকেই অসামান্য।

এই প্রসঙ্গেই পণ্ডিতাগ্রগণ্য মার্কসবাদী স্রষ্টা ও সমালোচক রাহুল সাংকৃত্যায়নের মূল্যায়নও প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু রাহুলজীর মূল্যায়ন উপস্থাপিত করার আগে দোহাকোষ-এর কয়েকটি পদের বিষয়বস্তু ও জীবনবোধ একটু যাচাই করে নেওয়া যাক :

কিং তো দীবেঁ কিং তো ণিবিজ্জঁ
কিং তো কিজ্জই মন্তহ সেবৰ্ঁ।
কিং তো তিত্থ-তপোবন জাই
মোক্খ কি লব্‌ভই পাণী হ্ণাই॥

এই কবি যে একেবারে 'মাটির কাছাকাছি' কবি তাতে আর সন্দেহ থাকে না। কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন সাধারণ মানুষের সহজ সরল ভাষায় এখানে জীবনাভিজ্ঞতার অনাবৃত প্রকাশ—

কী হবে তোর দীপ জ্বেলে? কী হবে তোর নৈবেদ্য সাজিয়ে? কী হবে তোর মন্ত্রতন্ত্র আউড়ে? তীর্থে তপোবনেই বা কেন তুই যেতে চাস্? জলে স্নান করলেই কি তোর মোক্ষ লাভ হবে?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাহুল সাংকৃত্যায়ন কোশল থেকে যে সব অমূল্য পুঁথি উদ্ধার করে এনেছিলেন, তার মধ্যেই ছিল সরহপাদ দোহাকোষ। এই দোহাকোষ থেকে সরহ-র জীবনদর্শন সুস্পষ্ট। মন্ত্রতন্ত্র ব্রাহ্মণ পুরোহিতসহ যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠানের অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকট করেই শুধু সরহ নিরস্ত হননি, যে তীব্র ব্যঙ্গবাণে ধর্মের নামে সমস্ত রকম আচারবিচারমূলক বহিরঙ্গকে তিনি ধিক্কৃত করেছেন, তার স্বরূপ বুঝেই রাহুল স্পষ্টভাষায় বলতে পেরেছিলেন :

'সরহ বিদ্রোহী থে। রাজনীতিক বিদ্রোহী নহী, বিচারোঁ কী দুনিয়াকে বিদ্রোহী ঔর কিতনে কী অংশো মে সামাজিক বিদ্রোহী ভী।'

সরহ সুখদুঃখ মিলনবিরহপূর্ণ নরনারীর প্রাত্যহিক সামাজিক জীবনকে ধর্মীয় বা কোনোরকম আধ্যাত্মিক সাধনা বা মোক্ষ লাভের মোহে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। লিখেছেন :

এই ঘরসংসারকে
দু'পায়ে দলিত করো না
এই জগতকে তুচ্ছ করে
যাবে কোথায়?

এই জীবনমুখী সমাজ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সরহ তাঁর সমকালের বিবিধ নিষ্ঠুর সামাজিক পীড়ন-লাঞ্ছনা-জাতিবৈষম্য প্রভৃতির বিরুদ্ধতা

করেছিলেন এবং মন্ত্রতন্ত্রসহ যাবতীয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে বর্জনের আহ্বান জানাতে লেখনীধারণ করেছিলেন।

এই দৃষ্টিভঙ্গি-প্রসূত পদ রচনায় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ ছিলেন অগ্রণী, তার আর্থসামাজিক পটভূমিও বিদ্যমান। ব্রাহ্মণ্য তথা আর্যসংস্কৃতির বিচারে অন্ত্যজ ব্রাত্য মানুষদের পক্ষ থেকেই জনসাধারণ বলতে যাঁদের বোঝায়, তাঁদের পক্ষ থেকেই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ জেগেছিল সমাজে-সাহিত্যেও।

এই কবিরা পণ্ডিতজনের ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃতে না-লিখে জনসাধারণের বোধ্য ভাষায় তাঁদের মনোভাব ও মতবাদ প্রচার করেছিলেন। জাতপাতের পীড়ন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল বলেই প্রতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আত্মপ্রকাশও অপ্রতিরোধ্য হয়েছিল। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের মধ্যে এই প্রতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির রূপায়ণে রাহুলজী সরহকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেছিলেন এবং লিখেছিলেন সরহ্-কে কেন তিনি সর্বোচ্চ বলে মনে করেন :

'উন্‌হোনে অপনে 'দোহাকোষ চর্যাগীতি' মে পহিলেঁ
১২ দোহা মে আপনে সময়কে ধার্মিক সম্প্রদায়োঁ ঔর
উনকে বিচারোঁ কা খণ্ডন কিয়া হ্যায়।'

আধ্যাত্মিক মুক্তি বা মোক্ষলাভের আশায় যে সব মানুষ জাতপাত ছোঁয়াছুয়ি আপন-পর ভেদজ্ঞান নিয়ে আচারবিচার নিয়েই মত্ত হয়ে ওঠে, মুক্তি দূরে থাক, তারা তো নিজেদেরই বদ্ধ করে অসুস্থ সংকীর্ণ এক ঘেরাটোপের মধ্যে। তাই সরহ লেখেন :

'এ আমার আপন' 'ও হলো পর'
এই ভাবনা যার
বিনা বন্ধনেই সে তো বদ্ধ !
মুক্তি? মুক্তি কোথায় তার?

সুযোগ এলেই ব্রাত্য, মন্ত্রহীনদের পক্ষ থেকে সরহ মন্ত্রতন্ত্র আর ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের খুব এক হাত নিয়েছেন কলমের খোঁচায় :

ফুসফুস গুজগুজ মন্ত্র পড়া কানে
আসল মতলবটা জানে সবাই জানে
অভিষেক দিয়ে গুরুদক্ষিণা আদায়
এইভাবে লোক-ঠকানো, হায়, হায়, হায়!

আবার ধর্মভীরু জনগণকে বোকা বানিয়ে ধোঁকা দিয়ে নিজেদের যারা খুব চালাক ভাবে, তাদের সম্পর্কে সরহ-র বক্তব্য হলো :

ব্রাহ্মণরা আসলে হলো ভেড়ুয়া
বোকা বলেই চতুর্বেদ আওড়ায়।
কী মানে তার মাটি জল আর কুশ নিয়ে
বিড় বিড় করে অর্থহীন মন্ত্রোচ্চারণ?

আক্রমণ দারুণ হয়ে ওঠে, যখন মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসীরা নগ্নতাকেই 'মুক্তি'-র শর্ত হিসেবে ধরে নিয়ে গর্ব করে :

নগ্ন থাকাই যদি মুক্তির শর্ত হয়
তাহলে শিয়াল কুকুরের মোক্ষলাভ
তো প্রশ্নাতীত
... ...
মস্তকমুণ্ডনেই যদি মোক্ষলাভ হয়
যুবতীর নিতম্বই তবে মুক্তির সংজ্ঞা।

সরহ-র দোহাকোষে কিংবা বাঙালির লেখা সংস্কৃত ও অবহট্‌ঠ রচনায় ধর্মতত্ত্ব, পাণ্ডিত্য, জাতপাত প্রভৃতির অজুহাতে সাধারণ মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার, শোষণ-পীড়ন করার বদলা, ব্রাত্য-মন্ত্রহীনদের হয়ে সাধারণ মানুষের কবিরা এইভাবেই নিয়েছেন।

এইসব ভাব ও সুর বিচ্ছিন্ন বা প্রক্ষিপ্ত বলে ভাবলে ভুল হবে। এ সব অ-বাংলা সাহিত্য ভাবলেও আদৌ ঠিক হবে না। বাংলা ভাষা অর্থে সেই যুগের সমগ্র পূর্বাঞ্চলের ভাষা বুঝতে হবে। পূর্বভারত বরাবরই বিদ্রোহী। ভারতসংস্কৃতির ইতিহাসের যাঁরা মনোযোগী ছাত্র তাঁরা এই পূর্বভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির লোকায়ত ধারাটিতে প্রাগার্য ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করেন। এই ভাবে দেখলে, মহেন-জো-দাড়োর শিল্পভাস্কর্য যোগ-সাধনার চিত্রাদি এবং সেই সব ধ্যানধারণা ও প্রাচীনতম সংস্কৃতির অবশেষ দেশের জনজীবন থেকে কখনও নির্মূল হয়ে যায়নি।

উচ্চবর্ণ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সমস্ত অবজ্ঞা ও সচেতন অপচেষ্টা সত্ত্বেও এই লোকায়ত ধারা শেষ পর্যন্ত, অদ্যাবধি আত্মরক্ষা করে এসেছে। শিক্ষিতজনদের অজ্ঞাতসারেই এই ভাবধারা তথা জীবনদর্শন ক্রমশ গুহ্য-সাধনার গভীরে প্রচ্ছন্নরূপে আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হয়েছে। এই লোকায়ত ঐতিহ্য চর্যাপদগুলি থেকে সহজিয়া সাধনায়, চণ্ডীদাস প্রমুখের পদাবলী থেকে বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে, পরবর্তীকালে বাউল গান পর্যন্ত অবলীলায় প্রসারিত হয়ে এসেছে।

সিদ্ধাচার্যদের রচিত অবহট্‌ঠ সাহিত্যের সামান্য পরিচয় এই সূত্রে গ্রহণ করা গেল, কেননা, দেশের জনসাধারণের ভাষায় সাহিত্য রচনার গোড়ার যুগেও তাঁরাই বিদ্যমান। সেই চর্যাগীতিগুলিও অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে যেগুলিকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যরূপে ধরা হয়, রচনা করেছিলেন এই সিদ্ধাচার্যরাই। তাঁরা গোষ্ঠীগতভাবে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকলেও জনজীবনেরই কাছাকাছি ছিলেন।

প্রাচীন সাহিত্য অর্থাৎ চর্যাপদগুলির পরেই মধ্যযুগে যে ভক্তিধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখা যাবে, তার উৎসমুখ সর্বভারতীয়, তার প্রেরণা ভারতীয় লোকায়ত সাধনা ও সংস্কৃতির গভীরে নিহিত। চৈতন্যই অবশেষে সর্বভারতীয় মূলধারার অর্থাৎ লোকায়ত ধারার সঙ্গে বঙ্গীয় লোকায়ত ধারার সমন্বয় পর্ব সম্পন্ন করেন।

চর্যাগানগুলিতে যে আঞ্চলিক প্রাত্যহিক জীবন ও জীবিকার পরিচয় পাওয়া যায় তা ছড়িয়ে আছে বাংলা সহ প্রতিবেশী প্রদেশগুলিতে আজও। নৌকা-পারাপার, ঝুড়ি বোনা প্রভৃতি বেতের কাজ টিলার পরে বাসস্থান নির্মাণের চিত্র, সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলের জীবন যাপনের চিত্র এবং তারই সঙ্গে যে পরিচয় পাওয়া যায় সমস্তই লোকায়ত ও শ্রমজীবী মানুষের বিশ্বস্ত আলেখ্য।

নরনারীর আনন্দ-উচ্ছল প্রেম ও প্যাশনমূলক যৌন জীবনের অনুপুঙ্খ শিল্প-কীর্তি কোনারকের মন্দির গাত্রে অথবা অজন্তা ইলোরায় কালজয়ী সৃষ্টিকর্মরূপে আজও বিশ্বকে মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে। সংস্কৃত সাহিত্যেও কালিদাসের কাব্যে তা আছে। এই সত্যটি অনুধাবনযোগ্য যে বলিষ্ঠ লোকায়ত এই জীবন-শিল্পও আর্যরা গ্রহণ করেছেন অন্‌ আর্য উৎস থেকে।

তাই, শুধু চর্যার কোনো-কোনো গানে নয় বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে নরনারীর প্রবল গভীর জীবনাসক্তি অলজ্জ স্পষ্টতায় মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় আত্মপ্রকাশ করেছে। মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যেও বয়ঃসন্ধির রাধা যে অনুপুঙ্খ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে জীবন রসরসিকের সহৃদয় রসপিপাসাকে চরিতার্থতায় পূর্ণ করে দেয় তারও তুলনা মেলা ভার। পাশাপাশি প্রার্থনার পদেও বিদ্যাপতি অসামান্য। এই সূত্রেই বাংলার চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস-বলরামদাসের অসাধারণ পদাবলী লোকায়ত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভাবনা-বেদনারই চিরকালীন দলিল হয়ে আছে। সর্বদেশের সর্বকালের উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি রূপে বৈষ্ণবপদ-সাহিত্য আগামী বহু হাজার বছর জুড়ে পরিকীর্তিত হবে যেমন হয়ে আসছে বিগত কয়েক শতাব্দী ব্যাপী।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই মুসলিম জীবনাবেগ বাংলায় তথা পূর্ব ভারতে অনুপ্রবিষ্ট হলো। আর্যদের মতোই সেই জীবনাবেগ ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মেই আক্রমণকারীর বেশেই এসেছিল কিন্তু ক্রমশ বিবিধ সামাজিক-রাজনৈতিক কারণে এ দেশেরই দলিত-লাঞ্ছিত মানুষের একটি বৃহদংশ ইসলামকে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রকাশের মাধ্যম রূপে অবলম্বন করলো। অতঃপর কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই সমগ্র ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ও বাংলাসহ পূর্ব ভারতে অন্-আর্য সংস্কৃতি হিন্দু-মুসলমানদের যুগ্মসাধনার ফলশ্রুতিরূপে নবীনতর রসে ও অবয়বে আত্মপ্রকাশ করলো। এখানেই সুফী সাধনার ভূমিকা ও দানকে এবং দক্ষিণ ভারতের আলোয়ার সম্প্রদায়ের ভক্তিবাদ তথা Bhakti-cult-কে পূর্বভারতের অন্-আর্য গোষ্ঠী আত্মস্থ করে নিল অচিরেই।

বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যযুগেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বস্তুত লোকায়ত চেহারা ও চরিত্র অর্জন করলো, খেতুরিতে মহামেলার প্রবর্তন তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। চৈতন্যকে কেন্দ্র করে 'ভক্তিতেই মুক্তি'র আপ্তবাক্য শ্লোগানের মতো জনপ্রিয় হলো। অর্থাৎ অভিজাত-ধনী-প্রভুশ্রেণীর হাতে দলিত-নির্যাতিত মানুষের আত্ম-রক্ষার শ্লোগান হয়ে উঠল। চৈতন্যজীবনীকাব্যগুলিতে সমকালের ধর্মকেন্দ্রিক সমাজজীবন প্রতিফলিত হলো এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিত মহাকাব্যপ্রতিম চৈতন্যজীবনী 'চৈতন্যচরিতামৃত' নামে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের আকর-গ্রন্থরূপে গড়ে উঠল।

বৈষ্ণব সাহিত্য শিষ্ট ও আধ্যাত্মিকমুক্তিসন্ধানী ভক্তগোষ্ঠীর অবলম্বন হয়ে উঠেছিল ষোড়শ শতাব্দীতে কিন্তু লোকায়ত জীবনদর্শনের পক্ষপাতী অন্-আর্য জনগোষ্ঠী এত সহজেই পরাভব মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যযুগ পর্যায়ে মুসলমান শাসকগণের অনুরোধে বিশেষত হোসেন শাহ বাংলার শাসনকর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে তাঁর এবং তাঁর শাসকপ্রতিনিধিদের আগ্রহে ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারতের ভাবানুবাদ হতে থাকে দেশীয় কবিদের তারা দেশীয় লৌকিক ভাষায় অর্থাৎ বাংলা ভাষায়। ভাবানুবাদ যাঁরা করেছেন, তাঁরা সকলেই কোনো-না-কোনো-ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, 'লোক নিস্তারিতে' তাঁরা বাংলা ভাষায় মূল কাব্যগুলির অনুবাদকর্মে হাত দিয়েছেন। বৈষ্ণব তত্ত্ব ও দর্শনের দিকেও তাঁরা মন দিয়েছেন, সে তো আগেই দেখা গেছে।

এই সমগ্র সাহিত্যপ্রচেষ্টাকে আচার্য সুনীতিকুমার বলেছেন 'Matter of Sanskrit'—কিন্তু পাশাপাশি মঙ্গলকাব্যধারা—মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্ম-

মঙ্গল কাব্যপ্রবাহ সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী রচিত হয়ে চলেছে এবং বিভিন্ন ধারার লৌকিক চেতনাসমৃদ্ধ গীতিকা প্রভৃতি—এগুলিকে সুনীতিকুমারের ভাষায় 'Matter of Bengal' বলা যেতেই পারে। এইসব কাব্যের আখ্যানে সাধারণ বৃত্তির ও পেশার মানুষজনকেই নায়ক-নায়িকার স্থলাভিষিক্ত দেখতে পাই। দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দ চক্রবর্তী প্রমুখ চণ্ডীমঙ্গলকাব্য ধারার কবিদের রচনায় তো ব্যাধ কালকেতুকেই নায়করূপে দেখা যায়।

রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ তথা ভাবানুবাদগুলিতে তো মূল আখ্যান-গুলির বিশুদ্ধ বঙ্গদেশীয় সংস্করণই লক্ষণীয়। মূল কাব্যগুলির চরিত্রসমূহ ও কাহিনীবিন্যাস সমস্তই বিশুদ্ধ বাঙালিত্ব-চিহ্নিত। রাম-সীতার বর্ণিত বিবাহ-পদ্ধতিও বাঙালি বিবাহরীতির অনুসারী। বস্তুত, কোথাও আর্য-সংস্কৃতির প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত নয়। অর্থাৎ সুনীতিকুমার অভিহিত Matter of Sanskrit আর Matter of Bengal-এর পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান দেখা যাচ্ছে না, দ্বন্দ্ব-সংঘাতই চলছে এবং সর্বত্র Matter of Bengal-এর আপেক্ষিক প্রাধান্যই চোখে পড়ছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্যের তাত্ত্বিক-দার্শনিক ভিত্তি ক্রমশ শিথিল হয়ে গেল। চট্টগ্রাম-রোসাঙের মুসলিম কবিদের রচনায় রোমান্টিক আখ্যানকাব্যের অবতারণা ও বিকাশ সম্ভব হলো দৌলত কাজী সৈয়দ আলাওল-এর কাব্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে। সৈয়দ সুলতান ও সৈয়দ মর্তুজা প্রমুখ পদকর্তার কথাও স্মরণ করা উচিত। বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঘটনা। বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে পাঁচ শতাধিক মুসলমান কবির গৌরবদীপ্ত অবস্থান। এ-বিষয়ে প্রয়াত পণ্ডিতপ্রবর যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ ও শ্রমসাধ্য গবেষণাকর্ম বঙ্গীয় মনীষার অসামান্য কীর্তি। বৈষ্ণব পদাবলীর ধারাটির ক্ষয়িষ্ণুরূপ দেখা গেল শতাব্দীশেষের দিকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্র মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের ধারা থেকে বহুলাংশে সরে এলেন। অন্নদামঙ্গল কাব্য পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যধারার বিশ্বাসের ভূমিতে দাঁড়িয়ে নেই। ভারতচন্দ্রের কাব্যে সংশয় ও প্রশ্ন দেখা দিল। কাব্যভাষা ও ছন্দ অর্থাৎ কাব্যের টেকনিক নিয়ে তাকে পরবর্তী আধুনিক কবিদের মতো যথেষ্ট সচেতন হতে দেখি। অশ্লীলরূপে কথিত বিদ্যাসুন্দর আখ্যান ব্যবহার করলেন ভারতচন্দ্র ও সাধক কবিরূপে কথিত রামপ্রসাদ সেনও। অষ্টাদশ শতাব্দীর অস্থির রাজনৈতিক-সামাজিক সময়ে দু'জন কবিই কি তবে অমাবস্যার গান

গেয়েছিলেন?

রামপ্রসাদকে শাক্ত পদাবলীর আদি গঙ্গোত্রী বলা হয়ে থাকে। বৈষ্ণব পদাবলীর তুলনায় শাক্ত-পদাবলী বহুল পরিমাণেই বাস্তবানুগ। শাক্ত পদাবলীর আগমনী ও বিজয়া তো সমকালীন বাঙালি সমাজজীবনেরই ছবি। প্রায় শৈশবেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার প্রচলিত সামাজিক রীতি অর্থাৎ গৌরীদান প্রথার যুগে দুর্গাপুজোর সময়ে কয়েকটি দিনের জন্য মেয়েকে পিত্রালয়ে পাঠানোর প্রশ্নে মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে যথোচিত ঔদার্য অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যেত না। যদি-বা মেয়ে পিত্রালয়ে আসতে পারল, নবমীর রাত থেকেই দশমীর বিসর্জনের বাজনা বেজে উঠল। এই সমস্যাটিই মেনকা-হিমালয়কন্যা উমা বা গৌরীর পিত্রালয়ে আগমন ও পুনশ্চ বিজয়া দশমীর দিন শ্বশুরালয়ে তার যাত্রার রূপকে শাক্তপদাবলীর আগমনী ও বিজয়া গানের উদ্ভব। জগজ্জননীর রূপ ও ভক্তের আকূতি অংশেও রামপ্রসাদের কবিত্ব শক্তির প্রভূত নিদর্শন পাওয়া যায়।

রামপ্রসাদকে কেন্দ্র করে অনেক অলৌকিক কাহিনী আছে। তাঁকে সাধক কবির আবরণে আচ্ছন্ন করে রাখায় তাঁর কবিতার বাস্তবানুগামিতা, সামাজিক তাৎপর্য ও মানবিক মূল্যবোধের দিকগুলি আধুনিক পাঠকের সামনে এখনো সেভাবে স্পষ্ট চেহারা ও চরিত্র নিয়ে প্রতিভাত হতে পারেনি।

মন, কৃষি কাজ জানো না—
এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ কল্লে ফলত সোনা

উপরের অংশটিতে খেতের জমি কর্ষণার সঙ্গে মনের জমি কর্ষণার তুলনাত্মক প্রয়োগটির অসামান্যতা আমাদের মুগ্ধ-বিস্মিত করে। রবীন্দ্রনাথ অনেক বছর, প্রায় পৌনে দু'শো বছর পরে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় গিয়ে সেখান থেকে একটি চিঠিতে রামপ্রসাদের বাক্‌প্রতিমাটিকে ব্যবহার করেছিলেন: খেতের কৃষির পাশাপাশি মনের কৃষির প্রকৃষ্ট আয়োজন দেখে তিনি সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধ-সিরাজদৌল্লার পরাজয় ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আনুষ্ঠানিক অভ্যুদয়। ১৭৬০-এ ভারত-চন্দ্রের মৃত্যু। ১৭৭৮-এ হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণের প্রকাশ। ১৭৮০ সালে হিকির গেজেট-এর প্রকাশ, বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলীর ভাব-অবশেষ নিয়ে কবিওয়ালাদের পদ্যচর্চা। নিধুবাবুর টপ্পা। তাঁরই একটি রচনায় পেয়েছি—
'বিনে স্বদেশীয় ভাষা, পুরে কি আশা।'

কবিওয়ালাদের পদ্যচর্চা চলেছে ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কেরীর নেতৃত্বে বাংলা গদ্যের চর্চা, কেরী সহ রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের হাতে গদ্যের বিচিত্র চর্চা, রাম-মোহন রায়ের কলকাতায় বসতিস্থাপনের সঙ্গে আধুনিকতার সূচনার সমাপতন, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা, দিগদর্শন-সমাচার দর্পনের প্রকাশ (১৮-১৮), স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা, ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যগোষ্ঠীর আধুনিক মননচর্চার অগ্রগতি, পত্রিকা প্রকাশ, ডিরোজিও'র সাহিত্যচর্চায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রকাশ, দেবেন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা (১৮৪৩ থেকে), তার আগে ১৮৩০ সালেই ঈশ্বরগুপ্তের সম্পাদনায় 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার প্রকাশনার সূত্রপাত, পরে প্রথম বাংলা দৈনিক পত্রিকারূপে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর আবির্ভাব প্রভৃতি একটির পর একটি ঘটনা বাংলা সাহিত্যের বহুমুখী প্রকাশকে সম্ভব করে তুলল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্যাপক প্রস্তুতির অবসানে দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে বাংলা সাহিত্যের সর্বতোমুখী বিকাশ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বকলমে ভারত শাসন না-করে প্রত্যক্ষ শাসন-কর্তৃত্বে চলে এসেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। আর ভারত যখন তার উপনিবেশ তখন শাসন অর্থাৎ 'ল অ্যান্ড অর্ডার'-এর নামে সর্বতোমুখী শোষণ চালানোই ছিল তার মূল লক্ষ্য। এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট মনে না রাখলে ব্রিটিশ ভারতের বিশেষত আলোচ্য বিষয় বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির মূল্যায়ন সম্পূর্ণ ও বস্তুনিষ্ঠ হতে পারে না। কবিওয়ালাদের উদ্ভব হলো কী ভাবে? ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময় থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যসূত্রে কলকাতায় যে-একটি ধনীগোষ্ঠী অর্থাৎ হঠাৎ বড়লোকের উদ্ভব হলো, তাদেরই অর্থাৎ যাদের টাকা হলো কিন্তু সাহিত্যরুচি ছিল না, সেই বাবুদলের অবসরবিনোদনের গান যেমন চটকদার আর অন্তঃসারশূন্য হওয়ার কথা, কবিওয়ালাদের গান তেমনই হলো। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে প্রতিভাবান রুশ ভবঘুরে গেরাসিম লেবেদেফ পাশ্চাত্য ধরনের মঞ্চ বেঁধে কলকাতায় নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন, এ-ও মনে রাখতে হবে।

১. আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার।
প্রেমসাগরে ধইলাম গো পাড়ি না জানি সাঁতার।···
উন্মর পাগলে কয় শুনছি তুমি দয়াময় গো।···
এগো দিয়া তরী শীঘ্র করি এখন মোরে করো পার।
আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার।

২. সৈয়দ মর্তুজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিলু তুয়া পায়ে
জীবন-মরণ ভরি॥

৩. যখনে পিরিতি কৈলা দিবারাত্রি আইলা গেলা,
ভিন্নভাব না আছিল মনে।
সাধিয়া আপন কাজ, কুলেতে রাখিলা লাজ,
ফিরিয়া না চাহ আঁখি কোণে।
তুই বন্ধের কঠিন হিয়া আনলেতে তৃণ দিয়া,
কোথা গিয়া রহিলা ভুলিয়া?
মীর্জা কাঙ্গালি ভণে জল ঢাল সে আনলে,
নিবাও লো প্রেমরস দিয়া॥

৪. চাঁদ কাজী বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
জীমু না জীমু না আমি না দেখিলে হরি॥

৫. তোমার কঠিন হিয়া ভজ নানা নারী লৈয়া,
কোথা গেলা বসি রৈনু আমি।
পালঙ্গ সাজাই নারী, জাগিয়া কান্দিয়া পুড়ি,
নিশি গেল না আসিলা তুমি॥
কহে সৈয়দ আইনদ্দিনে, প্রভু ভাব রাত্রিদিনে,
মায়াজালে না করিও হেলা।
আমারে অনাথ করি, তুমি যাও মধুপুরী
আর কি পাইব তব মেলা॥

উদ্ধৃত পাঁচটি পদাংশই প্রয়াত অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সংকলিত ও

সম্পাদিত 'বাঙ্গলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি' বই থেকে গৃহীত। বইটিতে এই ধরনের একশো দু'জন মুসলমান কবির লেখা একশো দুটি পদ পাওয়া যায়। এই কবিদের যে-সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্পাদক দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায়, স্বল্পসংখ্যক কবিই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, অধিকাংশই ঊনবিংশ শতাব্দীর, এমন-কী বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের কবি। অন্তত সংশয়াতীত এই তথ্যটি পাওয়া যাচ্ছে যে, সপ্তদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির অভাব ছিল না বৃহত্তর বঙ্গদেশে। সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ মর্তুজা প্রমুখ পদকর্তার পাশাপাশি সপ্তদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রাম-রোসাঙের রোমান্টিক আখ্যানকাব্য রচয়িতা কবিদের কথাও সর্বজনবিদিত। দৌলত কাজী ও আলাওলের আখ্যানকাব্য তো অদ্যাবধি কৌতূহলী পাঠকের অভিজ্ঞতারই সামগ্রী।

বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের সম্পূর্ণভাবে বৈষ্ণবদর্শনসম্মত বৈষ্ণব পদাবলীরূপে কতটা গ্রহণযোগ্য, তা নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ কেতাবী তর্ক উঠতেই পারে কিন্তু সন্দেহাতীতভাবেই স্পষ্ট যে, মুসলমান কবিরা চৈতন্যপ্রবর্তিত একটি সাধারণ প্রেমধর্মের প্রভাব ও প্রেরণা 'সামাজিক উত্তরাধিকারসূত্রেই' লাভ করেছিলেন, সাহিত্যিক বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গিও পেয়েছিলেন। বৈষ্ণব-দর্শনে সুপণ্ডিত প্রয়াত অধ্যাপক ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন, মুসলমান কবিরা আনুষ্ঠানিক বিচারে 'কিন্তু পাইলেন না রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে কোনো স্থিরবদ্ধ ভাবদৃষ্টি'! কাজেই, তাঁর মতে, 'বাংলার জনসমাজে যে সাধারণ ভক্তিধর্ম ও যোগধর্ম প্রচলিত ছিল, এই সকল কবিগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলাকে সেই সকলের সঙ্গেই যুক্ত করিয়া লইলেন।'

'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে' বইটির ৩৬০ পৃষ্ঠায় কেন শশিভূষণ এই মন্তব্য করলেন যে, মুসলমান কবিরা 'পাইলেন না রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে কোনো স্থিরবদ্ধ ভাবদৃষ্টি', তা খুবই বিস্মিত করে আমাকে, কেননা, কয়েক পৃষ্ঠা আগেই (পৃঃ ৩৫৫) তিনিই সঠিকভাবে অন্তত এটুকু তুলে ধরেছেন, চৈতন্যপ্রবর্তিত 'ধর্মের মূল কথা হইল এই যে, ধর্মকে স্পষ্টসিদ্ধান্ত-হীন ন্যায়ের তর্কজালের মধ্যে আবৃত এবং বন্ধ্যা করিয়া রাখিলে চলিবে না, শ্রুতি-স্মৃতি-নির্ধারিত আচার-বিচার, যাগযজ্ঞাদির কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটা বিশেষ ক্রিয়াবিধিতে পরিণত করিয়া রাখিলেও চলিবে না…'। বস্তুত, চৈতন্য 'আপনি আচারি ধর্ম' যেটুকু জনসমক্ষে দেখিয়ে দেওয়ার তা দেখিয়ে দিয়েছেন, সেটুকু বুঝে নিতে সাধারণ মানুষের কোনো ভুল হওয়ার কথা নয়, যা নিয়ে

তর্ক বা বিভ্রম জাগে, তা হলো, তাঁর জীবন ও বাণীর তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ভাষ্য রচনা প্রসঙ্গে। সেই ভাষ্য তাঁর স্বরচিত নয়। তা' রচনা করেছেন তাঁর সুপণ্ডিত ভক্তবৃন্দ, বৈষ্ণব তত্ত্ববেত্তা ও দার্শনিকেরা। এই কথাটা গোড়াতেই বুঝে নেওয়া এবং মনে রাখা ভালো।

তাঁর জীবন ও বাণী অবলম্বনে যে-শাস্ত্র গড়ে উঠেছে, সেখানে অনেক কূটগ্রন্থি, নানা জটিল তত্ত্ব ও দর্শনের গুরুভার, সেই এলাকায় বিবিধ 'দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত' সব ওঁৎ পেতে আছে অশাস্ত্রজ্ঞ সরল ও সাধারণ মানুষের কাছে যেগুলি রীতিমতো দুর্বোধ্য ও ভীতিপ্রদ।

সহিষ্ণু ও জিজ্ঞাসু পাঠক যদি প্রথমেই উদ্ধৃত পাঁচটি পদাংশের শেষটিতে আরো একবার দৃষ্টিপাত করেন, তা হলেই শশিভূষণের এই মূল্যায়নে তিনিও সায় দেবেন—

'ইহার ভিতরে প্রথমে লক্ষ্য করিতে পারি, যাঁহার জন্য পালঙ্ক সাজাইয়া রাখিয়া জাগিয়া কাঁদিতে পুড়িতে হইয়াছে তিনি কিছু পরেই এক সর্বজনীন 'প্রভু'রূপ ধারণ করিয়াছেন। বাংলাদেশের এই প্রভুটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। বৈষ্ণবগণের 'কৃষ্ণ' সাধারণ হিন্দুগণের 'হরি', মুসলমানগণের 'খোদা' এবং খ্রীস্টানগণের 'গড' ভাঙিয়া বাংলাদেশের এই সর্বজনীন 'প্রভু'র উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং কৃষ্ণ-কথা কহিতে কহিতে আসিয়া এই 'প্রভু ভাব রাত্রিদিনে' কথা বলার বিশেষ তাৎপর্য আছে—অর্থাৎ কৃষ্ণকে এখানে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবতার গণ্ডী হইতে লইয়া আসিয়া বাংলার জনমানসের সাধারণ পরম দয়িতের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হইল…'।

বৈষ্ণব তত্ত্ব ও দর্শনের 'প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত' ভাষ্যের দ্বারা প্রভাবিত বলে কিছুটা দ্বিধা ও পরস্পরবিরোধিতা থাকলেও সুপণ্ডিত শশিভূষণই চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মের লোকায়ত ভিত্তিটিকে একালে সর্বপ্রথম আভাসিত করেন, তা লক্ষণীয়। ধর্মকে ন্যায়ের তর্কজালে অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ করে রাখলে তার বন্ধ্যাত্ব ঘুচবে না, 'শ্রুতি-স্মৃতি' নির্ভর কেতাবী তত্ত্ব বা যাগযজ্ঞপ্রধান আনুষ্ঠানিকতাও নয় ধর্ম, চৈতন্যচেতনায় প্রতিফলিত ধর্মীয় ভাবুকতার এই বৈশিষ্ট্য আমাদের মনে রাখতে হবে। অধুনা-বাংলাদেশের প্রবীণ ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডক্টর আহমদ শরীফ তাঁর 'বাঙলার রাজনীতিক ইতিকথা' প্রবন্ধটিতে প্রসঙ্গত যা' বলতে চেয়েছেন, তাকে শশিভূষণের বক্তব্যের পুনরুক্তিমাত্র নয়, তাঁর বক্তব্যের দ্বিধাহীন সম্প্রসারণ ও আরো আধুনিক ভাষ্যরূপেই প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয় আমার—

'উচ্চবিত্তের সংখ্যালঘু ব্রাহ্মণবাদীরা জনগণের এই লোকায়ত ধর্মের কাছে হার মানল। লোকধর্মই বাঙালি হিন্দুর শাস্ত্রীয় ধর্মের ঠাঁই গ্রহণ করল। এভাবে ষোলো-সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে দেশী লৌকিক দেবতা বাঙালি হিন্দুর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। আবার এ সময়েই বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মীর প্রভাবে দেশী মানুষের চেতনায় যে ভাববিপ্লব দেখা দিল, তারই প্রমূর্ত রূপ মেলে চৈতন্যদেবের জীবনে ও বাণীতে। জৈন-বৌদ্ধ সাম্য-করুণা-মৈত্রীর ঐতিহ্যসমৃদ্ধ দেশে ইসলামি সাম্য ও প্রেমবাদের বীজ উপ্ত হয়েছে অনুকূল পরিবেশে। চৈতন্যপ্রবর্তিত প্রেমবাদ হচ্ছে দেশী-বিদেশী ভাব-সমন্বয়ের প্রসূন। দেশী নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের দীক্ষিত মুসলমানেরাও পূর্বপুরুষের বিশ্বাস-সংস্কারের সমন্বয়ে লৌকিক ইসলাম গড়ে তুলল।'

'চৈতন্যপ্রবর্তিত প্রেমবাদ হচ্ছে দেশী-বিদেশী ভাবসমন্বয়ের প্রসূন'—ডক্টর আহমদ শরীফ দেশী-বিদেশী ভাব বলতে যা বুঝিয়েছেন, সে বিষয়ে শশিভূষণের নির্ণয় ছিল : বাংলায় তথা ভারতবর্ষে বিকশিত সুফীধর্ম 'একটি মিশ্রধর্ম ; ইহার ভিতরে পারস্যের প্রেমধর্মের সহিত ভারতবর্ষের প্রেমধর্মের অপূর্ব মিলন ঘটিয়াছে। ফলে ভারতবর্ষের প্রেমধর্মের কাহিনী-উপাখ্যানও সুফীধর্মের সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে।'

শশিভূষণ যদিও গভীরভাবেই বিশ্বাস করেন, 'বাঙালি-চিত্তের উপর বৈষ্ণব সাহিত্যের যে প্রভাব তাহারও জাতিধর্ম নিরপেক্ষভাবে একটি সামগ্রিক রূপ আছে' এবং জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও তার প্রকাশভঙ্গি চার-পাঁচশো বৎসর যাবৎ সমগ্র বাঙালি জাতির প্রেমভাবনা ও প্রকাশভঙ্গিকে প্রাণিত ও প্রভাবিত করেছে, সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি দৌলত কাজীর 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' পর্যন্ত তার সচ্ছল নিদর্শন, তবু মুসলমান কবিগণের বৈষ্ণব পদাবলী 'হৃদয়সম্মত হইলেও' শশিভূষণের মতে, 'বৈষ্ণবশাস্ত্রসম্মত নহে'! সুফী প্রেমধর্ম এবং বাংলার প্রেমধর্ম বাঙালি জনসাধারণের মধ্যে যে সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায় সমন্বিত হয়েছে, এই সমন্বয়জাত প্রেমধর্মের আদর্শের সঙ্গে বাংলার মুসলমান কবিরা রাধাকৃষ্ণকে যুক্ত করে নিয়েছেন। ফলত, রাধার আবেগব্যাকুলতার সঙ্গে পরম দয়িতের জন্য নিখিল প্রেমসাধকদের সুফীসুলভ আর্তি মুসলমান কবিদের বৈষ্ণব পদাবলীতে একাকার হয়ে গেছে। 'রাধার যে পূর্বরাগ অনুরাগ বিরহের আর্তি তাহা কবিগণের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে' সর্বমানবিক এবং মুসলমান কবিদের ব্যক্তিগত আর্তিতে পর্যবসিত হয়েছে—এখানেই গোঁড়া বৈষ্ণবদের তাত্ত্বিক ও দার্শনিক আপত্তি।

কেননা, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব ও দর্শন দীক্ষিত বৈষ্ণব কবিদের রাধা-কৃষ্ণের লীলা-কীর্তনের ও লীলার মাহাত্ম্য ঘোষণারই ভূমিকাটুকু শুধু দেয়, সেই লীলায় বৈষ্ণব কবিদের অংশ-গ্রহণের অধিকারদান তো দূরের কথা, তা কল্পনাতীত বলেই মনে করে। বস্তুত, জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস প্রমুখ কবিগণও লীলা-কীর্তনের ভূমিকাটুকুই শুধু পালন করেছেন, নিজেরা সেই লীলায় অংশগ্রহণ করেননি। চৈতন্য-পরবর্তী কবিরাও এই একই পথের পথিক। এখানেই বৈষ্ণবপদ রচয়িতা মুসলমান কবিগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বাঁধা সড়ক থেকে ভিন্ন মার্গে পদচারণা করেছেন বলে শশিভূষণের বিশ্বাস। বৈষ্ণবধর্মের 'সাধ্য-সাধন' তত্ত্বের এই ঐতিহ্য কিন্তু গড়ে উঠেছে বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের মননকল্পনায় এবং তা ষোড়শ শতাব্দীতে। তবু লক্ষণীয়, দ্বাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে অর্থাৎ জয়দেব-বিরচিত 'গীতগোবিন্দ' কাব্য থেকেই এই দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত।

অর্থাৎ 'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান'। পরবর্তীকালে 'সোনার তরী' কাব্যের 'বৈষ্ণব কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের উদ্‌ভাবিত ও নির্দেশিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের এই আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে শুদ্ধতম মানবতা-বাদী কবির পক্ষ থেকে অনবদ্য কবিত্বপূর্ণ ভাষায় অস্বীকারই করেছেন :

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান!
পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন,
বৃন্দাবনগাথা—এই প্রণয়—স্বপন
শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
শরমে সম্ভ্রমে-এ কি শুধু দেবতার!
এ সঙ্গীতরসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতিরজনীর আর প্রতিদিবসের
তপ্ত প্রেমতৃষা?

সত্যি বিচিত্র ও অবিশ্বাস্য এই সব আরোপিত তত্ত্ব! কে রাধা? কে কৃষ্ণ? বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে কোন্ রাধা কোন্ কৃষ্ণকে পাই? প্রেমমুগ্ধ, দেবমিলনব্যাকুল দুটি বড়ো-জোর কৈশোর-উত্তীর্ণ তরুণ-তরুণীকে। দানখণ্ড, নৌকাখণ্ডের পর্যায়ের পরে বংশীখণ্ড-বিরহখণ্ড! তাতে কী? দেহকে কেন্দ্র

করেই উজ্জীবিত কাম, রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম কবিত্বপূর্ণ ভাষায় 'তপ্ত প্রেমতৃষা' তৃপ্তির সন্ধান করবে। অসহ্য জ্বালা, অসহ্য সুখ, অসহ্য বিরহ ; প্রত্যেকটি স্তর উত্তীর্ণ হয়েই একান্ত দেহবদ্ধ প্রেমের মুক্তি :

দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি-মাঝে।
খুঁজিতেছি, কোথা তুমি,
কোথা তুমি!
যে অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায়! নিস্ফল কামনা

প্রেমের অমৃত কোথায়? সে কি শুধু দেহেই নিহিত? দেহ ছাড়াও বোধের, চেতনার উত্তরণের আরো একটি মাত্রার খবর দিতে চেয়েছিলেন 'মানসী'রই রবীন্দ্রনাথ, একই কবিতায় :

লও তার মধুর সৌরভ
দেখো তার সৌন্দর্যবিকাশ,
মধু তার করো তুমি পান,
ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

'ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব', একই কবিতায় ছাব্বিশ বৎসর বয়সের যুবক রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, বুঝেছিলেন প্রেমের শক্তির পরীক্ষা :

'সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে,
জীবনে মরণে,
শত ঋতু-আবর্তনে'—

বুঝেছিলেন,

'কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে—শ্রান্ত করে হিয়া।'

'হৃদয়ের ধন' কবিতায় তাই একই বয়সের কবি দেহাসক্তির সত্যকে মেনেও নিছক দেহসর্বস্ব প্রেমের সীমাবদ্ধতাও সুচিহ্নিত করেছিলেন। স্বভাবতই, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের নায়ক-নায়িকা কৃষ্ণ আর রাধাকে, গ্রামবাংলার দুই সদ্য-তরুণ-তরুণীকে কবি বড়ু চণ্ডীদাস দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডের দেহনির্ভর কামনা-

পূরণের স্তর থেকে বংশীখণ্ড-বিরহখণ্ডের উত্তরণপর্যায়ে নিয়ে গেছেন। তারপরই কি এই একই কবি চণ্ডীদাস বা দ্বিতীয় কোনো চণ্ডীদাস পদাবলীতে নিয়ে আসবেন নতুন এক রাধাকে. যার নাম হয়তো রামী এবং বৈষ্ণব তত্ত্ববেত্তা সুপণ্ডিত শশিভূষণকেই সাক্ষী মানবো আবার, কেননা, তিনিই লিখেছেন :

'এই রজকিনী রামীই হইল রাধাতত্ত্বের মূর্ত প্রতীক, ইহার ভিতর দিয়া ব্যতীত রাধাতত্ত্ব কখনও আস্বাদ্য হয় না। এই রাধাতত্ত্বই রহিয়াছে বাংলাদেশের নায়িকা-ভজন বা কিশোরী-ভজনের পশ্চাতে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, পুরাণাদির যুগে যেমন শিব-শক্তি, পুরুষ-প্রকৃতি, বিষ্ণু-লক্ষ্মী মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল, সহজিয়া মতের ভিতরে আবার রাধা-কৃষ্ণ, শক্তি-শিব, প্রকৃতি-পুরুষ জনবিশ্বাসের ভিতরে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে।'

রজকিনী রামীই তা' হলে রাধাতত্ত্বের মূর্ত প্রতীক? চণ্ডীদাস রজকিনী রামীকে সরাসরি সম্বোধন করে লিখতে পারেন :

শুন রজকিনী রামী।
ও দুটি চরণ   শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি॥
রজকিনী রূপ   কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম   নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাস গায়॥

আবার,

তুমি রজকিনী   আমার রমণী
তুমি হও মাতৃপিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন   তোমারি ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥

এই সব বৈষ্ণব পদ পড়ে রবীন্দ্রনাথ কি অনায়াসেই তাঁর পূর্বোক্ত কবিতাটিতে ('বৈষ্ণব কবিতা') লিখতে পারেন না :

সত্য করে কহো মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।···

এত প্রেমকথা—
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে! আজ তার নাহি অধিকার
সে সঙ্গীতে! তারি নারীহৃদয়-সঞ্চিত
তার ভাষা হতে তারে করিবে বঞ্চিত
চিরদিন!

এবং, রবীন্দ্রনাথ যদি গত শতাব্দীতেই লিখতে পারেন অতঃপর 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা', তা'-হলে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্ব পর্যন্ত মুসলমান কবিগণ তাঁদের রচিত বৈষ্ণব পদাবলীতে কেন রাধার আর্তির সঙ্গে নিজেদের ভাবব্যাকুলতা যুক্ত করে ফেললেই তা' অবৈষ্ণবোচিত হবে? পদাবলীর বড়ু চণ্ডীদাসও কি বৈষ্ণব কবি নন? তিনি লিখেছেন, 'তুমি রজকিনী আমার রমণী'! হতে পারে, বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতা মুসলমান কবিগণ কবিপ্রতিভায় ও রচনানৈপুণ্যে চণ্ডীদাসের সমকক্ষ নন। কিন্তু ক'জন বৈষ্ণব কবিই বা চণ্ডীদাসের সমকক্ষ? তাই, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম অর্থাৎ তার তত্ত্ব বা দর্শনসম্মত হোক বা না-হোক, বৈষ্ণব কবিরা সঙ্গত কারণেই বাস্তব জীবনে দৃষ্ট প্রেমিকা নারীকেই শ্রীরাধিকার আসনে বসিয়েছেন, সেই প্রেমিকা নারীরই বন্দনা তাঁদের অগণিত পদাবলীতে। পদাবলীর বড়ু চণ্ডীদাস কথাটা সরাসরি কবুল করেছেন, এই মাত্র :

শুন রজকিনী রামী।
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি॥

আবার, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম চৈতন্য-অনুরাগী জনসাধারণের বা এমন কী পণ্ডিতজনদেরও কাছে কতখানি গ্রহণযোগ্য, সেই দুঃসাহসিক ও 'শাস্ত্র'-বিরোধী প্রশ্নটি সরাসরি উত্থাপন করতে চাই।

পণ্ডিতেরা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁদের দৌলতে কৌতূহলী শিক্ষিতজনেরা আজ স্পষ্টতই জানেন, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বলিতে আমরা চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের কথাই বুঝি। চৈতন্য-প্রবর্তিত এই বৈষ্ণব ধর্ম পরবর্তীকালে শাস্ত্রজ্ঞ গোস্বামিগণ কর্তৃক নানাভাবে বিধিবদ্ধ হইয়া দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও ধর্মাচরণ ক্ষেত্রেই একটা বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছে।'

কিন্তু আমরা আগেই বৈষ্ণব পণ্ডিতের বক্তব্য উদ্ধৃত করে দেখিয়েছি,

চৈতন্যপ্রবর্তিত 'ধর্মের মূল কথা হইল এই যে, ধর্মকে স্পষ্টসিদ্ধান্তহীন ন্যায়ের তর্কজালের মধ্যে আবৃত এবং বন্ধ্যা করিয়া রাখিলে চলিবে না, শ্রুতি-স্মৃতি-নির্ধারিত আচার-বিচার, যাগযজ্ঞাদির কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটা বিশেষ ক্রিয়া-বিধিতে পরিণত করিয়া রাখিলেও চলিবে না…'।

তা-হলে দেখা যাচ্ছে, চৈতন্য যা আদৌ চান নি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব ও দর্শন রচয়িতারা এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবক্তারা শেষ পর্যন্ত কার্যত তাই করেছেন। সেইজন্যই আগেই অনুরূপ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছি, 'সত্যি বিচিত্র ও অবিশ্বাস্য এই সব আরোপিত তত্ত্ব'।

বস্তুত, চৈতন্য স্বয়ং কোনো বিধিবদ্ধ ধর্ম বা তত্ত্ব প্রচার করেননি। মূলত তাঁর জীবনাচরণ অবলম্বনে প্রধানত বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ এবং অংশত, প্রতিভাবান কবি-দার্শনিক কৃষ্ণদাস কবিরাজ, তাঁর বহিরঙ্গ জীবন ও ভাব-জীবনের তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ভাষ্য রচনা করেছেন। তাঁর বাণীও লিখিত আকারে প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। বস্তুত তাঁর কোনো রচনাই পাই না। 'শিক্ষাষ্টক'-রূপে পরিচিত আটটি শ্লোক তাঁর নিজস্ব রচনারূপে অনুমিত হয় মাত্র। ছাত্রজীবনের পাঠশালার দুরন্ত বালক নিমাই অসামান্য কিছুই শিক্ষা করেননি। বাকি থাকে জীবনের পাঠশালা। বিশিষ্ট কিছু পণ্ডিত মানুষের সান্নিধ্য ও সাহচর্য। নিশ্চিতভাবে জানা যায়, তিনি পাঠ করতেন তথা গভীরভাবে আস্বাদন করতেন : জয়দেব, বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের পদাবলী। উক্ত কবিত্রয়ীর একজনও বিধিবদ্ধ কোনো তত্ত্ব বা দর্শনের অনুসারী ছিলেন না। কবি ও রসজ্ঞ পণ্ডিত প্রয়াত অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী 'বৈষ্ণব পদাবলী' সংকলনের (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত) চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় জানিয়েছেন-'প্রাক্-চৈতন্য-যুগের পদাবলী-রচয়িতা তিনজন : জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। ইহাদের কাব্যের বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা।'—কোনো ধর্মীয় তত্ত্ব বা বিধিবদ্ধ দর্শন নয়, বিশুদ্ধ মানবিক প্রেমলীলাই রাধাকৃষ্ণ অবলম্বনে কবিত্রয়ীর পদা-বলীতে লক্ষণীয়।

শুধু চৈতন্য কেন, জয়দেবেরও আগে থেকেই বৈষ্ণবীয় ভাবের প্রবাহ ছিল অবিভক্ত বৃহত্তর বাংলাদেশে। শ্যামাপদবাবু লিখেছেন : "'রাগাত্মিকা' শব্দটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবের হইলেও ভাবটি প্রাচীন। এই ভাবের একটি ব্যাপক ও পরিপুষ্ট বৈষ্ণবী ধারা বাংলাদেশে প্রচলিত না থাকিলে গীতগোবিন্দর লীলা-পরিবেশ ও লীলা বৈশিষ্ট্য অপরিচয় হেতু বাঙালির সানন্দ আপ্যায়ন লাভ করিত না।"

রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত চৈতন্যের জন্মগ্রহণের অনেক আগেই রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রেমলীলা বৃহত্তর বঙ্গের ব্যাপক জনসমাজে সুপ্রচলিত ছিল। বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ছিলেন না, ছিলেন পঞ্চোপাসক অর্থাৎ সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ণব প্রভৃতি পাঁচরকম লৌকিক ধর্মীয় ধ্যানধারণার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। আর প্রাক্-চৈতন্য চণ্ডীদাস বা বড়ু চণ্ডীদাস ছিলেন বৈষ্ণব সহজিয়া। বস্তুগত ঐতিহাসিক কালগত কারণেই জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস, তিনজনের কেউ চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব বা দর্শনের সঙ্গে আদৌ পরিচিত ছিলেন না।

শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণব গোস্বামিগণ কর্তৃক বিধিবদ্ধ দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলি নিয়েই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম গড়ে উঠলো, নিমাই চৈতন্য হয়ে ওঠার পরেই। কিন্তু ইতিহাস ও তথ্য বলছে, এই বিধিবদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম ছাড়াও বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের আরো অনেকগুলি ধারা প্রচলিত ছিল। সেগুলির মধ্যে আবার বৈষ্ণব সহজিয়া ধারাটিই প্রধান। 'সহজিয়া' মত, নামেই প্রমাণ, কোনো বৈষ্ণব দার্শনিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল না কোনোকালে। শুধু বঙ্গদেশেই নয়, সমগ্র ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রেই সহজিয়াদের সাধনার ধারা একটি অতীব প্রাচীন ধারা। এই সাধনার ধারাকেই বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধর্মমতের সঙ্গে যুক্ত করে সারা ভারতে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও তান্ত্রিক সাধনা, কোথাও বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনা, আবার কোথাও বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, এই সাধনার বিভিন্ন পরিণতিতেই বামাচারী তান্ত্রিক সাধনা, বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনা, বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনা, বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনা প্রভৃতির উদ্ভব হয়েছে।

ভারতীয় সাধনার বৈচিত্র্যের মধ্যেও গভীর একটি ঐক্য আছে। এই সব বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় বহিরঙ্গে যতই পরস্পরবিচ্ছিন্ন বলে মনে হোক না কেন, আসল সাধনা একটিই। চরম সত্যটি হলো : অদ্বয় এক পরমানন্দ স্বরূপ। এই অদ্বয় আনন্দতত্ত্বই হলো পরম সামরস্য। পণ্ডিতেরা শেষ পর্যন্ত এই অখণ্ড তত্ত্বকেই বলেছেন, মিথুনতত্ত্ব বা কামতত্ত্ব বা যুগলতত্ত্ব বৌদ্ধগণের যুগবদ্ধ-তত্ত্ব। তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্রে এই অখণ্ড যুগলতত্ত্বই হলো কেবলানন্দতত্ত্ব আর এই অদ্বয়তত্ত্বের দুটি ধারা—একটি শিব, অপরটি শক্তি। পণ্ডিতজনের ভাষায়, 'তান্ত্রিক মতে এই শিব-শক্তির মিলন-জনিত কেবলানন্দই হইল পরম সাধ্য। এই সাধ্য লাভ করিবার সাধনপদ্ধতি বহুপ্রকারের। সাধক নিজের দেহের ভিতরেই এই শিব-শক্তি তত্ত্বকে পূর্ণমিলনজনিত অপূর্ব সামরস্য-সুখ বা

কেবলানন্দ অনুভব করিতে পারেন। এই শিব-শক্তি তত্ত্ব লইয়া বহু প্রকারের সাধনার ভিতরে একটি বিশেষ প্রকারের সাধনা হইল নর-নারীর মিলিত সাধনা।'

তন্ত্রের নারী-পুরুষ মিলিত সাধনার রহস্য এইরকম। বৌদ্ধতান্ত্রিক এবং বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনারও এই হলো মূল-কথা। এইভাবে যে অসীম অনন্ত আনন্দানুভূতি, তন্ত্রের ভাষায় তা সামরস্যসুখ, বৌদ্ধদের ভাষায় মহাসুখ এবং বৈষ্ণবগণের ভাষায় মহাভাব-স্বরূপ। শশিভূষণের Obscure Religious Cults As Background of Bengali Literature এবং An Introduction To Tantric Buddhism-এই বই দু'খানিতে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা কৌতূহলী পাঠক পড়ে নিতে পারেন।

পাল রাজাদের সময় বঙ্গদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম ও সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রতিপত্তি ছিল। বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্রিক গুহ্যসাধন পদ্ধতি এবং হিন্দুতন্ত্রোক্ত সাধনপদ্ধতি মূলত অভিন্ন। সেন রাজাদের সময়ে বঙ্গদেশে রাধাকৃষ্ণসম্বলিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার লক্ষণীয়। সেই বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে গুহ্যসাধন পদ্ধতি মিশে গিয়ে বৈষ্ণব সহজিয়া মত গড়ে ওঠে।

এই বৈষ্ণব সহজিয়া ভাবটিও আসলে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় তত্ত্ব বা দর্শনের ভিত্তিকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠেনি। আবার বিশেষজ্ঞের কলম থেকে নিজের বক্তব্যের সমর্থন খুঁজে নিচ্ছি—শশিভূষণের লেখায় পাচ্ছি, 'আমরা পূর্বাপর দেখিয়া আসিয়াছি, বৈষ্ণব ধর্ম,—বিশেষ করিয়া রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া যে বৈষ্ণবধর্ম, তাহা হইল প্রেমধর্ম।'

তাহলে বৈষ্ণব ধর্ম বলতে বুঝি : প্রেমধর্ম। প্রেমধর্ম নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পত্তি নয়, তা একটা সর্বমানবিক ব্যাপার। নারী-পুরুষের মিলিত যে গুহ্য সাধনাপ্রণালী, তা বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে এসে যখন মিশে গেল, তখন আর কতটা কী পরিবর্তন সম্ভবপর? নর-নারীর পরিপূর্ণ সার্থক যৌনমিলনকালে নর হবে 'শিব'-ভাবে ভাবিত এবং নারী হবে 'শক্তি'-ভাবে ভাবিত! সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় মহাপণ্ডিতও বিষয়টিকে যতই জটিল ও দুর্বোধ্য করে তুলুন না কেন, স্থূলত ও সংক্ষেপত : বিষয়টি এইরকমই। সহজিয়ারা যোগসাধনা ইত্যাদি বলবেনই না, প্রেমকে প্রেমই বলবেন। আবার পণ্ডিতের সাক্ষ্য পেশ করছি : 'বৈষ্ণব-সহজিয়া রাধাকৃষ্ণের মিলনজনিত আনন্দকে প্রেম ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারেন না, যদিও এখানেও চরমাবস্থার প্রেমই হইল আনন্দ, আর আনন্দই হইল প্রেম। যে পথে এই চরমাবস্থা লাভ হয় তাহাকেও বৈষ্ণব-সহজিয়াগণ যোগের পথ বলিবেন না, ইহাকে তাঁহারা বলিবেন প্রেমের পথ।'

তা হলে, নিশ্চিতরূপেই বলতে পারি, চৈতন্যের ধর্ম : প্রেমধর্ম, চৈতন্যের পথ : প্রেমের পথ।

প্রয়াত কবি-অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী পূর্বোক্ত বৈষ্ণব পদাবলীর ভূমিকায় লিখেছেন, 'শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব হয়, ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দে। নবদ্বীপে তরুণ নিমাই পণ্ডিত গয়ায় পিতৃকৃত্য করিতে গিয়া পরম বৈষ্ণব ঈশ্বরপুরীর নিকট প্রেমধর্মে দীক্ষা লাভ করেন।'

নদীয়ায় ফিরে এলো নিমাই। যারাই তাঁকে দেখল, অবাক হলো। কোথায় সেই ঔদ্ধত্য? উদ্ধত পণ্ডিত নিমাই ললিত প্রেমিক নিমাইয়ে রূপান্তরিত। সর্বজনবিদিত কথাগুলিও প্রাসঙ্গিক বলেই শ্যামাপদ চক্রবর্তীর ভাষায় উদ্ধৃত করছি—'ভাবাবেগে বিহ্বল নিমাইয়ের অলৌকিক আচরণে অদ্বৈত-শ্রীরাম প্রমুখ প্রাচীন আচার্যগণ মুগ্ধ হইয়া ভক্তিশিষ্যরূপ তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিলেন। অচিরে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন নিমাইয়ের গুরুর গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য অবধূত নিত্যানন্দ। হরিনামরসে 'শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে' ভেসে যায়'—জনগণমনে সে এক অপূর্ব উন্মাদনা। শ্রীবাসের রুদ্ধদ্বার অঙ্গনে চলিতে লাগিল উদ্দন্ড কীর্তননৃত্য। জনগণ শুনিল, যে নাম সেই কৃষ্ণ—নামের সহিত সদা ফিরেন, শ্রীহরি। শ্রীহরি ঐশ্বর্যময় বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ নহেন, মাধুর্যময় সচ্চিদানন্দমূর্তি মানবকিশোর কৃষ্ণ'।

কোন্ কৃষ্ণ, কোন্ হরিকে নিয়ে নিমাই আত্মহারা আনন্দে উচ্ছল হলেন?

'মানুষের তিনি সখা, মানুষের তিনি সন্তান, মানুষের তিনি কান্ত। প্রতি মানুষের হৃদয়দ্বারে প্রেমের কাঙালরূপে তিনি নিত্য দণ্ডায়মান, দ্বার খুলিলেই মিলন ঘটিবে।'

চৈতন্য-সমকালীন বঙ্গদেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং ব্রাহ্মণ-শূদ্র তথা ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ বিভক্ত সেই সমাজে, যদি মানুষ শুধু একবার 'নামকীর্তনে', 'হরির-স্মরণে' প্রবৃত্ত হয় তখন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ কী হয়? না। তখন তাহলে, 'মানুষে মানুষে ভেদ নাই, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, বৃহৎ-ক্ষুদ্র-কৃত্রিম পরিচয়। মানুষের একমাত্র সত্য পরিচয় : সে মানুষ।'

মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখা কেন? মানবতা যে তাহলে অসত্য অসার্থক হবে।

'মানবতা তখনই সার্থক হয়, যখন তাহার মধ্যে অনুসৃত হয় ভগবৎপ্রেম।' কী এই ভগবৎ প্রেম?

যেমন, এই আধুনিককালেও রামমোহন ও বিদ্যাসাগর শাস্ত্রের বচন খুঁজে

খুঁজে শাস্ত্রোক্ত বাণীর দোহাই পেড়েই মানুষকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন, তথাকথিত শাস্ত্রের অমানবিক ফরমানগুলির, পাশবিক আনুষ্ঠানিকতাগুলির অন্তঃসার শূন্যতা, ঠিক যেন তেমনি করেই চৈতন্য বুঝিয়ে দিলেন মানবতার মাহাত্ম্য, ভগবানের দোহাই পেড়ে মানুষকে ভালোবাসতে শেখালেন মানবতাকে। বললেন, ভগবানকে ভালোবাসা সহজ। ভগবৎ-প্রেম কী? খুব সহজ। 'প্রতিদিনের সংসারযাত্রায় আমাদের প্রীতি মাতায়-সন্তানে, বন্ধুতে-বন্ধুতে, পতি-পত্নীতে যে বিচিত্রভাবে আপনা হইতে স্বচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ করে, তাহারই ভগবন্মুখিতাই ভগবৎ-প্রেম।'

রবীন্দ্রনাথ ঠিক এইভাবেই বুঝে নিয়েছিলেন বৈষ্ণবের ধর্মকে মানবধর্মরূপে, চৈতন্যের প্রেমকে মানবপ্রেমরূপে। রবীন্দ্রনাথের রচনাটিরও নাম তাই 'মনুষ্য', তাঁর 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে তিনি বৈষ্ণবধর্ম তথা চৈতন্যধর্মকে উপস্থাপিত করেছেন অসামান্য সাবলীলতায়—

বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকটে আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই সমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে।

পরিপূর্ণ লোকায়ত যে বৈষ্ণব ধর্ম, জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে যা সম্পূর্ণরূপেই মানবিক একটি সত্য, মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভিন্ন সম্বন্ধের মাধ্যমেই যার প্রকাশ ও পরিচয়, তাকে অনুভব করার চেয়ে সহজ আর কী হতে পারে? সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাতে পাই, প্রিয়বস্তুর প্রতি মানবমনের সহজ অনুরাগই রতি। বৈষ্ণবমতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তজনের রতি পাঁচ ভাবে হতে পারে। এই পাঁচ রকমের রতির পরিণতি পাঁচ রকম রসে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর (শৃঙ্গার, উজ্জ্বল)। রবীন্দ্র-রচনার উদ্ধৃতাংশে এই রতিরসেরই কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বস্তুত, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তের এই যে পাঁচ রকম 'রতি' তার সবগুলিই প্রাত্যহিক সর্বজনীন মানবসম্বন্ধ থেকেই গৃহীত।

চৈতন্যসমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতি অর্থাৎ যে কালপরিবেশে চৈতন্যের জন্ম, তখনকার পারিপার্শ্বিকতা মনে রাখলে বলতেই হবে, বৈষ্ণবের প্রেম ও ভক্তিকে একটি সদর্থক বাস্তবতারূপেই চৈতন্য তুলে ধরতে পেরেছিলেন। চৈতন্যের জন্মকালে ধর্মীয় ও সামাজিক যে-অবক্ষয়ের বর্ণনা চৈতন্যজীবনী-কাব্যে, বিশেষত, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায়, তার পরিপ্রেক্ষিতে চৈতন্যের জীবনচর্যা ও ভাবাদর্শকে তো রীতিমতো আক্ষরিক অর্থেই প্রগতিশীল একটি মতাদর্শরূপেই চিহ্নিত করতে হয়।

চৈতন্য জন্মকালের যে ধর্মীয়-সামাজিক ছবি আছে চৈতন্যভাগবতে, সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার দু'টি মাত্র উদ্ধৃত করছি। একটি তদানীন্তন ধনিকশ্রেণীর বা উঁচুতলার ছবি—আদর্শহীন বিলাসব্যসনমত্ত আত্মকেন্দ্রিকতার ছবি—

'জগৎ প্রমত্ত ধনুপুত্র বিদ্যারসে।
দেখিলে বৈষ্ণব মাত্র সবে উপহাসে॥
তারে বলে সুকৃতি যে দোলা ঘোড়া চড়ে।
দশ বিশ জন যার আগে পিছে চলে॥'

দ্বিতীয় ছবিটিতে আছে 'নিচু'-তলার জীবন—লোকধর্মও যখন গতানুগতিকতায় রুদ্ধগতি ও অবক্ষয়প্রাপ্ত—

'বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপচারে।
মদ্য-মাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে॥'

ধর্মীয়-সামাজিক এই পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষত, যখন নবদ্বীপের হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণদেরই প্রভাব-প্রতিপত্তি, যারা বর্ণভিত্তিক অধিকারপ্রমত্ত এবং স্মার্তপণ্ডিত রঘুনন্দন যখন এই ঘোষণায় অক্লান্ত যে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া আর কোনো জাতি নেই আর ব্রাহ্মণদের পদসেবাই হচ্ছে শূদ্রদের কর্তব্য, সেই রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল উঁচুতলার মানুষ এবং সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ে জর্জরিত ও দুর্দশা-পীড়িত জনসাধারণের সামনে দাঁড়িয়ে চৈতন্যের উচ্চারিত এই বাণী আজও প্রায় রণধ্বনির মতো গর্জমান : 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ!

এই বাণী যেন বৈদ্যুতিক শিহরণ সৃষ্টি করলো জনমানসে তৎক্ষণাৎ। বিশেষত কথাটা কে বললেন?

'সদ্‌বংশজাত সুপণ্ডিত এক ব্রাহ্মণের এই নতুন সংজ্ঞার উদাত্ত প্রচারে, মুষ্টিমেয় গোঁড়া ব্রাহ্মণ উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেও, সাধারণ মানুষ আপনার এক নূতন রূপের সন্ধান পাইয়াছিল এবং জাতিধর্ম-নির্বিশেষে এই উদার সমুন্নত মানবতার ক্ষেত্রে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। এত বড়ো অসাধ্য সাধন শুধু ব্যাখ্যান

ও প্রচারণার দ্বারা সম্ভব নহে। এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামীর কথা প্রণিধান-যোগ্য :

আপনা আস্বাদে প্রেম নামসঙ্কীর্তন॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্তন সঞ্চরে।
নাম-প্রেম-মালা গাঁথি পরাইলো সংসারে॥
এই মতো ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার॥

চৈতন্যের সবচেয়ে বড়ো দান, সমাজের বঞ্চিত-অপমানিত অংশের মানুষকে মর্যাদাদান। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে শুধু অসাম্প্রদায়িক অথবা ধর্মনিরপেক্ষ বললে সবটুকু বলা হবে না। তাঁর স্বরচিত বলে প্রচারিত শিক্ষাষ্টকের একটি শ্লোক প্রসঙ্গত স্মরণীয় :

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ো সদা হরিঃ॥

তৃণের থেকেও বিনীত হতেই শুধু বলেন নি তিনি, তৃণের মতো নিজেকে বিশ্বব্যাপী বিস্তীর্ণ হতে বলেছেন, তরুর মতো সহিষ্ণু হতেই বলেন নি শুধু, তরুর মতোই বিপন্ন ও আশ্রয়প্রার্থী মানুষের আশ্রয় হয়ে উঠতে বলেছেন, মানুষকে ভরসা দিতে বলেছেন, অপমানিত-লাঞ্ছিত মানুষকে মর্যাদার সঙ্গে স্বীকৃতি দিতে বলেছেন তিনি। যদি এই সব কাজ পারো, তবেই হরিকে স্মরণ করার অধিকার তোমার আছে।

'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—সহজিয়া কবি চণ্ডীদাসের এই একটিমাত্র ছত্রে স্পষ্ট, কেন চৈতন্য চণ্ডীদাসের পদ দিবারাত্র আস্বাদন করতেন। সহজিয়ারা মানুষকেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। মানুষকে বাদ দিয়ে ব্রজতত্ত্বের কোনো অস্তিত্ব নেই। এই কথাই সহজিয়াদের কথা, বৈষ্ণবদের কথা, চৈতন্যেরও কথা।

৩

সহস্রাব্দের ব্রাত্যগান ও রবীন্দ্রনাথ

'এই-যে নববর্ষ আজ জগতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, এ কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে এসে প্রবেশ করতে পেরেছে? আমাদের জীবনে কি আজ নববর্ষ আরম্ভ হলো?'

কোনো একবারের নববর্ষের প্রার্থনা-ভাষণ এইভাবেই শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কবির স্বাভাবিক উচ্চারণে লিখেছিলেন অতঃপর—'নিত্যলোকের সিংহদ্বার বিশ্বপ্রকৃতির দিকে চিরকাল খোলাই রয়েছে—সেখান থেকে নিত্য-নূতনের অমৃতধারা অবাধে সর্বত্র প্রবাহিত হচ্ছে। এইজন্যে কোটি কোটি বৎসরেও প্রকৃতি জরাজীর্ণ হয়ে যায় নি—আকাশের এই বিপুল নীলিমার মধ্যে কোথাও লেশমাত্র চিহ্ন পড়তে পায় নি।'

অর্থাৎ প্রকৃতিলোকে পুরাতনের অবসান আর নূতনের অভ্যুদয় সাবলীল স্বতঃস্ফূর্ততায় ঘটে যায়, কোথাও কোনো প্রতীক্ষা বা আয়োজন, সাধনা বা সংগ্রামের আভাসমাত্র পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'এই-যে পুরাতনের আবরণের ভিতর থেকে নূতনের মুক্তিলাভ এ কত অনায়াসেই সম্পন্ন হয়—কোথাও কোনো সংগ্রাম করতে হয় না।'

কিন্তু মানবলোক? মানুষের জীবনে? মানুষের সমাজে?

সেখানে জরাজীর্ণ পুরাতনকে, কায়েম হয়ে-থাকা ব্যবস্থাকে, অভ্যাসকে, গতানুগতিকতাকে নির্মূল না-করে নূতনের যথার্থ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। প্রার্থনা-ভাষণ যদিও, তবু রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, মানুষের সমাজে পুরাতনের অবসান আর নূতনের প্রতিষ্ঠা আপনা-আপনি ঘটে না, সেজন্য 'সংগ্রাম', এমন-কী, 'বিপ্লবের ঝড়'-ই অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথের মিলহীন কবিতার মতো গদ্যে কথাগুলি এ-রকম :

কিন্তু, মানুষ তো পুরাতন আবরণের মধ্যে থেকে এত সহজে এমন হাসিমুখে নূতনতার মধ্যে বেরিয়ে আসতে পারে না। বাধাকে ছিন্ন করতে হয়, বিদীর্ণ করতে হয়—বিপ্লবের ঝড় বয়ে যায়।

তার অন্ধকার রাত্রি এমন সহজে প্রভাত হয় না, তার সেই অন্ধকার বজ্রাহত দৈত্যের মতো আর্তস্বরে ক্রন্দন করে ওঠে, এবং তার সেই প্রভাতের আলোক দেবতার খরধার, খড়্গের মতো দিকে দিগন্তে চমকিত হতে থাকে।

নববর্ষ প্রসঙ্গে উচ্চারিত এইসব কথা শুধুই যে-কোনো নববর্ষের দিনটিকে ঘিরে নয়, আসন্ন একবিংশ শতাব্দী তথা নতুন সহস্রাব্দ সম্পর্কে আরও বেশি করে প্রযোজ্য, কেননা মানুষের সমাজে অগ্রগতির পথের বাধাগুলি এখনও এমনই দুর্ভেদ্য হয়ে আছে যে, প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার লাগাতার দ্বন্দ্বের ইতিহাস

আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে, বিশ্বের কোনো-কোনো অঞ্চলে গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে নূতনের বিচ্ছিন্ন ও সাময়িক বিজয় অর্জনের তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী হলেও যথেষ্ট নয়, মনে করিয়ে দিচ্ছে রবীন্দ্রোত্তর এক আধুনিক বঙ্গীয় কবির অমোঘ উচ্চারণ—প্রগতির স্বপ্নের বিশ্বব্যাপী সফল অনুবাদ : সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ।

'বর্ষশেষ' নামাঙ্কিত একটি প্রার্থনা-ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বনিয়মের অন্তর্নিহিত অমোঘ গতিশীলতার সত্যটিকে তুলে ধরেছেন এইভাবে—'যাওয়া-আসায় মিলে সংসার। এই দুটির মাঝখানে বিচ্ছেদ নেই। বিচ্ছেদ আমরা মনে-মনে কল্পনা করি। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় একেবারেই এক হয়ে আছে। সর্বদাই এক হয়ে আছে। সেই এক হয়ে থাকাকেই বলে জগৎসংসার।'

'আজ বর্ষশেষের সঙ্গে কাল বর্ষারম্ভের কোনো ছেদ নেই—একেবারে নিঃশব্দে অতি সহজে এই শেষ ওই আরম্ভের মধ্যে প্রবেশ করছে।'

প্রসঙ্গত, অনিবার্য গতিশীলতার সত্যের সূত্রে জানাচ্ছেন এই ভরসাও—

'দুর্গতি একটা ভয়ঙ্কর বিভীষিকা হয়েই উঠত যদি জানতুম যে যেখানে আছে সেখান থেকে তার আর নড়চড় নেই। কিন্তু আমরা জানি, সমস্ত সরছে এবং সে-ও সরছে, সুতরাং তার সম্বন্ধে আমাদের হতাশ হতে হবে না। অনন্ত চলার মাঝখানে পাপ কেবল একটা জায়গাতেই পাপ, কিন্তু সেখান থেকে সে এগোচ্ছে। আমরা সব সময়ে দেখতে পাই নে, কিন্তু সে চলছে। ওইখানেই তার পথের শেষ নয়—সে পরিবর্তনের মুখে, সংশোধনের মুখেই রয়েছে।'

রবীন্দ্রনাথ এই যে-ভাবে বর্ষশেষকে দেখছেন, সেই একইভাবে দেখা যায় এই সমগ্র বিদায়ী সহস্রাব্দকেই । গ্রহণ করা যায় তাঁর এই পরামর্শও—'কিন্তু, এই শেষ এবং আরম্ভের মাঝখানে একবার থেমে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে দরকার। যাওয়া এবং আসাকে একবার বিচ্ছিন্ন করে জানতে হবে, নইলে এই দুটিকে মিলিয়ে জানতে পারব না।'

সেইজন্যই নতুন সহস্রাব্দের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে আমরা কেবল বিদায়ী সহস্রাব্দের দিকেই মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াতে চাই। যা' আসন্ন তাকে অনুভবে জানি, জ্ঞানে নয়।

'বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যের যোগদৃষ্টি ও ঐক্যের যোগসাধনাই ভারতের বিশেষ ধর্ম অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য'—রবীন্দ্রনাথ ভারতের ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এ কথা ভালোভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। তেমনই বঙ্গভূমির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেছেন সাবলীল ভাষায়—

'নদীর পলিমাটিতে তৈরি এই বাংলাদেশ। এখানে ভূমি উর্বর। বীজমাত্রই এখানে সজীব সফল হয়ে ওঠে। তাই এখানে প্রাণধর্মের একটি বিশেষ দাবি আছে।'

পলিমাটির দেশ বলেই ভূমি কঠিন না-হওয়ার জন্য পুরাতন মন্দির মসজিদ প্রাসাদ প্রভৃতির গুরুভার এখানে সয় না, ধীরে ধীরে তলিয়ে যায়। পুরাতনের ঐশ্বর্য তাই বঙ্গভূমিতে অতীব বিরল। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন, বাংলাদেশ পুরাতনের ভার থেকে মুক্ত বলেই বুঝি জীবনসাধনার দায় তার', পরে অনেক বেশি করেই বর্তেছে। পলিমাটির উর্বরভূমি তো। 'প্রাণ এখানে ব্যর্থ হতে পারবে না। পুরাতনের মৃত পাষাণভার এখানে না-সইলেও জীবনের দাবিদাওয়া এখানে পুরোপুরি সফল হবে।'

যে-বিংশ শতাব্দীর শততম বর্ষটিতে আমরা উপনীত, সেই শতাব্দীর সাহিত্য-সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতিটা কী ছিল, কী ছিল বাংলার ও বাঙালির সাংস্কৃতিক সাধনার ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার ও নূতন অর্জন, বিগত একশো বৎসরের কাল-সীমায়? সেই একশো বৎসরের বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতির চেহারা, চরিত্র ও গতিপ্রকৃতির অন্বেষণ একটি সীমিত পরিসর রচনায় অসাধ্য বলেই লক্ষণীয হতে পারে শুধু সেই অন্বেষণের আঁচ-আভাসটুকু।

বলাই বাহুল্য, এমন হাস্যকর চিন্তা ও সন্ধান কেউ করবেন না, যার অর্থ কোনোমতেও দাঁড়াতে পারে এইরকম যে, ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের সূচনা হতেই বঙ্গদেশে দেখা দিয়েছিল কিছু অভূতপূর্ব লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য এবং ১৯০১ সাল শুরু হতেই আবার দেখা দেবে একগুচ্ছ অভূতপূর্ব চরিত্রলক্ষণ। না। এ-রকম-ভাবে পাঠক-লেখক বা গবেষকের আক্ষরিক সুবিধার্থে ইতিহাস তথা দিন বা বর্ষপঞ্জির ঘটনাধারা অনুষ্ঠিত বা আবর্তিত হয় না নিশ্চয়ই।

তবু, খুবই চমকপ্রদ সমাপতন এই যে, বিংশ শতকে প্রবেশের প্রাক্-কালে অর্থাৎ ১৩০১ সালের সামান্যই আগে-পরে পূর্ববর্তী শতকের বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতিজগতের প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রয়াণ ঘটেছিল। তাঁদের মৃত্যুকে অকালমৃত্যুই বলতে হবে। ১৩০১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত 'বিহারীলাল' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যগুরুর প্রয়াণে যে-সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন করেছিলেন তার সূচনা-অংশের কয়েকটি পংক্তি ঐতিহাসিক গুরুত্বের বিচারেই উদ্ধারের যোগ্য—

'বর্তমান নববর্ষের প্রারম্ভেই কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। বঙ্গের সারস্বতকুঞ্জে মৃত্যু ব্যাধের ন্যায় প্রবেশ করিয়াছে। তাহার

নিষ্ঠুর শরসন্ধানে অল্পকালের মধ্যে অনেকগুলি কণ্ঠ নীরব হইয়া গেল।'

১৩০১ বঙ্গাব্দের বৈশাখে প্রকাশিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে শুধু সাহিত্যস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিই রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেননি, বঙ্কিমের ঈষৎ উত্তর-সমকালীন মনীষী ও বঙ্কিম-অনুপ্রাণিত ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র যে-বঙ্কিমচন্দ্রকে 'গ্রেটেস্ট ম্যান অব্ দ্য নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি'রূপে অভিহিত করেছিলেন, সেই বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে এই যথার্থ মূল্যায়ন করে-ছিলেন যে,

'…যিনি আমাদের মাতৃভাষাকে সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল করিয়া গিয়াছেন তিনি এই হতভাগ্য দরিদ্র দেশকে একটি অমূল্য চিরসম্পদ দান করিয়াছেন। তিনি স্থায়ী জাতীয় উন্নতির একমাত্র মূল উপায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।'

যে-রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, তিনি 'সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা' এবং 'বাংলাদেশের এই একজন অসামান্য মনস্বী পুরুষ মৃত্যুর পরে দেশের লোকের নিকট হইতে বিশেষ কোনো সম্মানলাভ করেন নাই। ইহার একটা কারণ ইঁহার মৃত্যুর অনতিকালের মধ্যে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু ঘটে—সেই শোকেই রাজেন্দ্রলালের বিয়োগবেদনা দেশের চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাহার আর-একটা কারণ, বাংলা ভাষায় তাঁহার কীর্তির পরিমাণ তেমন অধিক ছিল না, এইজন্য দেশের সর্বসাধারণের হৃদয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সুযোগ পান নাই', সেই রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যু হয়েছিল ১১ শ্রাবণ ১২৯৮ এবং বিদ্যাসাগরের মৃত্যু ১৩ শ্রাবণ ১২৯৮ বঙ্গাব্দে।

১৩০২ বঙ্গাব্দের ১৩ শ্রাবণ পঠিত ও ভাদ্র মাসে প্রকাশিত 'বিদ্যাসাগর চরিত' রচনাটি রবীন্দ্রনাথের অক্ষয় কীর্তি বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই মূল্যায়নেও লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, বিদ্যাসাগরের 'প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা' তবু বিদ্যাসাগরের যাবতীয় সাহিত্যিক ও সামাজিক কীর্তির চেয়েও তাঁর 'পর্বতপ্রমাণ চরিত্রমাহাত্ম্যকে'ই, 'অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্য'কেই তিনি 'সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়-রূপে চিহ্নিত করলেন। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের 'সর্ব-প্রধান গুণ'টিকে ব্যাখ্যা করলেন এইভাবে ও ভাষায়—

'…যে-গুণে তিনি (বিদ্যাসাগর) পল্লী-আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালি-জীবনের জড়ত্ব, সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগ-প্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূল-তার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া, হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে,

করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন—আমি যদি অদ্য তাঁহার সেই গুণকীর্তন করিতে বিরত হই তবে আমার কর্তব্য একেবারেই অসম্পন্ন থাকিয়া যায়।'

না। রবীন্দ্রনাথ দেশ ও জাতির, তাঁর ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত বিচার-বিবেচনার দিক থেকেও, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিবাচক ঐতিহ্যের প্রায় কোনো সূত্রই উপেক্ষা করেননি, তাঁর কোনো কর্তব্যই এ দিক থেকে অন্তত 'অসম্পন্ন' থাকেনি। 'স্মরণীয় যাঁরা, বরণীয় যাঁরা', তাঁদের স্মরণ-বরণ ও মননের মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ, ১২৬৮ থেকে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রসারিত প্রায়-সম্পূর্ণ একটি শতককে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন বিস্ময়কর অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে।

যে-বিদায়ী বিংশ শতকের সামগ্রিক মূল্যায়নে এখানে আমরা প্রবৃত্ত, তার প্রায় অর্ধাংশ জুড়েই তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে তাঁর প্রয়াণকাল পর্যন্ত শুধু আমাদের সাহিত্যে ও সংস্কৃতি-জীবনে নয়, সমগ্র জাতীয় জীবনেও তিনি ছিলেন প্রায়শ দিশারির ভূমিকায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাঁর মতামতের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

মননপ্রতিভার কোন্ ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে এবং এখন তাঁর মৃত্যুর ষাট বৎসর পরেও ২০০০ খ্রীস্টাব্দেও তাঁর দেশ ও জাতির কাছে প্রেরণা ও প্রাসঙ্গিক-রূপে প্রতিভাত, সেটি বুঝে নেওয়া নিঃসন্দেহে জরুরি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই ১৩১৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক পটভূমিতে ভারতসংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান করেছিলেন। প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমেই শুরু করেছিলেন, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস কাহাদের ইতিহাস'। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে 'আমরা বৃহৎ ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আছি'—এই তাঁর উত্তর। আধুনিক য়ুরোপের 'চিত্তদূত'রূপে সাহিত্য-সংস্কৃতি জ্ঞানবিজ্ঞানের যে-সম্ভার নিয়ে ইংরেজ ভারতবর্ষে এসেছিল, সেই সম্ভারকে আত্মস্থ করতে না-পারলে ভারতবর্ষই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, রবীন্দ্রনাথ এই সত্যটি অনুধাবন করেছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী ও সমকালের মুক্তচিত্ত ও উদারমতি মনীষিবৃন্দের চিন্তাধারাই তাঁকে প্রাণিত করেছিল। তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন রামমোহন। রামমোহনের জীবনসাধনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অক্লান্ত উচ্চারণে অভিভূত। 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ

লিখেছিলেন :

'অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড়ো মনীষী, তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মিলাইয়া লইবার এই কাজেই জীবনযাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায়। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন। কোনো প্রথা কোনো সংস্কার তাঁহার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। আশ্চর্য উদার হৃদয় ও উদার বুদ্ধির দ্বারা তিনি পূর্বকে পরিত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই একলা সকল দিকেই নব্যবঙ্গের পত্তন করিয়া দিয়াছেন।'

এই প্রবন্ধেই তিনি পশ্চিম ভারতে রানাডে-র কর্মকাণ্ডকে 'পূর্বপশ্চিমের সেতুবন্ধনকার্যে' নিয়োজিত বলে উল্লেখ করলেন এবং লিখলেন, 'অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন।' এই প্রবন্ধে পুনরায় স্মরণ করলেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাকে, কেননা, 'বঙ্কিম যাহা রচনা করিয়াছেন, কেবল তাহার জন্যই যে তিনি বড়ো তাহা নহে, তিনিই বাংলাসাহিত্যে পূর্ব-পশ্চিমের আদানপ্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলনতত্ত্ব বাংলাসাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার সৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।'

উল্লেখ্য, ১৩০১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা। পরিষদ পত্রিকার প্রথম বর্ষ থেকেই রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে শব্দতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন এবং সংগৃহীত লোকসাহিত্য প্রকাশ ও আলোচনায় ব্রতী হন। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং নবপর্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রকাশও বিংশ শতাব্দীর সূচনা ঘটে যায়। বিপিনচন্দ্র পালের নিউ ইন্ডিয়া (সাপ্তাহিক) ও কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' প্রকাশ, বিবেকানন্দের মৃত্যু সমস্তই ১৯০২ সালের ঘটনা। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বরের গেজেটে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব। ১৯০৬ সালের ১১ মার্চ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা।

তথ্যসন্নিবেশ ও পরিসংখ্যান প্রভৃতির মধ্যে বিস্তারিত না-গিয়েও বোধ করি খুব সংক্ষেপে এটুকু এখন বলাই যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, বঙ্গীয় সমাজজীবনে তুমুল আলোড়ন সমুপস্থিত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই সত্যটি স্পষ্টতর হতে থাকল।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দিক থেকে যখন ভাবি, তখন দেখি—রামমোহন,

বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ : এঁদের কারও মূল্যায়ন সম্পূর্ণ হয় না, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে এঁদের ভূমিকার সঠিক গুরুত্ব-বিশ্লেষণের দিকটিকে এড়িয়ে গিয়ে। আবার রামমোহন-বিদ্যাসাগরের বাংলা গদ্যচর্চার দিকটি তাঁদের সমগ্র জীবনসাধনার একাংশ মাত্র। যদিও সাহিত্যের বিচারেই দেখা যায়, তাঁদের গদ্যশৈলীর ভিত্তি রচনা করেছে তাঁদের জীবনদর্শন ও জীবনযাপন-সংক্রান্ত প্রতিবাদী চরিত্রমাহাত্ম্য।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ রামমোহন-বিদ্যাসাগরের তুলনায় অনেক বেশি সাহিত্যনিবিষ্ট ব্যক্তিত্ব, তবু সৃষ্ট সাহিত্যের জোরেই শুধু যে তাঁদের সামগ্রিক মূল্য ও মহিমা, এমন কথা বলা চলবে না। সমকালের সমস্ত প্রসঙ্গে এমন ভাবুক ও দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব এবং সমকালের সীমানা ছাড়িয়ে ভাবীকালেও প্রসারিত মননকল্পনাসম্পন্ন এমন প্রতিভা সর্বদেশে-সর্বকালেই বিরল।

'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও সমকালের মনস্বী ব্যক্তিত্ব। শুধু পত্রিকা-সম্পাদনার গুণেও তিনি অবিস্মরণীয় কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় এই যে, তাঁর সমগ্র জীবনসাধনার প্রতিফলনেই তাঁর সম্পাদনার কাজ জাতীয় গুরুত্ব ও মর্যাদামণ্ডিত। মডার্ন রিভিয়ু, ভগিনী নিবেদিতা, মহাত্মা গান্ধী এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিপ্রেক্ষিকায় রামানন্দ সমকালীন জাতীয় জীবনের গঠনে ও লালনে যেন ধাত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

যে-বিংশ শতাব্দী অবসিত প্রায়, তার প্রথম পাদেই রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় ও প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত (১৯১৪, ১৩২১) 'সবুজপত্র' পূর্ববর্তী নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-'প্রবাসী'-'ভারতবর্ষ' প্রভৃতির পুনরাবৃত্তি নয়। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরুর বছর থেকে প্রকাশিত 'সবুজপত্র' নবযুগের বার্তাবাহী, যুক্তিনিষ্ঠ আধুনিক চেতনার, গতিশীল জীবনবোধের উচ্চারণ তাতে সুস্পষ্ট। 'বলাকা'র কিছু কবিতা, চতুরঙ্গ-ঘরে বাইরের মতো উপন্যাস, স্ত্রীর পত্র-পয়লা নম্বরের মতো নারী-ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব ঘোষণাময় গল্পপ্রকাশের মাধ্যম 'সবুজপত্র' ছাড়া আর কোন্ পত্রিকাই বা হতে পারত তখন!

রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে'র পুনরাবৃত্তি নয়, দেশকালপাত্রের পরিবর্তিত মেজাজমর্জিরই প্রতিবিম্বন, রচনাশৈলী ও মনোবিশ্লেষণেও কালান্তরের, তেমনই 'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন-এ ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হলেও 'চোখের বালি'-র ধারাবাহিক প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের নবপর্যায় বঙ্গদর্শনেই অপেক্ষিত ছিল।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের অংশগ্রহণ ছিল প্রত্যক্ষ, রবীন্দ্র-

সাহিত্যে ও রবীন্দ্র-কর্মপ্রবাহেই তার নিদর্শন। সমকালীন রবীন্দ্রসংগীত. 'স্বদেশী-সমাজ' প্রবন্ধ এবং স্বল্প-ব্যবধানে প্রকাশিত 'গোরা' উপন্যাস আর সভাসমিতি প্রভৃতি সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড সর্বজনবিদিত। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় ছাড়া 'গোরা' উপন্যাসটি সুদীর্ঘকাল ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারতো আর কোথায়? স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে লিখিত 'ঘরে-বাইরে' প্রকাশিত হলো ধারাবাহিকভাবে সবুজপত্রে। এই উপন্যাসটিকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় লেখক মূলকরাজ আনন্দ প্রথম আধুনিক ভারতীয় উপন্যাসরূপে চিহ্নিত করে থাকেন। 'চতুরঙ্গ'-এর আধুনিকতাও সাহিত্যে ও জীবনে আধুনিকতার বার্তাবাহী সবুজপত্রেই প্রকাশিত হয়েছিল সঙ্গতকারণেই।

প্রথম মহাযুদ্ধকালে ১৯১৭ সালে সংঘটিত রুশবিপ্লবের প্রভাব ও প্রেরণায় বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত কথাসাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কবি নজরুল ইসলাম 'কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি'র সাহিত্য-আন্দোলনের প্রেরণা-উৎস। নরেশচন্দ্র ও নজরুল রবীন্দ্রোত্তর অর্থাৎ রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্তিতে সচেষ্ট সাহিত্যিক-দের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। ভিন্নতর জীবনাদর্শ সত্ত্বেও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলালও কবিরূপে এই পর্যায়ভুক্ত। তথাপি, নরেশচন্দ্র ঢাকা অবস্থানকালে জগন্নাথ হল থেকে 'বাসন্তিকা' নামে যে-পত্রিকা প্রকাশনায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সেই পত্রিকাতেই 'কল্লোল'-এর বীজ বোনা হয়েছিল। কলকাতাই বঙ্গসাহিত্যচর্চার একমাত্র কেন্দ্র নয়, ঢাকার ভূমিকাও সমধিক, অধুনা 'বাংলাদেশ' সৃষ্টির অনেককাল আগেই নরেশচন্দ্র তার সূচনা করেছিলেন, এই কথা আজ বিশেষভাবে স্মরণীয় বলে আমি মনে করি। চৈত্র, ১৩২৯ অর্থাৎ ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে নরেশচন্দ্র 'বাসন্তিকা' প্রকাশ করেন ঢাকায় এবং অধ্যাপক সুকুমার সেনের মতে 'বাসন্তিকা'-র মাধ্যমেই, নরেশচন্দ্র তরুণ প্রগতিশীল লেখককুলকে সারথ্য দিয়েছেন। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ ১৩০০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয় 'কল্লোল'।

বস্তুত নজরুল ও নরেশচন্দ্র প্রায় একই সঙ্গে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ রুশ-বিপ্লব ও মার্কসীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁদের কাল ও সমাজকে এই নতুন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বহু-প্রচলিত বিভ্রম-নিরসন বাঞ্ছনীয়। বাংলা ভাষাসাহিত্যচর্চার কেন্দ্র যেমন শুধু কলকাতাই নয়, ঢাকাও, তেমনই বাংলা-সাহিত্য ও সংস্কৃতিও হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার ফসল। এখানেই প্রাসঙ্গিক

বিবেচনায় উদ্ধৃত করছি, এপার বাংলায় অধুনা-বিস্মৃতপ্রায় কিছু তথ্য, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখিত 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা' থেকে—

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে কলকাতার একটি সাহিত্য-সংগঠনের নাম ছিল 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'। বহুজনের সহযোগে আমিও এই সংগঠনটিকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেম। মুহম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেব ছিলেন সমিতির সম্পাদক।...

বাংলা ১৩২৫ সালের বৈশাখ মাসে (খ্রীস্টাব্দ ১৯১৮ সালের এপ্রিল-মে মাস) সমিতির একখানা ত্রিমাসিক মুখপত্র বা'র হয়। নাম দেওয়া হয়েছিল 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'।

প্রসঙ্গ দীর্ঘ না-করেও বলা যায়, এই পত্রিকা পরিকল্পনাসূত্রে চিঠিপত্রের মাধ্যমে ১৯১৮ সালেই নজরুলের সঙ্গে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের প্রথম পরিচয় ঘটে। ১৯১৯ সাল থেকেই নজরুলের রচনা 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসে নজরুলের বন্ধু শৈলজানন্দ নজরুলকে নিয়ে সাহিত্য সমিতির কার্যালয়ে আসেন। দু'জনের সঙ্গেই পরিচয় হয় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের। মাস দু'য়েক পরেই নজরুল আর মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ একসঙ্গে থাকতে লাগলেন সাহিত্য সমিতির কার্যালয়ে। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন, 'একটি অদ্ভুত যোগাযোগ বলতে হবে। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে কাজী নজরুল ইসলাম থাকতে এলো, আর কার্যত ওখান থেকেই বার হতে যাচ্ছিল 'মোসলেম ভারত' নামক মাসিক পত্রিকাখানি।'

১৩২৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে শুরু করে প্রথম বারো মাসে নজরুলের তেরোটি রচনা প্রকাশিত হয় 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায়। নজরুল ও 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সম্পর্ক বহুলাংশে রবীন্দ্রনাথ ও 'প্রবাসী'র অনুরূপ। পরস্পরের পরিপূরক ও খ্যাতিবৃদ্ধির কারণ।

উল্লিখিত সাহিত্য সমিতির নাম কেন 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' হয়েছিল সে বিষয়ে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ডক্টর সুকুমার সেনকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা-ও প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য—

'আমরা কয়েকজন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্য ছিলাম। সেখানে হিন্দু-মুসলমান কোনো ভেদ না-থাকলেও আমরা বড়োলোকের ঘরে গরীব আত্মীয়ের মতন মন-মরা হয়ে তার সভায় যোগদান করতাম। আমাদের মনে হলো বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সম্বন্ধ বিলোপ না-করেও আমাদের একটি নিজস্ব

সাহিত্য-সমিতি থাকা উচিত। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় ৯নং আন্তনিবাগান লেনে মৌলবী আবদুর রহমান খানের বাড়ীতে ১৯১১ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর এক সভা আহুত হয়।···আমি সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদক হই।'

১৯১৮ সালে সমিতির ত্রৈমাসিক মুখপত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত হলে পত্রিকার নাম নিয়ে তর্ক হয়। মুজফ্ফর আহ্মদ প্রমুখ গরিষ্ঠসংখ্যক সভ্য চেয়েছিলেন, পত্রিকাটির নাম হোক 'সাহিত্য পত্রিকা' কিন্তু প্রধান সভাপতির যুক্তি ছিল, হিন্দুরা এ পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করবেন না, তবে কেন মুসলমানদের মনে সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি করা? অন্তত মুসলমানরা বুঝুন যে, পত্রিকাখানা মুসলমানদের। 'এটাই ছিল তখনকার লোকদের মানসিকতা', মুজফ্ফর আহ্মদ এই মন্তব্য করে লিখেছেন, 'অস্বীকার করে লাভ নেই।' তবে, তাঁর বক্তব্য : 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকাও সাম্প্রদায়িক কাগজ ছিল না, মোসলেম ভারতও নয়।'

অতঃপর নজরুল সাগ্রহে মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিলেন। ১৯২০ সালের ১২ জুলাই দু'জনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হলো 'নবযুগ'। ১৯২২ সালের ১২ আগস্ট নজরুল 'ধূমকেতু' প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরই সম্পাদনায়। ১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর নজরুলের পরিচালনায় (সম্পাদকরূপে নাম প্রকাশিত হতো মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের) প্রকাশিত হয় 'লাঙল'।

১৯২৬ সালের ৩ জানুয়ারি নজরুল কৃষ্ণনগরে চলে গেলেন। এইখানেই রাজনৈতিক সূত্রে বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল অর্থাৎ ইংরেজিতে 'দ্য ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজান্টস পার্টি অব বেঙ্গল' গঠিত হয়। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত ও নজরুল পরস্পরের সন্নিহিত হলেন এইভাবে। ১৯২৬ থেকে ১৯২৮-এর শেষ পর্যন্ত প্রায় পুরো তিন বছরই কৃষ্ণনগরে ছিলেন নজরুল।

সাহিত্য-সংস্কৃতি যে জীবনবিচ্ছিন্ন নয়, রাজনীতির সঙ্গেও নয় নিঃসম্পর্কিত, তা' ক্রমশ স্পষ্টতর হতে থাকল শতাব্দীর তিরিশের দশকের মুখোমুখি এসে। মার্চ, ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে নজরুল ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত-র বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ তুলে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখেছিলেন সজনীকান্ত দাস। মোহিতলাল তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। ১৩৩৩-৩৪ বঙ্গাব্দের এই সাহিত্য-বিতর্কের ভিত্তি যে রাজনৈতিক অবস্থানের সূত্রে, সে-বিষয়টি আমি অন্যত্র প্রকাশিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বস্তুত এই সাহিত্যিক দ্বন্দ্ব ছিল সাহিত্যে প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার বিরোধী

দুই শিবিরের দ্বন্দ্ব। এই বিতর্কে রবীন্দ্রনাথকেও তাঁর অবস্থান অবশেষে স্পষ্ট করতে হয়েছিল। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে তথা ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঘুরে এলেন সোভিয়েত থেকে। 'রাশিয়ার চিঠি' থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রগতির অবস্থান স্পষ্ট হয়ে গেল। মীরাট 'ষড়যন্ত্র' মামলার অভিঘাতে সমগ্র দেশ যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করল।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হলো 'পরিচয়' পত্রিকা। 'কল্লোল' নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছেন অচিন্ত্যকুমার, বলেছেন 'কল্লোলযুগ'। গোপাল হালদার তাঁর স্মৃতিচারণায় সঠিকভাবেই বলেছেন, 'যুগ নয়, হুজুগ'। কল্লোলীয়রা এলিয়ট, প্রুস্‌ৎ জয়েস্‌দের সন্ধান জানতেন না। কিন্তু 'আসলে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যুগ ঘটিয়েছে দু'টি পত্র—বঙ্গদর্শন ও সবুজপত্র। আরেকটি যুগান্তর ঘটিয়েছিল, কিন্তু সে ত্রৈমাসিক পত্র, পরিচয়।'—গোপাল হালদারের এই মূল্যায়নই যথার্থ, সন্দেহ নেই।

১৯৩৬ সালের ১০ এপ্রিল প্রগতি লেখক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণরূপে পঠিত 'সাহিত্যের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য' এবং মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পূর্বে লিখিত 'মহাজনী সভ্যতা' শীর্ষক প্রবন্ধদুটি থেকে আমরা মুন্সী প্রেমচন্দ্‌কে পুরোপুরি 'কলম-কা-সিপাহী'-রূপে পেয়ে যাই। এদিকে অবিভক্ত বাংলায় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। প্রগতির পথ বেয়েই বাংলাসাহিত্যের মানিক-সোমেন-সুকান্তরা প্রার্থিত নব-যুগের সাধনায় ব্রতী হয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে হিটলার সোভিয়েত আক্রমণ করতেই বাংলার লেখকশিল্পী-বুদ্ধিজীবী অধিকাংশই সোভিয়েতের 'নূতন সভ্যতা'কে রক্ষার আহ্বানে শামিল হলেন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্নেহাংশুকান্ত আচার্য কর্তৃক প্রস্তুত সেই আবেদনপত্রে সেদিন স্বাক্ষর করেছিলেন দেশবরেণ্য প্রবীণ সাহিত্যিক-বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে নবীনতম লেখক-বুদ্ধিজীবী প্রায় সকলেই। যুদ্ধ, মন্বন্তর প্রভৃতির ছায়াপাত বাংলাসাহিত্যেও ছিল অনিবার্য। গড়ে উঠেছিল গণনাট্য সঙ্ঘ। নবান্ন নাটকের রচনা, অভিনয় সমস্তই আজ সমকালীন ইতিহাসের চিরকালীন স্মারক। জনযুদ্ধ , সুকান্ত, সোমেন চন্দ। দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা—অতঃপর লেখকশিল্পীদের একাংশের পার্শ্বপরিবর্তন, বিশিষ্ট বুদ্ধি-জীবীদের কারও-কারও আত্মকেন্দ্রিক পশ্চাদপসরণ! ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের মঞ্চে নিঃশব্দে উপবেশনের পালা। সংবিধানের লোককল্যাণকর অংশগুলির রূপায়ণে নেহরুরাজের চরম ব্যর্থতা, ত্রুটিপূর্ণ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির

দৌলতে ঠিকাদার পর্যায়ের মুষ্টিমেয় অংশের অভ্যুত্থান, জনসাক্ষরতার প্রতিশ্রুতি পালনে শাসকদলের নিদারুণ অনীহা, কেরালায় দেশের প্রথম কমিউনিস্ট রাজ্য-সরকার উৎখাতের মাধ্যমে নেহরুকন্যার রাজনীতি ক্ষেত্রে সক্রিয় আবির্ভাব। খণ্ডিত, উদ্বাস্তু-অধ্যুষিত এই পশ্চিমবঙ্গে দারিদ্র্য, বেকারি এবং অবশেষে ষাটের দশকের প্রথমার্ধে সুতীব্র খাদ্যসঙ্কট। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ, কমিউনিস্ট পার্টির একাংশের শোচনীয় আত্মখণ্ডন। সঙ্কট যখন সর্বতোমুখী, মার্কসবাদীদের নেতৃত্বে আন্দোলন-সংগ্রামও তখন ক্রমশ তুঙ্গাভিলাষী। খাদ্য আন্দোলন জনসাধারণের প্রতিবাদী চেতনাকে সংহত রূপ দিচ্ছে, শাসক দলের অন্তঃসারশূন্যতা, অপদার্থতা জনসমক্ষে এতদিনে বহুলাংশে পরিস্ফুট।

এই অপদার্থতা এমনই প্রকট যে, শিক্ষায়, শিল্পে, সমগ্র ভারতে একদা অগ্রণী পশ্চিমবঙ্গের স্থান ষাটের দশকের মাঝামাঝি এসে ক্রমশ নিম্নাভিমুখী হয়েছে।

এই সময় থেকে শিল্পসাহিত্য ক্ষেত্রেও প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব পৌঁছেছে চরমে। লেখক-শিল্পীদের একাংশ ও সংস্কৃতিজগতের বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত শাসকদলের দাক্ষিণ্যলোভাতুর ভূমিকায় পরিতুষ্ট ও পরিপুষ্ট, পাশাপাশি সমাজসচেতন ও দায়িত্বশীল শিল্পসাহিত্যের উদ্‌ভাবনা ও অনুশীলন লক্ষণীয় হয়ে উঠতে থাকে উত্তরোত্তর।

এইভাবেই শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে সুস্থ সৃজনশীলতাকে রক্তাল্পতায় মুমূর্ষু বানাবার ফিকিরে বাজারের পণ্যসামগ্রীতে পর্যবসিত করার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। প্রকাশিত হতে থাকে বিবরধর্মী, প্রজাপতি-রঙিন, পাতককাহিনী : একের পর এক।

কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পরে মার্কসবাদীদের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে গণ-আন্দোলনগুলি যখন দুর্বার, তখনই কেন এই ধরনের আত্ম-কণ্ডূয়নমূলক হতাশ্বাস সাহিত্য ('literature of despair') এই রাজ্যে ব্যাপকভাবে আমদানি করা হতে লাগল, তা বুঝে-নেওয়া খুব কঠিন নয়। আমি অন্যত্র লিখেছি ('সাহিত্যে প্রগতির দর্শন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)—
" 'ব্যক্তি'-স্বভাব বিশ্লেষণে মগ্ন এই দর্শন ও সাহিত্য—স্পষ্টতই যা' সামাজিক 'দায়'-বদ্ধতার মার্কসবাদী চেতনার বিরোধী, মার্কসবাদী চিন্তাধারার অগ্রগতিকে ব্যাহত ও প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে সেই দর্শন ও সাহিত্যকেই যে নানা কৌশলে ব্যবহার করবে কমিউনিস্ট-বিরোধীরা এতে বিস্ময়ের কোনো অবকাশ নেই।"

কোনো একজন বা দু'-চারজন কবি-কথাসাহিত্যিক-প্রাবন্ধিক মিলে এই ধরনের একটা প্রতিক্রিয়াশীল আবর্জনা সৃষ্টি করেছেন বা করে চলেছেন, সমস্যাটা তেমন নয়। একথা স্থূল শোনালেও কথাটা অসত্য নয়, শিল্পসাহিত্য হাতিয়ারই বটে। খুব স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন মুন্সী প্রেমচন্দ্ ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে, প্রগতি লেখক সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে।

প্রশ্নটা হলো : কে বা কারা সেই হাতিয়ারকে ব্যবহার করবে কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে? শিল্পসাহিত্য, হ্যাঁ, বিশুদ্ধ শিল্পসাহিত্যই ইতিবাচক জীবনবোধকে গভীর ব্যাপক ও শাণিত করতে পারে আবার শিল্পসাহিত্যকে বাজারি পণ্যরূপে ব্যবহারের মাধ্যমে মুনাফাবৃদ্ধির কাজেও লাগানো যেতে পারে, তার ফল যতই শোচনীয়রূপে জীবনবিমুখতাকে আত্মহননের দিকে ঠেলে দিক না কেন!

সেই প্রথম প্রগতি লেখক সম্মেলনের সমকালেই ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ৫ ফাল্গুন লিখেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ :

'বস্তুত, নবযুগপ্রবর্তক প্রতিভাবানের সাধনায় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে বাংলা-দেশেই য়ুরোপীয় সংস্কৃতির ফসল ভাবীকালের প্রত্যাশা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, বিদেশ থেকে আনীত পণ্য আকারে নয়, স্বদেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্যসম্পদের মতো। সেই শস্যের বীজ যদি-বা বিদেশ থেকে উড়ে এসে আমাদের ক্ষেত্রে পড়ে থাকে তবু তার অঙ্কুরিত প্রাণ এখানকার মাটিরই। মাটি যাকে গ্রহণ করতে পারে সে ফসল বিদেশী হলেও আর বিদেশী থাকে না। আমাদের দেশের বহু ফলেমূলে তার পরিচয় আছে।'

গ্যেটে দ্বিধাহীনচিত্তে কালিদাসের শকুন্তলাকে গ্রহণ করেছেন, মাইকেল মিলটন-হোমর-ভার্জিল-দান্তে প্রমুখকে, বঙ্কিম কোঁৎ-মিল-বেন্থামকে এবং একটি পর্যায়ে সোশিয়ালিস্টিক ধ্যানধারণাকেও। বস্তুত, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ : কে-ই বা পাশ্চাত্য শিল্পসাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে 'বিদেশী' বলে বাতিল করেছেন? প্রশ্ন : কী গ্রহণ করছেন? কেন গ্রহণ করছেন? গ্রহণের কায়দাটা প্রাচ্য না পাশ্চাত্য : তাতে কী-ই বা এসে যায়? সাম্যবাদী জীবনদর্শন : কতটা প্রাচ্য, কতটা পাশ্চাত্য, তাতেই বা কী?

শিল্পসাহিত্যের সম্ভারকে মুনাফা লুটবার 'পণ্য' হিসাবে দেখব, না-কি আমাদের জীবনবোধকে শাণিত করার লক্ষ্যে শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বে বিক্ষত জীবনের মধ্যেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবকে পেতে শিল্পসাহিত্যের দিকে এগিয়ে যাব?

ষাটের দশকের প্রায় মাঝামাঝি থেকে সারা দেশেই, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে

অসাহিত্যিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বাণিজ্যিক চক্রগুলি শিল্পসাহিত্যের এলাকায় পদ্মবনে মত্ত হস্তীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে, যা-কিছু কুৎসিত বীভৎস তাকেই 'শিল্পিত', 'মনোহর' ও অ-সচেতন বা অনতিসচেতন দর্শক-পাঠকের কাছে 'হৃদয়গ্রাহী' করে তুলবার তিমিরবিলাসিতায় তারা প্রমত্ত।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেমন অনুভব করেছিলেন—বাংলাদেশের দুঃখের অন্ত নেই। তবু যাঁরা সত্যকার বাংলাদেশের সাধকসন্তান তাঁরা কখনো এই দুঃখকে কোনোমতেই এড়াতে চান নি। এই সাধনায় চিরদিনই বাংলা সাড়া দিয়েছে। তার জন্য প্রাণ বিসর্জন করতেও সে ভয় পায় নি। প্রাণের নামে মানবতার নামে দাবি করলে এখানে সাড়া মিলবে। জীবনের ক্ষেত্রে জীবনের দাবিই চলে। কিন্তু তাই বলে এ দেশের সাধনাকে পুরাকালের পাথরের জগদ্দল চাপে কঠিন ও ভারগ্রস্ত করে রাখলে তো চলবে না। মন্দিরের প্রাসাদের পাষাণভারে বাংলাদেশের উর্বর বিস্তারটিকে ঢেকে ফেলে জীবনের সেই দায়িত্বকে এড়াতে চাইলে আমরা হব ধর্মভ্রষ্ট।

না। বাংলার মানুষ মানুষের ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হননি। তাই ১৯০১ এবং '৭০-'৭৭ কাল পর্যায়ের শীর্ষেও বাংলা সাড়া দিয়েছে। বাংলার মানুষ প্রাণ বিসর্জন করতেও ভয় পায়নি। জীবনের ক্ষেত্রে জীবনের দাবিই জয়যুক্ত হয়েছে।

যে সমস্ত সাল বা কালপর্যায়ের চকিত উল্লেখই স্বল্প পরিসরে সম্ভব হলো, সেগুলির কোন্‌টির তাৎপর্য কত গভীর বা ভয়াবহ, বাংলার মানুষের তা অজানা নয়। এই ধরনের ঘটনাবলীতে প্রাণের অভিযান, সেই অভিযান স্তব্ধ করার পাশবিক উল্লাস এবং তবু 'প্রাণ এখানে ব্যর্থ হয় না, জীবনের দাবি এখানে সফল হবেই'—প্রত্যেকটি স্তর লক্ষণীয় হয়েছে।

তাই আমাদের এই রাজ্যে সাহিত্য, মঞ্চ , চলচ্চিত্র, শিল্প, ভাস্কর্য এবং সর্বোপরি লোকসংস্কৃতির অনুশীলনে ইতিবাচক দিকটিই বিগত প্রায় উনিশ বৎসরকালব্যাপী ক্রমিক প্রাধান্য, প্রচেষ্টা ও বিস্তার লাভ করছে। বাংলা চিরকালই প্রতিবাদী চরিত্র নিয়ে দেশের মানচিত্রে বিদ্যমান, এ কথা কোনো রাজনৈতিক নেতার বক্তব্য নয়, রবীন্দ্রনাথেরই মূল্যায়ন, এতে প্রাদেশিক সংকীর্ণতার কোনো চিহ্ন নেই, এ হলো ইতিহাসেরই সত্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষা তুলে দিয়েছেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন :

নানা ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের সাধনার ইতিহাস দেখলে আমার এ সব কথার সত্যতা বোঝা যাবে। মানবপন্থী বাংলাদেশ প্রাচীনকালেও ভারতের শাস্ত্রপন্থী

সমাজ-নেতাদের কাছে নিন্দনীয় ছিল।···বাংলাদেশ চিরদিনই শাস্ত্রগত-সংস্কারমুক্ত।···

বাংলার বৈষ্ণব ও বাউলগানেও রবীন্দ্রনাথ এই সংস্কারমুক্ত মানবপ্রেমের প্রতিষ্ঠা দেখেছেন। এ দেশের কীর্তন-বাউল-ভাটিয়ালি গানে খুব সাদা কথায় এমন অপূর্ব মানবীয় ভাব ও রসের সন্ধান খুঁজে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ যে, অভিভূত উচ্চারণে বলেছেন, 'কোথাও তার তল মেলে না, কূল মেলে না'!

আজ এই মুহূর্তের ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্যরূপে পশ্চিমবঙ্গ বিচিত্র-জটিল যে সঙ্কটের সম্মুখীন, তা-ও যেমন ঘটনা : সেই সঙ্কটের থেকে আমাদের ক্রমমুক্তিও তেমনই ঐতিহাসিক নিয়মেই সত্য। কিন্তু তা কোন্ পথে? সাহিত্য ও সমাজ জীবনের দিক থেকে উত্তরটা পাই রবীন্দ্রনাথেই। তিনি বিদায়ী বঙ্গীয় শতাব্দীর প্রায় সূচনা থেকেই সমাধানের পথ খুঁজেছেন লোকজীবনে, লোকচর্যায়, লোকসাহিত্যে। বঙ্গীয় ভদ্রসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি তাঁরই ভাষায়, 'নিচের দিকে'।

১৯০১ সালে 'রবীন্দ্রসংস্কৃতি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ('বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য' সংকলনটি দ্রষ্টব্য) মূলকরাজ আনন্দের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করেছিলাম প্রসঙ্গত। তা এখানেও প্রাসঙ্গিক। মূলকরাজ আনন্দ বিস্ময় বোধ করেননি, যখন বুঝেছেন, রবীন্দ্রনাথ কত সাবলীলভাবে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের নির্যাস সহজ উত্তরাধিকারের মতো আত্মস্থ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মতে, 'উত্তরাধিকারের এত বিত্ত ও বৈভব সত্ত্বেও তিনি যে অন্তঃপ্রেরণার তাগিদে ক্ষীয়মাণ লোকসংস্কৃতির শীর্ণধারার দিকে ছুটে গিয়েছেন, পাশ্চাত্য আবেগ-অনুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েও যে সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের মতো তার বহিরঙ্গরূপের কাছে আত্মবিক্রয় করেননি, এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব।'

বিংশ শতাব্দীর শেষতম নববর্ষে যেন কিছুতেই না ভুলি—

মানুষের নববর্ষ আরামের নববর্ষ নয়, সে এমন শান্তির নববর্ষ নয়—পাখির গান তার গান নয়, অরুণের আলো তার আলো নয়। তার নববর্ষ সংগ্রাম করে আপন অধিকার লাভ করে : আবরণের পর আবরণ ছিন্ন বিদীর্ণ করে তবে তার অভ্যুদয় ঘটে।

কোশাম্বী তাঁর বিশ্রুত ইতিহাস বইটিতে আর্য-ভাবিত বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতীয় ভাষাসাহিত্যের আরম্ভ পর্বে সংস্কৃত ছাঁদের প্রতিপত্তির কথা যখন উল্লেখ করেন, তখন পরের বাক্যেই মনে করিয়ে দেন, সাধারণ মানুষের স্মৃতিধার্য কবীর জোলা, মামুলি চাষী ও শস্যবিক্রেতা তুকারাম প্রমুখ রচয়িতার কথা 'who composed in the popular idiom, using figures of speech familiar to the common man.'

কোশাম্বীও কবীর-তুকারাম প্রমুখের গানে-রচনায় ধর্মীয় অনুষঙ্গ ও পবিভাষার ব্যবহার দেখেছেন। সমকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসকশ্রেণীগুলির হাতের অস্ত্র হয়ে উঠেছিল ধর্ম। শোষণেব হাতিয়ার ধর্ম বলেই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কবিতার বা গদ্যের ভাষা ও প্রকাশও স্বভাবতই একই ধর্মীয় ভাবাদর্শের গড়ন বা নির্মাণশিল্পকেই অঙ্গীকার করে নিয়েছিল। ধর্মীয় অভ্যুত্থানগুলির ভিত্তিমূলে নিহিত ছিল সম্পত্তি-সম্পর্কের বিপুল পরিবর্তন-ধারা, তা-ও স্পষ্টত অনুভব করেছিলেন কোশাম্বী। ধর্মই ছিল ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব, ধর্মের পুঁজি ভাঙিয়েই শাসককুলের সেবা আর তুষ্টির কাজ চালিয়ে গেছে ব্রাহ্মণ্য সমাজ। ধর্মই কঠিন মুঠিতে ধরে রেখেছিল উদ্বৃত্ত উৎপাদনকাবীদের। তার মুখ্য সামাজিক প্রকাশ বর্ণাশ্রম বা জাতিপ্রথা। একটা সময়ে শান্তিপূর্ণ বা নির্ঝঞ্ঝাট সমাজ গঠনে এই বর্ণাশ্রম খুবই কাজে এসেছিল। বর্ণাশ্রম শক্তপোক্ত হতেই এই একই প্রক্রিয়া সমাজের সেই অংশের লোকের সহায়ক হচ্ছিল, যারা স্থিতাবস্থা থেকেই সর্বাধিক মুনাফা কামাতে সমর্থ।

কোশাম্বীর ইতিহাস বইতে কবীর-প্রসঙ্গ দ্বিতীয়বার উত্থাপিত হয়েছে যখন অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে নতুন ধর্ম-সম্প্রদায় বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্মের বেড়াজাল ছাপিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছে, সেই প্রসঙ্গ এসেছে। সাম্প্রদায়িক ধর্মেব বেড়াজাল ভেঙেছে বা ভাঙার উপক্রম হয়েছে যখন হিন্দু-মুসলিম কৃষক সম্প্রদায় একই গ্রামীণ জীবনের শরিক হতে পেরেছে। এই বিষয়টিকে তথ্যসমৃদ্ধ ও প্রসারিত করা হয়েছে মার্কো পোলো ও ইবন বতুতার সাক্ষ্য উল্লেখের সাহায্যে। সিংহলের আদম-শৃঙ্গের পরে স্থাপিত স্মৃতি-অবশেষের উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের জন্য সমবেত বৌদ্ধ, মুসলিম ও খ্রীস্টানদের দেখেছিলেন তাঁরা। আসাম ও বাংলায় এইভাবেই দেখা গেছে বিমিশ্র সম্প্রদায়কে সমবেত হতে কোনো দেবস্থানে অথবা এমন কোথাও যেখানে দেবত্বে উন্নীত কোনো মানুষকে সন্ত-সাধকোচিত পীরের মাহাত্ম্যে

স্থাপিত করে অনায়াসে ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন সম্ভব।

এই সূত্রেই সত্য পীরের কথা ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আরম্ভের আগে এ-রকম কোনো 'কাল্ট' গড়ে উঠেছিল, এমন সাক্ষ্যপ্রমাণ কোশাম্বী অন্তত খুঁজে পাননি। এমন কোনো সাধকজীবন দ্রুত বিকশিত ও লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছিল হিন্দু কবির রচিত 'সত্য পীরের কথা' শীর্ষক বাংলা কাব্যে, যা' সম্পাদনা করেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং প্রকাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩০)। কবির নাম রামেশ্বর ভট্টাচার্য। 'সত্য-নারায়ণ' নামের মোড়কে এই 'কাল্ট' সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। কোনো ধর্মীয় অনুমোদনের দরকার হয়নি, বিশেষজ্ঞ ব্রাহ্মণ পুরোহিতকেও লাগেনি, নির্দিষ্ট কোনো তারিখও নয় অথচ এই হিন্দু অনুষ্ঠান গণতান্ত্রিক লোকপ্রিয়তায় চরিতার্থ হলো।

আরো উল্লেখ্য এই যে, একটিও মুসলিম অধিবাসী নেই এমন অনেক হিন্দু গ্রামেই কোনো মুসলিমকে তাজিয়া স্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হতো। পরে অবশ্য হিন্দুমুসলিম সম্পর্কে বিদেশী প্রশাসনের অভিসন্ধি-সৃষ্ট ক্রমবর্ধিত উত্তেজনার চাপ দেখা দিলে পরিস্থিতির চেহারা আর চরিত্র বদলাতে থাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দের উপসংহার পর্যায়ের আর্থ-সামাজিক-সাম্প্রদায়িক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বিশ্রুত ভারত-ইতিহাসবেত্তা বলে ওঠেন,

আমরা স্মরণ করতে পারি, গুরু নানকের (১৪৬৯-১৫৩৮) শিক্ষা মুসলিম ও হিন্দু, উভয়কেই আকৃষ্ট করেছিল, যেমন করেছিল প্রায়-সমকালীন মুসলিম তন্তুবায় কবীরের (১৪৫৫-১৫১৭) সাবলীল কবিতা, যাঁর 'পন্থ'-এ এমন-কী হিন্দু মা-বাবাও এখনো তাঁদের ছেলেমেয়েদের উৎসর্গ করে থাকেন।

এই বাক্যটি লিখেছিলেন কোশাম্বী তাঁর গ্রন্থের ১৯৫৬ সালের প্রথম সংস্করণে। এখনো ভারতীয়রা অনেকেই তাঁদের সন্তানদের, অবশ্যই পুরুষ-সন্তানদের নামকরণের ক্ষেত্রে 'কবীর'-কে স্মরণ করেন। অবশ্য কবীর-ভাবুক মরমিয়া সাধক আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের দৌহিত্র অমর্ত্য সেন যখন তাঁর পুত্রের নাম রাখেন কবীর, তখন নানা কারণে সম্পূর্ণ ভিন্নতর একটি মাত্রা যুক্ত হয় অতি আধুনিক সময়ের কবীর-ভাবনায়।

আসলে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনেরই অনুভবে এসেছিল এই সুতীব্র ব্যর্থতা আর সুগভীর ক্ষোভ—

শাস্ত্র-শৃঙ্খলিত ও গ্রন্থ-বদ্ধ আমরা ভালো করিয়া চাহিয়াও দেখিলাম না যে চক্ষের সম্মুখে কত বড়ো একটি সুযোগ বৃথা চলিয়া গেল।

এখন থেকে সত্তর বৎসর আগে ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতার মুদ্রিত রূপ 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা'-র নিবেদন অংশেই উদ্ধৃত খেদোক্তিটি প্রকাশকালে ক্ষিতিমোহন সাধক-কবিরূপে পরিকীর্তিত বাংলা সাহিত্যের এক অসামান্য লোকায়ত ব্যক্তিত্ব রামপ্রসাদের অবিস্মরণীয় এই ছত্রগুলি খুবই প্রাসঙ্গিকভাবে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন :

মন রে কৃষিকাজ জানো না—
এমন মানবজমিন রইল পতিত
আবাদ কল্লে ফলতো সোনা।

মধ্যযুগের সন্ত কবিদের আধ্যাত্মিক সাধনার সমগ্রতার কথা যখন তিনি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে অবারিত করেন, তখনও দেশকালসমাজ-সচেতন সহৃদয় পাঠক অনুধাবন করবেন, সন্ত কবিদের আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে তাঁদের জীবনসাধনা ও চর্যার কোনো ভিন্নতা ছিল না। ক্ষিতিমোহন বা এমনকী রবীন্দ্রনাথও যখনই আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠা বা ধর্ম-সাধনার অবিরল উল্লেখ করেন, তখন যথার্থ অর্থাৎ কৃতী পাঠক নিশ্চয়ই ভুলে যাবেন না, তাঁদের অধ্যাত্মভাবনা পূর্ণাঙ্গ জীবন-ভাবনার বাইরের কোনো বিষয় ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য নিজেই এমনভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তা নিয়ে কোনো তর্ক তোলার অবকাশ সত্যিই আর থাকে না। পারিপার্শ্বিক আদর্শচ্যুতির সময়েই স্বদেশ ও স্বজাতির দুর্গতিমোচনের জন্য রবীন্দ্রনাথের উৎকণ্ঠা ছিল তীব্র ও গভীর। 'নৈবেদ্য'র কবিতাগুলিতেই তার পর্যাপ্ত নিদর্শন পাই। 'গীতাঞ্জলি'-তেও তার অনুসৃতি দুর্লক্ষ্য নয়।

গত শতাব্দীর শেষ দশকে রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যের শিলাইদহ পর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশকে তথা গ্রামবাংলার জনজীবনকে প্রত্যক্ষতায় ও প্রাত্যহিকতায় জানতে পারলেন। এইভাবে স্বদেশের সঙ্গে তাঁর যে পরিচয় সাধিত হলো, তার দু'টি দিকই লক্ষণীয়। একদিকে পরাধীন ও শোষিত স্বদেশের লাঞ্ছনা-অবমাননা ও তার প্রতিকার চেষ্টা এবং এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের উৎকণ্ঠাপ্রসূত ব্যাকুলতম প্রার্থনা 'তুমি'-র কাছে। এই 'তুমি' কোনো মামুলি সত্তা নয়, সর্বশক্তিমান, কোনো দেশকালচিহ্নিত রাজা নয়, একেবারে রাজাধিরাজ ; বস্তুত ঈশ্বরপ্রতিম, ঈশ্বরের মতো সর্বোচ্চ প্রেরণা-উৎস, যার কাছে প্রার্থনা করলে তার ইচ্ছায় 'সব-পেয়েছির দেশ'-ও করতলগত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সেই সত্তাকে কখনো-কখনো 'অসীম'-'অরূপ' নানা নামে

ডেকেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামহীন 'তুমি'-রূপে সম্ভাষণ করেছেন।

কবীর কে এবং কবীর কী, এ যদি বুঝতেই হয় তবে বাঙালি পাঠককে বা বাঙালি জিজ্ঞাসুকে রবীন্দ্রভাবনা আর পাশাপাশি ক্ষিতিমোহনের সাধনা আর অজিতকুমার চক্রবর্তীর শ্রমনিষ্ঠ কবীর-চর্চার পরিচয় গ্রহণ না করে উপায় থাকে না। অথচ গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ এখনো বহুলাংশে একশ্রেণীর সমালোচকের আরোপিত আধ্যাত্মিকতায় ছায়াচ্ছন্ন এবং ক্ষিতি-মোহন ও অজিতকুমার অধুনা-বিস্মৃত বললেও অতিশয়োক্তি হয় না।

ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'-র কবিতাগুলি বিদেশী পাঠকেরা যে বেশ কিছুটা ভুলভাবে গ্রহণ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের নিজেরই তা মনে হয়েছিল। এ-বিষয়ে 'রবিজীবনী'-কার প্রশান্তকুমার পালও ষষ্ঠ খণ্ডের ৩৭১-৩৭২ পৃষ্ঠায় প্রণিধান-যোগ্য মন্তব্য করেছেন—

Gitanjali-র কবিতাগুলি বিদেশী পাঠক অধ্যাত্মবাদী এক কবির লেখা বলে গ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যে জীবনমুখিতার লক্ষণ অনেকের চোখে পড়লেও সাধারণভাবে Mystic-ছাপে চিহ্নিত করে এগুলি আস্বাদনের প্রবণতা তিনি লক্ষ করেছিলেন। কিন্তু এটি তাঁর কবিতার খণ্ডিত পরিচয়, কেবলমাত্র সেই পরিচয়ে চিহ্নিত হতে তিনি রাজি ছিলেন না।

এই সূত্রে 'রবিজীবনীকার ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ২ অক্টোবরের দিকে জগদা-নন্দকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন :

আমার কবিতার একটা দ্বিতীয় ভাগ প্রেসে দেবার জন্য প্রস্তুত করছি। অনেকগুলোই তর্জমা করে ফেলেছি। তাতে নানা বিচিত্র রকমের কবিতা থাকবে—খুব হাল্কা থেকে খুব গম্ভীর। ওর মধ্যে 'ক্ষণিকা'র, 'মাতাল' কবিতাটি পর্যন্ত দিয়েছি। আমার এই নানা সুরের কবিতাগুলো দেখে এরা আশ্চর্যবোধ করে—আমার এই মণিহারির দোকানে জিনিস তো কম জমেনি।

পরিকল্পিত এই সংকলনটি The Gardener নামে ১৯১৩ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত। এইভাবে আরও বেশ কিছু কবিতা, নাটক, ছোটোগল্প, প্রবন্ধাদির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার বিচিত্রমুখিতা পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

বস্তুত, ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'-র বিদেশী পাঠক ১৯১৫ সালেই লন্ডনের ম্যাকমিলান প্রকাশিত One Hundred Poems of Kabir হাতে পেয়ে যাচ্ছেন। কবীর-এর কবিতার এই ইংরেজি অনুবাদ রবীন্দ্রকৃত। 'টাইটেল পেজ'-এ ঘোষণাই আছে Translated by Rabindranath Tagore এবং Assisted

by Evelyn Underhill—এই অনুবাদ-সংকলন রাতারাতি প্রস্তুত হয়নি।

শুধু তাই নয়, একশোটি কবীর-কবিতার অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ ইভলিন আন্ডারহিল-এর সহযোগিতায় করে দিলেন এবং ম্যাকমিলান সংকলনটি ছেপে প্রকাশ করে দিলেন, ঘটনাটা এমন সরল কোনো প্রকাশনাবৃত্তান্ত নয়।

নয় যে এবং কবীরের কবিতাশতক যে সরাসরি ও আদ্যন্ত শুধুই রবীন্দ্রকৃত একটি অনুবাদ-সংকলন নয়, এই সংকলনের আন্ডারহিল লিখিত ভূমিকা ও কবিতাশতকের চূড়ান্ত অনুবাদ-চেহারা ও চরিত্রে অজিতকুমার ও ক্ষিতি-মোহনের প্রত্যক্ষ দান যে গভীর ও অন্তরঙ্গ, সেই সত্য অনুধাবনে খুব বেশি দূরেও যেতে হয় না, ১৯১৫ সালে প্রকাশিত ম্যাকমিলান অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড-এর 'ওয়ান হানড্রেড পোয়েমস অব কবীর'-এর ইভলিন আন্ডারহিল লিখিত দীর্ঘ ভূমিকার শেষাংশটিতে দৃষ্টিপাত করলেই স্পষ্ট হয়—কবীর নিজে ছিলেন অন্ত্যজ ও নিরক্ষর, সেই বাস্তবতা মনে রেখে অনুবাদ প্রস্তুতির নেপথ্যবার্তা সহজবোধ্য মাতৃভাষায় সাজিয়ে দেওয়াই সঙ্গত মনে হয়—আন্ডারহিল জানিয়ে দিচ্ছেন :

কবীর-গীতির পাঠ প্রধানত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই কীর্তি। তাঁর মরমিয়া প্রতিভার বৈশিষ্ট্যগুণেই তিনি কবীর-এর অন্তর্দৃষ্টি ও ভাবুকতার বিস্ময়কর সহমর্মী ভাষ্যকার, এই সংকলনের অনুবাদ-কবিতাগুলির পাঠকমাত্রই তা উপলব্ধি করবেন।

এই অনুবাদ-কবিতাগুলি মুদ্রিত হিন্দি পাঠসহ ক্ষিতিমোহন সেন-কৃত বাংলা-অনুবাদের ভিত্তি-নির্ভর। কখনো গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি প্রভৃতির সূত্রে, কখনো পরিব্রাজক সাধুসন্তদের স্মৃতিবাহিত মুখনিঃসৃত আবৃত্তি সূত্রে লব্ধ কোনো-না কোনো ভাবে কবীরের নামাঙ্কিত বিপুল সংখ্যক কবিতা ও প্রার্থনাগীতি সংগ্রহ এবং সেই রচনাস্তূপ থেকে যথার্থ কবীররচনাগুলিকে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ বিবিধ সাক্ষ্যবিচারের মাধ্যমে সাজাই-বাছাই করা যে কী সুকঠিন কাজ, তা'ও অনুভবগম্য। এই অবিশ্বাস্য পরিশ্রমের ফলেই কবীরের কবিতাশতক প্রকাশ হতে পারছে।

আন্ডারহিল কবীরের কবিতাশতক প্রকাশের নেপথ্যবর্তী শ্রমসাধ্য কর্ম সাধনার উল্লেখমাত্র করলেন। কার বা কাদের শ্রম, কী রকম শ্রম প্রভৃতি এই অনুচ্ছেদে বললেন না। নাতিদীর্ঘ ভূমিকার সর্বশেষ অনুচ্ছেদটিতে নামের উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু তা-ও উল্লেখমাত্র, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের আত্মত্যাগের পরিমাণ ও প্রকৃতি তা থেকে অনুভব করা কঠিন। সর্বশেষ অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যটিতেই

'also'-শব্দটি থেকে একটা অস্বস্তি তৈরি হতে পারে অনুপুঙ্ক্ষ পাঠকের মনে—মনে হতে পারে, কবিতাশতক প্রস্তুতির নেপথ্যের আসল কথাগুলি যেন বলা হয়েই গেছে, নিছক 'অধিকন্তু দোষের কিছু নয়' মনোভাব থেকেই যেন সর্বশেষ অনুচ্ছেদটির মৃদু ও সংক্ষিপ্ত অবতারণা—

We have also had before us a manuscript English translation of 116 songs made by Mr. Ajit Kumar Chakravarty from Mr. Kshiti Mohan Sen's text, and a Prose essay upon Kabir from the same hand.

ক্ষিতিমোহনের সংগৃহীত ও কৃত পাঠের ভিত্তিতে অজিতকুমার এক শত ষোলটি কবীর-রচনার ইংরেজি অনুবাদ এবং কবীরকে নিয়ে লেখা একটি প্রবন্ধ তুলে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ-আন্ডারহিলের হাতে। কবীরের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ ও কবীর বিষয়ে লেখা প্রবন্ধ থেকে বিরাট সহযোগিতা পেয়েছেন বলেও জানিয়েছেন আন্ডারহিল। কবিতাশতকের বেশ উল্লেখ্য অংশই অজিত-কুমারের অনুবাদ থেকে গৃহীত এবং ভূমিকার মধ্যেও অজিতকুমারের প্রবন্ধ থেকে বেশ কিছু তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে বলেও আন্ডারহিল জানিয়েছেন। সর্বশেষ বাক্যটিতে তাই অজিতকুমারকে সর্বোচ্চসম্ভব কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানানো হয়েছে তিনি যে-বিপুলতম ঔদার্যের সঙ্গে নিঃস্বার্থভাবে তাঁর সমগ্র কবীর-সাধনা রবীন্দ্রনাথ ও আন্ডারহিলের ব্যবহারের জন্য দান করেছিলেন, সেই কথা মনে রেখে।

ক্ষিতিমোহনকে ভুলে থেকে বা এড়িয়ে গিয়ে বাংলায় ও বাঙালির কবীর চর্চার উল্লেখ পর্যন্ত অসম্ভব বলে মনে করি। কিন্তু ইংরেজিতে বাঙালির কবীর চর্চা প্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তীর সানুরাগ শ্রমসাধনার দিকটিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এক্ষেত্রেও অবশ্য ক্ষিতিমোহনের প্রেরণা ও রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাসহ সক্রিয় অভিভাবকত্ব মনে রাখা দরকার। এই প্রসঙ্গে সহায়ক তথ্যের কোনো অভাব নেই। 'রবিজীবনী'কার অবিশ্বাস্য মেধা ও শ্রমসহযোগে সেসব তথ্যের নির্বাচিত অংশ প্রায়শ মূল্যায়নসমেত তাঁর মহাগ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে বিন্যস্তও করেছেন। তবু জিজ্ঞাসু পাঠকের সমস্যাও অফুরন্ত। পাঠকবিশেষের কাছে তাঁর কৌতূহল-সংশয়-জিজ্ঞাসার প্রকৃতি অনুসারে হয়তো বর্জিত অংশটিরই অপরিহার্যতা এবং কোনো বিশেষ প্রসঙ্গে তাঁর মূল্যায়নও স্বতন্ত্র। তবু আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গে ১৯১২ সালের ১৭ ডিসেম্বর তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লেখা পিয়র্সনের চিঠির উদ্ধৃতাংশটি দেখে নিলে একাধিক জ্ঞাতব্য তথ্য জানা হয়ে

যায়—

[15 Dec] After dinner···ঠাকুরদাদা (ক্ষিতিমোহন) read and explained to me some of the poems of Kabir. The poems seemed to vibrate with the rhythm of some mighty bell and it was wonderfully in spring to have so enthusiastic an admirer of Kabir to explain the verses to me.

উড়িষ্যার সমুদ্রতীরে চাঁদিপুরে গ্রীষ্মাবকাশ যাপন করছিলেন অজিতকুমার। সঙ্গী ছিলেন পিয়র্সন। এই সময়ে ক্ষিতিমোহনের 'কবীর' বইটির চারটি খণ্ড থেকে নির্বাচিত ১১৪টি দোঁহা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন অজিতকুমার। রবীন্দ্রনাথ-কে লেখা পিয়র্সনের চিঠি থেকেই স্পষ্ট, অজিত অনুবাদ করছেন। পিয়র্সন স্বয়ং রুলটানা ৫৬ পৃষ্ঠার একটি এক্সারসাইজ বুকে কপি করেন অনুবাদগুলি। পরে এটি রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেরিত হয়। প্রসঙ্গত, প্রশান্তকুমার জানিয়েছেন, 'পিয়র্সনের দ্বারা অনুলিখিত উক্ত ৫৬ পৃষ্ঠার এক্সারসাইজ বুকটিই One Hundred Poems of Kabir গ্রন্থের একমাত্র পাণ্ডুলিপি [Ms. 113] যা রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত হয়েছে।···যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সংশোধনের পদ্ধতিটি জানতে চান, তাঁরা এটির সাহায্যে একটি মোটামুটি ধারণা করতে সক্ষম হবেন।'

কবীর-কবিতার অনুবাদ ও কবীর প্রসঙ্গে লেখা প্রবন্ধ অজিতকুমারই প্রথমে প্রস্তুত করেন। তাই প্রকাশিত ইংরেজি সংকলনে ইভলিন আন্ডারহিল যখন অজিতকুমারকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েই তাঁর নাতিদীর্ঘ ভূমিকা শেষ করেন, তখন অস্বস্তি বোধ না-করে উপায় থাকে না। 'ওয়ান হানড্রেড পোয়েমস অব কবীর' এই বইটির দোঁহাগুলির অনুবাদে অজিতকুমারের বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অনুবাদকরূপে রবীন্দ্রনাথ ও অজিতকুমার দু'জনেরই নাম থাকা উচিত ছিল, তা'নিয়ে কেউ সংশয় পোষণ করবেন না সম্ভবত। অবশ্য এক্ষেত্রে প্রকাশকের বাণিজ্যিক বুদ্ধিই দায়ী, অন্তত রবীন্দ্রনাথের তেমন কিছু করার ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন দু'জনের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও অজিত-কুমারের বহু-প্রশংসিত অনেক রচনা ও অনুবাদও প্রকাশের আলো দেখতে পায়নি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ব্যবসায়ীদের, বিশেষত বিদেশী প্রকাশকদের ব্যবসাদারির ও মুনাফাক্ষুধার মাত্রা আর প্রকৃতি গোড়ার দিকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। সন্তোষকুমার মজুমদারকে লিখেও ছিলেন, 'Atlantic Monthly-তে বর্ষাসন্ধ্যার ('শ্রাবণসন্ধ্যা') তর্জমাটা বেরিয়েছে—অনেকটা মেজে ঘষে বদলে দিয়েছি। লেখার নিচে অজিতের নাম পাঠিয়ে দিয়েছিলুম—কিন্তু ওরা সেটুকু বাদ দিয়েছে—এই হচ্ছে এখানকার দোকানদারি। এখানকার সাহিত্য

দরবারে প্রবেশ লাভ করা বিষম হাঙ্গামা। দরজার কাছে এমন ঠেলাঠেলি ভিড় যে পরিচয়পত্র না দেখাতে পারলে এরা কিছুতেই পথ ছেড়ে দেয় না।'

'কবীর'কে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার তাগিদ্‌টাই সবচেয়ে বড়ো হয়ে ছিল রবীন্দ্রনাথের মনে, তা না-হলে তিনি ম্যাকমিলান কোম্পানির 'পরে জোর খাটানোর চেষ্টা করলেও করতে পারতেন, যাতে অনুবাদক হিসাবে তাঁর নামের সঙ্গে অজিতকুমারের নামটিও যুক্ত থাকে। শেষ পর্যন্ত যদি কবীরের কবিতা-শতক আদৌ না প্রকাশিত হয়, এই আশঙ্কাও ছিল সঙ্গতভাবেই রবীন্দ্রনাথের মনে।

আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। কী রকম অনুবাদ করেছিলেন অজিতকুমার? তার চেয়েও বড়ো কথা, রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারের অনুবাদ কতটা গ্রহণযোগ্য মনে করেছিলেন? অজিতকুমারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্রাংশ থেকে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন এবং আরো কিছু আনুষঙ্গিক খবর পাওয়া যাবে—এমন-কী ইংরেজিতে কবীরের কবিতাশতক সংকলনটির ভিত্তিতেই যে ক্ষিতিমোহন, সেই সত্যটিও উচ্চারিত হয়েছে রবীন্দ্র-জবানীতেই—

পত্রাংশ ১

India Society-র সভায় স্থির হয়ে গেছে তোমার কবীরের তর্জমা তাঁরা ছাপবেন। এটা তোমার পক্ষে খুব ভালো হলো। আমি তোমার লেখা মূলের সঙ্গে মিলিয়ে কতকটা সংশোধন করে দেবার চেষ্টা করছি। প্রথম ৪০টা খুঁজে পেয়েছি তারপরে এমন উল্টোপাল্টা করে করছে যে বের করতে সময় লাগছে বলে কাজ বন্ধ আছে। 'মেরি' প্রভৃতি সুন্দর শব্দকে ইংরেজি metaphysical 'Ego'-প্রভৃতি শব্দের দ্বারা তর্জমা করাতে সেগুলো গদ্যভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে—সাধককে এক জায়গায় spiritual aspirant-করেছে কবিতায় এ একেবারেই অচল। এইগুলো যথাসম্ভব মেজে ঘষে নিতে হবে। মূলের পত্রাঙ্ক যদি দিয়ে দিতে তাহলে এতদিনে কাজ হয়ে যেত। রোটেনস্টাইন বলছেন কবীরের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করে যত শীঘ্র পার একটা ভূমিকা লিখে পাঠিয়ো।

পত্রাংশ ২

তোমার কবীর নিয়ে পড়েছি। খাটতে হচ্ছে কম নয়। খুঁজে বের করতেই কত সময় যাচ্ছে তার ঠিক নেই। তারপরে তুমি যেসব লাইন বাদ দিয়েছ সে

সমস্ত আমাকে বসিয়ে দিতে হচ্চে। তার উপরে আমার বোধ হচ্চে তোমার তর্জমার উপরে পিয়র্সনের 'স্থূল হস্তাবলেপন' পড়ে অনেক জায়গায় বিপরীত রকমের Prosaic-হয়ে পড়েছে। এক একটা তর্জমা আগাগোড়া নতুন করে লিখতে হয়েছে। প্রথমের দিকে গোটা কতক লেখা তত বেশি বদলাতে হয়নি। কিন্তু যতই অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে ততই খাটুনি বেড়ে চলেছে।

পত্রাংশ ৩

তোমার কবীর এতদিনে শেষ করেছি। আমি যদি নিজে আগাগোড়া তর্জমা করতুম তাহলে এরচেয়ে অনেক কম পরিশ্রম করতে হতো। অনেক কবিতাই আমাকে প্রায় পনেরো আনা লিখতে হয়েছে অথচ তালি দেবার ভাব রয়ে গেছে। আসল কথা, এ সমস্ত কবিতা অনুবাদ করতে হলে যথাসম্ভব মূলের অনুবর্তন করা দরকার—বাদসাদ দিয়ে কেবলমাত্র ভাব রক্ষা করা চলে না। বিশেষত এ দেশের পাঠকরা যদি একবার জানতে পারে এই কবিতাগুলি অবিকল অনুবাদ নয় তাহলে এরা তাঁকে একেবারে পরিহার করবে।···যা হোক আমার যতদূর সাধ্য আমি ওর অপূর্ণতা দূর করেছি।

পত্রাংশ ৪

India Society-এই কবিতাগুলি বের করবে কিনা এখনো তার নিশ্চিত খবর পাইনি— করবে বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু ওরা যদি বের না করে তাহলে সম্ভবত Macmillan-রা প্রকাশ করতে ইচ্ছুক হবে। সে হলে মোটের উপর ভালোই হয়। কেন না India Society-র প্রসার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। তোমার এ বইয়ে অর্থলাভের সম্ভাবনা কতদূর তা বলতে পারিনে। অবশ্য, চেষ্টার ত্রুটি হবে না কিন্তু বেশি আশা কোরো না। যা পাও তাই যথেষ্ট। কেননা এ জিনিসের উপর তোমার দাবিও অল্প। কারণ এর ভিত্তিতে ক্ষিতিমোহনবাবু আছেন, এখানকার ব্যবসায়ের নিয়মে একটা মোটা প্রাপ্য তাঁরই। কবীর তিনি যে কেবল সংগ্রহ করেছেন তা নয় তাঁর অনুবাদ অবলম্বন করেই এই অনুবাদগুলি রচিত— যথার্থ পরিশ্রম সে তাঁরই বস্তুত এখানকার Publisher-দের সঙ্গে যখন agreement-লেখাপড়া হবে তখন তারা গোড়ায় জিজ্ঞাসা করবে এতে অন্য কারো ন্যায্য দাবি আছে কিনা সে সমস্ত দাবির জন্যে তারা দায়িক হতে স্বীকার করবেই না।

সর্বশেষ পত্রাংশের শেষ তিনটি বাক্য থেকেই স্পষ্ট, কবিতাশতক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনের ভূমিকার গুরুত্ব ও তাৎপর্যের সম্পূর্ণ ঠিকানাই

জানতেন, তা স্বীকারও করছেন। অন্যান্য অবকাশেও রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনের প্রজ্ঞা ও সাধনাকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু কবিতাশতক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনের কর্তৃত্ব মেনে নিচ্ছেন ব্যক্তিগত পত্রে। তা-ও অজিতকুমারের সঙ্গে তুলনাসূত্রে এবং নিতান্তই আর্থিক প্রাপ্যের প্রশ্নটিকে ঘিরে।

তাই, অজিতকুমারের অনুবাদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁরও যেমন প্রাপ্য ছিল আন্ডারহিলের ভূমিকায় নিছক কৃতজ্ঞতার চেয়ে আরও অনেকটাই বেশি, তেমনি ক্ষিতিমোহনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র 'from Mr. Kshiti Mohan Sen's text' শব্দক'টির উল্লেখ ক্ষমাহীন কৃতঘ্নতা বলেই মনে হতে পারে সাম্প্রতিক পাঠকের। তা-ছাড়া রবীন্দ্রনাথ-ইভলিন আন্ডারহিলের যৌথ উদ্যোগের আগেই এজরা পাউন্ড কালীমোহন ঘোষের সহায়তায় যখন কবীরের দশটি দোঁহার ইংরেজি অনুবাদ সম্পন্ন করেন, তখনও 'কবীর ও হিন্দি ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এজরা পাউন্ড ক্ষিতিমোহন সেন-কৃত বাংলা অনুবাদের কালীমোহন ঘোষ-কৃত 'crib'-অবলম্বনে তা করেন।

অধ্যাপক উড্‌স বিদেশে (হাভার্ডে) প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য চেষ্টা করছিলেন। সেই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথকে তিনি যে চিঠি লেখেন, তার নিম্নোক্ত অংশটি নানা কারণে বিবেচ্য—

And I trust that you or Mr. [? Kshitimohan] Sen will give me information of the thinkers who have influenced you, especially something about Kabir. Then I could make a historical setting for your philosophy.

অধ্যাপক উড্‌স রবীন্দ্রনাথের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে চেয়েছেন এই পত্রাংশে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মোটামুটি পরিচয়েই উড্‌স এটুকু বুঝে গেছেন, রবীন্দ্রনাথের পরে কোন্ কোন্ ভাবুকের 'প্রভাব' পড়েছে, এই তথ্য রবীন্দ্রনাথ নিজে যতটা দিতে পারেন, ততটাই সন্তোষজনক তথ্য জোগান দিতে পারেন আর-যিনি, তিনিই ক্ষিতিমোহন সেন। অর্থাৎ এজরা পাউন্ড-কালীমোহন ঘোষ, ইভলিন আন্ডারহিল-রবীন্দ্রনাথ-অজিতকুমার প্রমুখের কবীর চর্চার খবর উড্‌স তো জানেনই। তাই একথাও তাঁর অজানা ছিল না যে, ইংরেজিতে কবীর চর্চায় যাঁরা উদ্যোগী তাঁরা সকলেই ছিলেন বাংলায় ক্ষিতিমোহনের কবীরসাধনা ও গবেষণার মুখাপেক্ষী। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই বলেছেন ক্ষিতিমোহনের কথা তাঁর বিদেশী বন্ধুদের, বিশেষত রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসুদের, সেই রবীন্দ্র জিজ্ঞাসুর

দল, যাঁরা ততদিনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কবীরকে জড়িয়ে ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন এবং কেউ-কেউ সেই ভাবনার গভীরেও অবগাহনে আগ্রহ বোধ করছেন। সুতরাং ক্ষিতিমোহনের প্রসঙ্গ বারবার উঠে আসছিল সঙ্গত কারণেই। আর রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর গান আর সুরের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথকে বিশ্বস্ত ভাণ্ডারীরূপে দেখেছেন, কবীর তথা মধ্যযুগের সন্তকবিদের প্রসঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের কাছে 'সব-পেয়েছির দেশ' বলতে আমার তো মনে হয় ক্ষিতিমোহনকেই চিহ্নিত করা চলে। তবু, রবীন্দ্রবাণী ও সুর যেমন রবীন্দ্রনাথেরই, তেমনি মধ্যযুগের সন্তকবিদের জীবন ও রচনা থেকে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে কতটা প্রাণিত হবেন, তা ছিল তাঁরই একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। সেখানে তাঁরই আত্মকর্তৃত্ব।

ক্ষিতিমোহনের রবীন্দ্রানুরাগ অবিশ্বাস্য গভীর। তিনি সমস্ত ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথেরই কর্তৃত্ব ও অগ্রগামিত্ব ঘোষণায় সোচ্চার। কবীর-রবীন্দ্র সম্পর্কের মূল্যায়নেও ক্ষিতিমোহন সমকালে উদ্ভূত সবরকম সংশয়ের ঊর্ধ্বে রবীন্দ্রনাথকে স্থাপন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সপক্ষে অতিশয়োক্তি পর্যন্ত করে বসেছেন। রবীন্দ্রমহিমা কিছুমাত্র খর্ব না করেও আমি কিন্তু বলবো, মধ্যযুগের সন্তকবিদের কাব্য সাধনার সংগ্রহ ও বিশেষজ্ঞতার ক্ষেত্রে এবং এর সঙ্গেই যুক্ত করে দেব, বাউল গানের সংগ্রহ ও বাংলার বাউলদের নিয়ে দিগ্‌দর্শক আলোচনার ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত ক্ষিতিমোহনই রবীন্দ্রনাথের যথার্থ 'ফ্রেন্ড, ফিলোজফার এ্যান্ড গাইড'! তবু মনে রাখতে হবে, বাউল ও বাউল গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা গত শতাব্দীর শেষ দশকের যথার্থ ঘটনা, ক্ষিতিমোহন তখনও রবীন্দ্র সান্নিধ্যেই আসেননি। ক্ষিতিমোহন হোমিওপ্যাথি শেখার জন্য আমেরিকায় যেতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন, বহির্বিশ্বে ক্ষিতিমোহনই ভারততত্ত্ব প্রচারের কাজে যোগ্যতম মানুষ। তাই বিদেশ থেকে রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে লিখেছেন :

এখানকার যাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ তাঁরা সাধক নন, সেইটেতে যে অভাব ঘটে সেই অভাব আপনি পূরণ করে দেবেন। পাণিনি ব্যাকরণ শিক্ষার কিছু আয়োজন এবং বেদান্তশাস্ত্রের ভক্তিতত্ত্বসম্মত ব্যাখ্যা বিদেশে উপস্থাপনার 'খুব দরকার হবে', জানাচ্ছেন একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ। কখনো লিখেছেন :

মধ্যযুগের ভারতীয় mystic-দের সম্বন্ধে যা-কিছু জ্ঞাতব্য আছে সমস্ত আপনাকে সংগ্রহ করে আনতে হবে। দাদূ, কবীর, মীরাবাই, জ্ঞানদাস প্রভৃতি সাধকদের রচনাবলী যথাসম্ভব সংগ্রহ করবেন। এছাড়া আমাদের বাংলার

বাউলদের গানও যতটা পারেন কুড়িয়ে নিয়ে আসবেন। ভারতবর্ষের হৃদয়ের পরিচয়টা এদের পক্ষে দরকার। রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছিলেন,

এখানে Evelyn Underhill প্রভৃতি কোনো একজন রসজ্ঞ লোকের সহযোগে এই জিনিসগুলি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করবার আয়োজন করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষের হৃদয়ের পরিচয়টা' পাশ্চাত্যে তুলে ধরতে ব্যাকুল ছিলেন। 'সেই হৃদয়' সমগ্র ভারতসংস্কৃতি, এক কথায়। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, 'ভারতবর্ষ শুধু ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ নহে'। তিনি সোচ্চারে জানিয়েছেন :

আমাদের দেশে সাধনা বলতে সাধারণত মানুষ আধ্যাত্মিক মুক্তির সাধনা, সন্ন্যাসের সাধনা ধরে নিয়ে থাকে। আমি যে সংকল্প নিয়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রম স্থাপনার উদ্যোগ করেছিলুম, সাধারণ মানুষের চিত্তোৎকর্ষের সুদূর বাইরে তার লক্ষ্য ছিল না।

ভারতবর্ষের শিষ্ট-অভিজাত তথা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিই যে 'ভারতবর্ষের হৃদয়ের সমগ্র পরিচয়' নয়, সে কথাও শিলাইদহ পর্বে দেশ-দেখা-চোখের মাধ্যমে বুঝে গেলেন রবীন্দ্রনাথ, এ-বিষয়ে একালের মনস্বী ভারতীয় লেখক মূলকরাজ আনন্দ প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন :

প্রাচীন সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের নির্যাস সহজ উত্তরাধিকারের মতো রবীন্দ্রনাথের আয়ত্ত হওয়ারই কথা, কিন্তু, উত্তরাধিকারের এত বিত্ত ও বৈভব সত্ত্বেও তিনি যে অন্তঃপ্রেরণার তাগিদে ক্ষীয়মান লোকসংস্কৃতির শীর্ণ ধারার দিকে ছুটে গিয়েছেন, পাশ্চাত্য আবেগ-অনুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েও যে সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের মতো তার বহিরঙ্গ রূপের কাছে আত্মবিক্রয় করেননি, এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব।

মূলকরাজ আনন্দ যে-নির্ণয় করেছেন, তার সমর্থনে আমরা স্মরণ করতে পারি, গত শতাব্দীর শেষ দশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধটি, 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি ('এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা' প্রভৃতি ছত্রগুলি যে কবিতাটিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে,) সাধনা-হিতবাদীতে প্রকাশিত ছোটোগল্পগুলি, 'ছিন্নপত্রাবলী'-র চিঠিগুলি, 'প্রাচীন সাহিত্য'-এর পাশাপাশি 'লোকসাহিত্য'-এর রচনাগুলি। রবীন্দ্র জীবনে এই সময়েই ঘটে বাউল ও বাউল গানের সংস্পর্শ। রবীন্দ্রনাথ ক্ষীয়মান লোকসংস্কৃতির শীর্ণ ধারাটির দিকে ব্যাকুল দু'-বাহু বাড়িয়ে দিলেন। বৈষ্ণব পদাবলী, ধর্মতত্ত্ব, সুফিদের প্রেমসাধনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয় তো ছিল-ই। মহর্ষির

শয্যাপার্শ্বে থাকতো বিখ্যাত সুফি কবি হাফেজ-এর গ্রন্থ। মহর্ষির হাফেজ-অনুরাগ পিতার আবৃত্তি ও অনুবাদের সূত্রে পুত্র রবীন্দ্রনাথের চিত্তেও সঞ্চারিত হয়েছিল অতি তরুণ বয়সেই। সুফি ধর্মতত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ এভাবেই হতে পেরেছিল অবাধ। চাঁদকবি, তুলসীদাস প্রমুখ কবির রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় মেলে। কবীরের দোঁহা, তাঁর জীবন ও সাধনার বিষয় রবীন্দ্রনাথের নিতান্ত অপরিজ্ঞাত ছিল না।

ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যুক্ত হলে তাঁর সান্নিধ্যে এসে রবীন্দ্রনাথ মধ্যযুগের সন্তকবিদের বিষয়ে গভীরতর মনোনিবেশের সুযোগ পেয়ে গেলেন। 'রবিজীবনী'-কার যে-তথ্য আমাদের জানিয়েছেন, তাতে দেখা যায়—'কবীর শীঘ্র ক্ষিতিমোহনবাবুকে পাঠাইবে'—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ ১৯০৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তারিখে। 'রবিজীবনী'-কার অনুমান করেছেন, 'তার বর্ষাধিক পূর্বে ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতনে এসেছেন এবং সম্ভবত তাঁরই সন্তবাণী লেখা খাতাটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি-র গান লিখতে শুরু করেন (১০ ভাদ্র ১৩১৬)। ১৯০৯ সালের ১১ অক্টোবর এবং ১৯১০ সালের ১৮ মে ক্ষিতিমোহনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে স্পষ্ট হয়, ক্ষিতিমোহনকে কবীরের দোঁহার বাংলা অনুবাদের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথও তাগিদ দিচ্ছেন। আরও একটি তথ্যও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত 'কবীর' প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় (১৩১৭ বঙ্গাব্দের ১ আশ্বিন) লিখেছেন ক্ষিতিমোহন, 'যাঁহার উৎসাহ ও সাহায্য না পাইলে আমার এই গ্রন্থ প্রকাশ করাই হইতো না, সেই পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।'

'গীতাঞ্জলি'-র মূল পাণ্ডুলিপিতে কবীর, তুলসীদাস প্রমুখ সন্তকবিদের দোঁহা লিখিত আছে। এই আঠারোটি দোঁহা রবীন্দ্রনাথের হস্তলিখিত, এই সিদ্ধান্ত করেছেন ড. রামেশ্বর মিশ্র। 'রবিজীবনী'-কার ড. প্রশান্তকুমার পাল ভিন্নমত পোষণ করলেও তিনিও বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, 'কবীরের অনুবাদ ও প্রকাশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বহুলাংশে যুক্ত ছিলেন এবং গীতাঞ্জলি-র অধিকাংশ রচনা প্রথম খণ্ডটির প্রস্তুতিপর্বের সমসাময়িক।'

সুতরাং 'কবীর-বাণী দেখিয়া তিনি গীতাঞ্জলি লেখেন নাই। গীতাঞ্জলি দেখিয়া তাঁহাকে আমি কবীর-বাণী দেখাই'—ক্ষিতিমোহনের এই বক্তব্য

তথ্যসম্মত নয়। আবার, নাগরী প্রচারিণী সভা-সম্পাদিত কবীর গ্রন্থাবলীর উপক্রমণিকায় ঘোষিত দাবিটিও 'অতিরেক-দুষ্ট' বলে চিহ্নিত করেছেন প্রশান্তকুমার। উপক্রমণিকার দাবিটি হলো :

বাংলার কবীন্দ্র রবীন্দ্রকেও কবীরের ঋণ স্বীকার করিতে হইবে। রহস্য-বাদের (mysticism) বীজ তিনি কবীরের কাছেই পাইয়াছেন। শুধু তাহাতে জমকালো পাশ্চাত্ত্য পালিশটি দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় রহস্যবাদকে ইনি পাশ্চাত্য ঢঙে সাজাইয়াছেন। ইহাতেই তো য়ুরোপে তাঁর এত প্রতিষ্ঠা।

কবীরের দোঁহাবলীর সঙ্গে গীতাঞ্জলি-র সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ক্ষিতিমোহন, উল্লিখিত কবীর গ্রন্থাবলীর উপক্রমণিকা ও রবিজীবনীকার—কোনো সূত্রই আমাদের তৃপ্তিকর কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না। ক্ষিতিমোহন তাঁর অবিশ্বাস্য রবীন্দ্রভক্তিবশত ধরেই নিয়েছেন, গীতাঞ্জলি কোনো-না-কোনোভাবে কবীর-প্রাণিত প্রমাণিত হলেই বুঝি রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতার মাহাত্ম্য দারুণভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। তাই তিনি সঠিক তথ্যই আড়ালে রাখলেন। কবীর গ্রন্থাবলীর উপক্রমণিকার লেখক উদ্ধৃতাংশের প্রথম বাক্যটি লিখতেই পারেন, 'রবীন্দ্রনাথ কবীরের কাছে ঋণী' কিন্তু পরবর্তী বাক্যগুলি তাঁর ন্যূনতম সাহিত্যিক বোধবুদ্ধিরও নিদর্শন নয়। রবিজীবনীকার রবীন্দ্রমানসগঠনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় তথ্যসন্নিবেশ করেছেন এবং সুপ্রচুর তথ্যগুলির অন্যতম রূপে 'কবীর-প্রমুখ মধ্যযুগীয় সন্তদের গীতসমূহ' কথাগুলিও অবশেষে যুক্ত করেছেন। এ-ও লিখেছেন, 'কিন্তু এর ভিত্তি রচনা করেছিল রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবন—শতাব্দীর শুরু থেকেই যা আত্মীয়-বিয়োগ ব্যথায় ক্রমশ অন্তর্মুখী হয়ে আত্মসাক্ষাৎকারের সাধনায় ব্যাপৃত হয়েছে।'

সাত্ত্বিকস্বভাববিশিষ্ট ও রবীন্দ্রপ্রীতিভক্তিতে আপ্লুত ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্র-নাথকে আড়াল করার জন্য তথ্যকেও আড়ালে রাখলেন, দেখেছি। 'কবীর গ্রন্থাবলী'র উপক্রমণিকার লেখকের প্রতিপাদ্য একটিই : মিস্টিসিজমের বীজটিই রবীন্দ্রনাথ কবীরের মধ্যে পেলেন এবং 'ভারতীয় রহস্যবাদকে পাশ্চাত্য ঢঙে সাজিয়ে' দিয়েই ইউরোপে তিনি প্রতিষ্ঠা পেলেন। রবিজীবনীকার বলছেন, প্রাক্-গীতাঞ্জলি সমগ্র রবীন্দ্রজীবনে আহৃত যাবতীয় শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের শোকতাপ মিলে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ অন্তর্মুখী হয়ে আত্মসাক্ষাৎকারের সাধনায় ব্যাপৃত হলেন, অতএব 'গীতাঞ্জলি'!

রবিজীবনীকারকে কেন এত কথা বলতে হচ্ছে ? রচনা করতে হচ্ছে পুরো

একটি দশকের বেশ কিছু ঘটনার তালিকা? শুধু একটি তথ্যগত বাস্তবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার জন্য না-হলেও এই সব আয়োজনে তা' বহুলাংশে আচ্ছন্ন ও প্রচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে না-কি? সহজ, সরল তথ্যটি তো এই যে, রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলি লেখার অব্যবহিত আগে ও রচনাকালে স্বয়ং কবীরচর্চার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এবং এই কালপর্বটিতে রবীন্দ্রনাথের কবীর-মনস্কতা কোনোভাবেই অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কিন্তু সুস্থচিন্তার যে কোনো পাঠক-সমালোচক জানেন যে, এই কালপর্বে রবীন্দ্রনাথ আরও অনেক সৃষ্টি উপহার দিয়েছেন, আরও ব্যাপক ও বিচিত্র কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অনুক্ষণ কমবেশি লগ্ন তাঁকে থাকতেই হয়েছে।

দীর্ঘতর পরিসরের অভাবে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থেকেই বুঝে নিতে হবে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তিন প্রিয়জনের মৃত্যুশোক রবীন্দ্রনাথকে মর্মাহত করেছিল। প্রথমে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী (১৯০২), পরে পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (১৯০৫) এবং সর্বশেষে কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রকে (১৯০৭) হারিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে-গভীর দুঃখ পেয়েছিলেন, তা' রবীন্দ্রজীবনীর পাঠকমাত্রই জানেন। তবু মনে রাখতে হবে, এইসব আঘাত সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির বৈচিত্র্য ও কর্মজীবনের আকণ্ঠ ব্যস্ততা অব্যাহতই ছিল। ১৯০০ সালে শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয়ের আরম্ভ থেকেই অর্থ, সময় ও মনঃসংযোগ যে কীভাবে রবীন্দ্রনাথকে ব্যয় করতে হয়েছে ধারাবাহিক, তা, অনেকেরই সুবিদিত। এই দশকটি জুড়ে রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিক রচনাকর্ম ও সাংগঠনিক দায়িত্ব বহনও ছিল বিস্ময়কর। ব্যক্তিগত শোকে অভিভূত হওয়ার ধারাবাহিক অবকাশটুকুও পাননি তিনি। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা ছাড়াও বঙ্গদর্শন ও একই সময়ে প্রকাশিত প্রবাসীর জন্য তাঁকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রভূত পরিমাণে পড়তে ও লিখতে হয়েছে। পত্নীর মৃত্যুতেও শোকের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি জড়িয়ে পড়তে হলো পুত্রকন্যাদের যুগপৎ মা ও বাবার ভূমিকা পালনের কাজে। কবিতা, গল্প, নাটক ও উপন্যাস তো লিখতেই হয়েছে, পাশাপাশি অগণিত প্রবন্ধ লিখে যেতে হয়েছে বিচিত্র বিষয় ও প্রসঙ্গ নিয়ে। ভাষাতাত্ত্বিক ও বৈয়াকরণিক প্রবন্ধাবলী থেকে শুরু করে সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক রচনাবলী লিখেছেন একটির পর একটি। আশ্রম বিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতেও হয়েছে এ-সময়ে। সবচেয়ে বেশি লিখতে হয়েছে স্বদেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক সন্দর্ভ। মাত্র কয়েকটি সন্দর্ভের শিরোনাম উল্লেখ করলেও স্পষ্ট হবে, প্রত্যেকটি সন্দর্ভের জন্য কী বিপুল পরিশ্রম ও চিন্তাশক্তির

প্রয়োজন আছে। 'স্বদেশ' গ্রন্থটির অন্তর্গত সন্দর্ভগুলি লিখেছেন, লিখেছেন 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা', 'শকুন্তলা', 'প্রাচীন ভারত', 'জাতীয়তা', 'বর্ণাশ্রম', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'য়ুরোপীয় রাষ্ট্রস্বার্থ', 'সমাজভেদ', 'ব্রাহ্মণ', 'নববর্ষ', 'অত্যুক্তি', 'ইউনিভার্সিটি বিলের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'স্বদেশী সমাজ', 'রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি', 'ঘুষাঘুষি', 'পাগল', 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ', 'আত্মশক্তি', 'অবস্থা ও ব্যবস্থা', 'সফলতার সদুপায়', 'যজ্ঞভঙ্গ', 'জাতীয় বিদ্যালয়', 'শিক্ষাসমস্যা', 'ব্যাধি ও প্রতিকার', 'চরিত্র পূজা'-র প্রবন্ধগুলি, 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুক', 'সমবায় ও শক্তি', 'সমস্যা ও সদুপায়' (সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রসঙ্গে), 'পূর্ব ও পশ্চিম', 'রাজা-প্রজা', 'পথ ও পাথেয়', 'ধর্ম', 'শান্তিনিকেতন', 'তপোবন' : ১৯০০ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত রচিত ও প্রকাশিত অসংখ্য প্রবন্ধের অন্তর্গত এ হলো কয়েকটিমাত্র।

বঙ্গভঙ্গ ও কার্জনের শিক্ষানীতি ও ভাষাবিচ্ছেদের বিরুদ্ধে এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে, রবীন্দ্র-সম্পাদনায় 'ভাণ্ডাব' পত্রিকাও আত্মপ্রকাশ (১৩১২, বৈশাখ) করেছে, রাখীবন্ধন উৎসব-অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেছেন রবীন্দ্রনাথ, ভাণ্ডার-নবপর্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকাদুটিতে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সঙ্গীত ও বাউল গানও লিখছেন, শিল্প-আন্দোলনে ভূমিকা গ্রহণ করছেন তিনি, বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলন, সাহিত্য-সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতি, পুলিসের আক্রমণে সভাপণ্ড, পতিসর-শিলাইদহ অঞ্চলে গ্রাম-সংগঠনের কাজ শুরু করলেন রবীন্দ্রনাথ, সমবায় ব্যাঙ্ক, বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করছেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করছেন, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উদ্বেগ বোধ করছেন এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্য আর গ্রাম ও কৃষক বিষয়ে তিনি কারও মুখাপেক্ষী না-থেকে নিজেই উদ্যোগ গ্রহণে তৎপর হচ্ছেন, বহরমপুর সাহিত্য সম্মেলনের ভাষণে স্বদেশের যাবতীয় বিবরণ সংগ্রহের উপদেশ-পরামর্শ দিচ্ছেন, ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকী কর্তৃক মজঃফরপুরে বোমা নিক্ষেপ, একই বছরে ৩০ এপ্রিল মানিকতলায় বোমার কারখানার সন্ধান, বন্দে মাতরম্-যুগান্তর পত্রিকায় গুপ্ত স্বাদেশিকতার সমর্থন, গুপ্ত হত্যা ও সন্ত্রাসসৃষ্টির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা, স্ব-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) পত্রিকায় আগেই উল্লিখিত 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধ লক্ষণীয়, আফ্রিকায় নাটাল-ট্রান্সভালে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ ('প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে তার ছায়াপাত), ১৯০৯ সালে বাংলার বিপ্লবী সংস্থাগুলি বে-আইনি ও

শান্তিনিকেতনে রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো, শিলাইদহ-পতিসরে সমস্ত শক্তি দিয়ে গ্রাম সংগঠনের কাজে রবীন্দ্রনাথের আত্মনিয়োগ, ১৯১০ সালে প্রেস অ্যাক্ট পাস হলো: রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনাবহুল ও কর্মচঞ্চল বৎসরগুলিতে কখনো নীরব ঔদাসীন্যে দিন যাপন করেননি, সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে 'গোরা', 'গীতাঞ্জলি', 'রাজা', 'শান্তিনিকেতন' প্রভৃতি গ্রন্থের রচনা শেষ হচ্ছে, এগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনেই কখনো নন, এই দশক জুড়েও কোনো সময়েই একটিমাত্র ভাবগত-কর্মগত-সৃষ্টিগত অবস্থানে অটল ছিলেন না।

তবু যদি প্রশ্ন ওঠে, তাঁর প্রধান উৎকণ্ঠা-অভিপ্রায় কী ছিল এই জটিল-বিচিত্র-বিমিশ্র কালপর্বে—তবে তার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত উত্তর হবে : মানবধর্ম-স্পন্দিত স্বদেশের অন্বেষণ ও সাধনা—যার ভূমিকা রচিত হয়েছিল গত শতকের শেষ দশকে। এই মানবধর্মের অন্বেষণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য রবীন্দ্রনাথকে দ্বিমুখী সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছে। সংগ্রাম ছিল ভিতরে-বাহিরে। আত্মশত্রুতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আমাদের ভিতর থেকে যা আমাদের প্রত্যহ মারে, তাকেও মারতে হবে। আর বাইরের দিকে ধর্মান্ধতার বেশে যা দেখা যায়, তাকেও নির্মূল করতে হবে। সবরকম সংকীর্ণ সংস্কারের মূলোৎপাটন।

শৈশব থেকেই মহর্ষির মাধ্যমে তিনি আত্মস্থ করে এসেছেন হাফেজকে, উপনয়নের সময় থেকেই গায়ত্রীমন্ত্রের মর্মলোকে তাঁর ভাবুকসুলভ সঞ্চরণ। চৈত্রমেলার সময় থেকেই যদি স্বাদেশিকতায় হাতে-খড়ি তবে কুড়ি বছর বয়সেই 'চীনে মরণের ব্যবসায়' থেকেই রবীন্দ্রচিত্তলোকে আন্তর্জাতিক চেতনার পদসঞ্চার। এইভাবেই শিলাইদহ পর্বে গ্রামবাংলার মাধ্যমে, বাউলদের স্বদেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও সৃষ্টিলোক, তাতেই দেখা গেল পটভূমি প্রস্তুত, যবনিকা কম্পমান, ক্ষিতিমোহন সেন—চেতনালোকে যিনি ভারত পথিক—কবীরের পথই যাঁর পথ, তিনি যোগ দিয়েছেন শান্তিনিকেতনে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে, রবীন্দ্রনাথ আর তিনি এসে গেলেন পরস্পরের সান্নিধ্যে : সমস্তটা জড়িয়ে সময়টা তখন কবীরপন্থের। যবনিকা কম্পমান : শৌখিন কবিত্ব নয়, সত্যিই দরকার ছিল সমকালীন স্বদেশের মুখের ওপর থেকে ধর্মান্ধতার পর্দাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলার, আর এই কাজটাই স্বয়ং যিনি করেছিলেন সাড়ে পাঁচশত বৎসর আগে, সময়ের ব্যবধান বিশাল হলেও তাঁর প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধিতে এতটুকু দেরি হলো না একালের ভারতবর্ষের

মহাকবির, বিশেষত সেই মহাকবির পাশেই এসে গেছেন একই ভাবলোকের শরিক ক্ষিতিমোহন সেন, তাঁর বাংলা গদ্যানুবাদ অবলম্বনে অজিতকুমারের ইংরেজি খসড়া এইরকম চেহারা পাচ্ছে রাবীন্দ্রিক স্পর্শে :

There is nothing but water at the holy-bathing places
And I know that they are useless, for I have bathed in them
The images are all lifeless, they cannot speakx
I know, for I have cried aloud to them
The Purana and the Koran are mere words,
Lifting up the curtain, I have seen.
Kabir gives utterance to the words of experience
And he knows very well that all other things are untrue.

কবীরের মূল রচনাটি ছিল এইরকম :

তীরথ সে তো সব পানি হৈ
হোবে নহী কুছ অহ্নায় দেখা।
প্রতিমা সকল তো জড় হৈ,
বোলে নহিঁ, বোলায় দেখা ॥
পুরাণ কোরান সব বাতহৈ
য়া ঘটকা পরদা খোল দেখা।
অনুভব কী বাত কবীর কহৈঁ
য়হ সব হৈ ছুঠী পোল দেখা॥

ক্ষিতিমোহনের বাংলা গদ্যানুবাদ নিম্নোক্তরূপ :

তীর্থ তো কেবল জল, তাহাতে কোন ফল নাই—সে আমি স্নান করিয়া দেখিয়াছি। প্রতিমাগুলি তো জড়, কোন কথাই বলে না—আমি ডাকিয়া দেখিয়াছি। পুরাণ কোরান তো কেবল কথা—যবনিকা অপসৃত করিয়া আমি দেখিয়াছি। কবীর কেবল অনুভব করা কথা কহিতেছে—আর সব শূন্য ও অন্তঃসারবিহীন তাহা সে বেশ দেখিয়াছে।

সাড়ে পাঁচশো বৎসর আগে প্রণীত কবীরের এই একটি দোঁহা অবলম্বনেও কিন্তু অনেকগুলি প্রচলিত বিভ্রম কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। প্রথমত, তীর্থস্নানে কোনো পুণ্য নেই, কেন না তীর্থক্ষেত্রের জলও নিছকই জল। আমি স্নান করে দেখে নিয়েছি। প্রতিমাগুলি নির্বাক, আমি ডেকেও সাড়া পাইনি। পর্দা তুলে দেখেছি, পুরাণ-কোরান সবই কথার কথা। এ সব বলার পরেও কবীর জানিয়ে দিয়েছেন, যা-কিছু তিনি বললেন, সবই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। অবশিষ্ট সমস্তই

অসত্য।

এই যে অভিজ্ঞতাকেই চূড়ান্ত মূল্য অর্পণ, যুক্তি প্রমাণের বাইরে সমস্ত কিছুই যে সর্বৈব মিথ্যা—এখানেই কবীর প্রায় ছশো বছরের সুদূরতা অতিক্রম করে ক্ষিতিমোহনকে স্পর্শ করেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ভাববিনিময় সম্ভব হয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে মর্মস্থ করেন এবং কবীরবাণী আর রবীন্দ্রবাণী একাকার হয়ে যায়।

একটি দোঁহায় কবীর নিজেই বলেছেন :

কাশীমেঁ হম প্রগট ভয়ে হৈঁ
রামানন্দ চেতায়ে

অর্থাৎ 'কাশীতে আমি প্রকাশিত হয়েছি, রামানন্দ আমাকে সচেতন করলেন'। রবীন্দ্রনাথের 'শুচি' কবিতাটি আমাদের মনে পড়বে এই সূত্রে। যদিও রামানন্দ সত্যিই কবীরের গুরু ছিলেন কী-না, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে। কবীরের পাশাপাশি মধ্যযুগের অন্যান্য সন্তকবিদের কথাও মনে পড়ে, দাদূ, রজ্জব প্রমুখের কথা।

এই সন্ত কবিদের জীবন ও সাধনার মধ্যে, সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে সামান্য ('কমন') সূত্র আছে বললে কম বলা হবে, বস্তুত বিভিন্ন সময়ে আত্মপ্রকাশ করলেও মধ্যযুগের সন্তকবিরা সবাই মিলে একটি পরিবারসদৃশ। গুরু-শিষ্য অথবা পিতা-পুত্র সম্বন্ধসূত্রে তাঁরা অনেকেই পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথও প্রায় ছ'শো বছরের সময়ের ব্যবধান সত্ত্বেও সেই একই পরিবারের যুগোচিত উত্তরপুরুষ। মধ্যযুগের সন্তকবিদের জীবনসাধনা ও সমহিতসাধনার মধ্যে সাদৃশ্যসূত্রটি কী?

আমরা আমাদের মতো ক'রে বুঝে নেব কিন্তু প্রথমে ক্ষিতিমোহনের ভাষা ও ভাষ্য দেখে নেওয়া যেতে পারে :

লিখিত সব শাস্ত্র ও গ্রন্থ অপেক্ষা এই সব নিরক্ষর সাধকদের এক-একটি বাণী কত মহান্ কত গভীর। ইঁহাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান বা সম্প্রদায়গত কোনো ভেদবুদ্ধি নাই। ইঁহারা অধিকাংশই নিরক্ষর এবং সকল সাধনার মৈত্রী ও যোগই ইঁহাদের আপন সাধনার ধন। সেই যোগসাধনাই ভারতের সাধনা, বাহিরে ইহার যত প্রতিকূল লক্ষণই দেখা যাক না কেন।—ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা ॥ অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা ১৯২৯ ॥ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ সাধকদের প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন প্রদত্ত আরও কিছু পরিচয় :

এই সব সাধকরা শাস্ত্রজ্ঞানহীন, কাজেই কোনো বাঁধা পথে তাঁহারা চালিত

হন নাই। তাঁদের প্রতিভা ও তাঁদের দৃষ্টি সদাই উন্মুক্ত ছিল। শাস্ত্রশাসিত ধর্মসম্প্রদায়গুলি সবই প্রায় গতানুগতিকভাবে বাঁধা রাস্তায় চলিয়া আসিয়াছে কিন্তু ইঁহাদের প্রত্যেকের নতুন দৃষ্টি নতুন ভাবনা নতুন পথ। এই পথে মানবমনের ভালোমন্দ নানাভাবে পরখ করিবার সাহসের পরিচয় মিলিবে। নানা দিক দিয়া ধর্মভাবকে সার্থক করিবার চেষ্টা দেখা যাইবে। মানবতত্ত্বের এত বড়ো একটি আলোচনার ক্ষেত্র যে বৃথা পড়িয়া রহিল তাহাতে রামপ্রসাদের এই কথাটি মনে হয় :

মন রে কৃষিকাজ জানো না
এমন মানবজমিন রইল পতিত
আবাদ কল্লে ফলত সোনা ।

ক্ষিতিমোহনের মহাগ্রন্থ 'দাদূ'-র (বৈশাখ ১৩৯৪) 'ভূমিকা'-য় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

আমাদের সাধক কবিদের···সকলেই প্রায় অন্ত্যজ, সমাজের নিচের তলাকার, পণ্ডিতদের বাঁধা মতের শাস্ত্র, ধার্মিকদের বাঁধা নিয়মের আচার তাঁহাদের কাছে সুগম ছিল না। বাইরের পূজার মন্দির তাঁদের কাছে বন্ধ ছিল বলেই অন্তরের মিলনমন্দিরের চাবি তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁরা কত শাস্ত্রীয় শব্দ আন্দাজে ব্যবহার করেছেন, শাস্ত্রের সঙ্গে তার অর্থ মেলে না। তাঁদের এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির রাম কোনো পুরাণের মধ্যে নেই। তুলসীদাসের মতো ভক্তকবিও এঁদের এই বাঁধনছাড়া সাধনভজনে ভারী বিরক্ত। তিনি সমাজের বাহ্য বেড়ার ভিতর থেকে এদের দেখেছিলেন, একেবারেই চিনতে পারেননি।

কবীর আর রবীন্দ্রনাথ কীভাবে কোথায় সন্নিহিত হলেন? কবীরভাবনা আর রবীন্দ্রভাবনায় কোনো পার্থক্য রইল না, কেন না কবীরের মতোই রবীন্দ্রনাথও তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেই লিখেছেন 'দাদূ'র ভূমিকায় :

যেহেতু ভারতীয় সমাজ ভেদবহুল, যেহেতু এখানে নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানা জাতি, সেইজন্যেই ভারতের মর্মের বাণী হচ্ছে ঐক্যের বাণী।···যেহেতু বাহিরের আচার ভারতে নানা আকারে ভেদকেই পাকা করে রেখেছে এই-জন্যেই ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধনা হচ্ছে বাহ্য আচারকে অতিক্রম ক'রে অন্তরের সত্যকে স্বীকার করা।—ভাদ্র॥ ১৩৩২

বাংলা গীতাঞ্জলি আর গোরা লিখছেন তখন, ১৩১৭ (১৯১০) সালে পর পর তিনদিন লিখলেন, 'হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে' (আষাঢ় ১৮), 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন' (আষাঢ় ১৯) ও 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ,

যাদের করেছ অপমান' (আষাঢ় ২০), তথাকথিত ধর্মাচারের অন্তঃসারশূন্যতা প্রসঙ্গে ২০ আষাঢ় চিঠিও লিখছেন নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা কাদম্বিনী দত্তকে :

আমাদের দেশে ধর্মই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘটিয়েছে। আমরাই ভগবানের নাম করে পরস্পরকে ঘৃণা করেছি, স্ত্রী লোককে হত্যা করেছি, শিশুকে জলে ফেলেছি, বিধবাকে নিতান্তই অকারণে তৃষ্ণায় দগ্ধ করেছি, নিরীহ পশুদের বলিদান করছি (কবীরের একটি দোঁহায় আছে—ক্ষিতিমোহনের বাংলা গদ্যানুবাদে, 'আপনার পুত্রের মস্তকমুণ্ডন করাইবার সময় কত দয়া, কত সাবধান, মাথায় যেন ক্ষুর না লাগে! আর ছাগের শিশু ধরিয়া ধরিয়া বলি দেয়,—একটুও দয়া হয় না!'—রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাসে ও 'রাজর্ষি'র অংশবিশেষের নাট্যরূপ 'বিসর্জন'-এ তিনি পশুবলির বিরুদ্ধে সোচ্চার, কবীর-পাঠের অনেক আগেই তা সম্ভব হয়েছে)—এবং সকল প্রকার বুদ্ধি যুক্তিকে একেবারে লঙ্ঘন করে এমন সকল নিরর্থকতার সৃষ্টি করেছি যাতে মানুষকে মূঢ় করে ফেলে।···ধর্মকে যে উপরে রেখেছে, ধর্ম তাকে উপরে টেনেছে—হিন্দু তা করে না। হিন্দু কেবলি বলেছে মেয়েদের জন্যে সর্বসাধারণের জন্যে এই রকম আটপৌরে মোটা ধর্মই দরকার—এই বলে সমস্ত দেশের বুদ্ধি ও আশঙ্কাকে সেই মোটার দিকে ভারাক্রান্ত করে নেমে যেতে দিয়েছে।

এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ শ্বাসরোধকারী তথাকথিত এই ধর্ম মোহ থেকে নিজের ও স্বদেশের জন্যে যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ছটফট করছিলেন, সেই মুক্তি শুধু জ্ঞানের মুক্তি নয়, সে প্রেমের মধ্যে মুক্তি। প্রতিমাপুজো ছাড়াও প্রেম হয়, সুফীদের প্রেমের সাধনার কথা তুলে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'তাঁরা কী আশ্চর্য বিশুদ্ধজ্ঞানের সঙ্গে কী অপরিসীম প্রেমের মিলন সাধন করিয়েছেন।

তাঁদের সেই প্রেম কেবল একটা শূন্য ভাবের জিনিস নয়, তা অত্যন্ত নিকট, অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ অথচ তার সঙ্গে কোনো প্রকার কাল্পনিক জঞ্জালের আবর্জনা নেই।'

নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা কাদম্বিনী দত্ত সেই ১৯১০ সালেই ধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই মূল্যায়নে দুঃখ পাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পুনশ্চ লেখেন (১৩ই জুলাই), আধ্যাত্মিক সাধনায় কোনো কোনো মহাপুরুষ আমাদের দেশে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁদের প্রতি 'মনের সমস্ত শ্রদ্ধা সত্ত্বেও দেশব্যাপী দুর্গতি এবং তার কারণের কথা যখন ভাবি তখন কল্পনার ইন্দ্রজাল দিয়ে

নিজেকে এবং অন্যকে ভোলাবার প্রবৃত্তি একেবারেই চলে যায়।'

এই চিঠি যখন লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, তখন কবীরের কবিতার অনুবাদকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন তিনি। বৈষ্ণব কবিতার প্রেমকেও তিনি আধ্যাত্মিক প্রেমরূপে গ্রহণ করেননি, 'সোনার তরী'তেই দেখা গেছে সেই প্রেমকেও তিনি নর-নারীর প্রেম রূপেই দেখিয়েছেন। কবীরের কবিতায় সেই বাস্তব নর-নারীর প্রেম কী ভাবে এসেছে, দেখা যেতে পারে···গদ্যানুবাদ ক্ষিতি-মোহনের :

নিস দিন সালৈ ঘাব
নীংদ আবৈ নহীঁ।
পিয়া মিলনকী আস
নৈহর ভাবৈ নহীঁ॥
খুল গয়ে গগন কিবাড়
মন্দির উজিয়ার ভয়ো।
ভায়ো হৈ পুরুষসে ভেট
তন মন বার দয়ো॥···

নিশিদিন সেই ক্ষত ব্যথা দিতেছে, নিদ্রা আসেই না, প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যাকুল, বাপের ঘর ভালোই লাগে না। খুলিয়া গেল গগন দুয়ার, উদ্ভাসিত হইল মন্দির (দেবালয় নয়, ঘর) হইল স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, তনু মন দিলাম ডালি।

আর একটি কবিতাও লক্ষণীয় :

প্রিয়তমের পত্রদ্বারা প্রিয়তমকে তৃপ্ত করো। নয়নে বর্ষার ঘনধারা আনয়ন করো। শ্যাম ঘাটদ্বারা চিত্তকে ছাইয়া ফেল। প্রিয়তমের কানের কাছে আসিয়া আসিয়া প্রিয়তমকে তোমার বেদনা শুনাও।

কবীর কহেন, 'শোন সাধু, প্রিয়তমের ধ্যান আজ চিত্তে আন'।

কবীরের লেখা আরও একটি প্রেমের কবিতা—

হমতো হৈঁ ইস্ক মস্তানা
হমকো হোশিয়ারী ক্যা।
রহেঁ আজাদ য়া জগমেঁ
হমকো চৈন বেচৈন ক্যা। ··

আমি তো প্রেমে পাগল হইয়াছি, আমার আবার সাবধান অসাবধান কি? প্রিয়তম হইতে যে বিচ্ছিন্ন, সে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া মরিতেছে, আমার

প্রিয়তম আমার মধ্যেই আছেন, আমি কাহার ধার ধারি?

প্রিয়তম এক পলের জন্যও আমা হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন, আমিও তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন নহি। তাঁহারই সহিত আমার প্রেম লাগিয়াছে, আমার আর অশান্তি কি? হউক না পথ গন্তব্য, হউক না পেলব দেহ, থাকুক না মাথায় প্রকাণ্ড ভার, কিন্তু হে কবীর, যখন তুমি প্রেমে মত্ত হইয়াছ, তখন চিত্ত হইতে সব ভয়কে দূর করো।

সত্যোপলব্ধির জন্যে আচার অনুষ্ঠানমূলক কোনো কিছুই কবীর গ্রাহ্য করেননি। তেমন গুরুকেও তাঁর চাই না—নিম্নোক্ত দোঁহাটিতে সেই কথাই বলেছেন :

ভাই কোই সত গুরু সন্ত কহাবৈ
নৈনন অ-লখ লখাবৈ।
প্রাণ পূজা কিরিয়াতে ন্যারা
সহজ সমাধ সিখাবৈ।···

ভাই, সেই সদ্‌গুরুকেই আমি সাধু বলি যিনি এই নয়নে অরূপের রূপ দেখাইতে পারেন, যিনি প্রাণায়াম, পূজা, আচার হইতে স্বতন্ত্র সহজ সমাধি শিখাইতে পারেন, দ্বার যিনি বন্ধ করান না, শ্বাস যিনি রোধ করান না, বিশ্বসংসার যিনি ত্যাগ করান না, এই মন যখনি যেখানে লাগুক, সর্বত্রই যিনি তাহাকে পরমাত্মা দর্শন করান এবং কর্মের মধ্যেও নিষ্কর্মা থাকিবার শিক্ষা যিনি দিতে পারেন।

কবীরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়তার সম্পর্ক এই সব প্রধান ভাব ও চেতনাসূত্রে। আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করে জ্ঞানসমৃদ্ধ প্রেমের পথেই জীবন-সত্যের উপলব্ধি সম্ভব।

বস্তুত, অধিকাংশ ব্যক্তিরই বদ্ধমূল বিশ্বাস প্রায় স্থায়ী সংস্কারে পর্যবসিত হয়েছে যে, বৈচিত্র্য যতই থাক, রবীন্দ্রনাথ প্রধানত আধ্যাত্মিক কবি। নৈবেদ্য, খেয়া, গীতাঞ্জলি প্রভৃতি তো একেবারেই আধ্যাত্মিকতায় ঠাসা। মূল বাংলা গীতাঞ্জলি এবং নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ইংরেজি গীতাঞ্জলির অনুপুঙ্খ তুলনাত্মক আলোচনার অবকাশ এখনো থেকে গেছে। 'রবিজীবনী'কার শুধু তথ্যসংকলন করেন না, তাঁর সাহিত্যিক মূল্যায়নও প্রায়শ আমাদের মুগ্ধ করে। সেই তিনিও বাংলা 'গীতাঞ্জলি'তে 'ভারততীর্থ', 'প্রণতি' ও 'অপমান' কবিতাত্রয়ীকে 'প্রক্ষিপ্ত' বলে মনে করেছেন। কেন করছেন? 'গীতাঞ্জলি' রচনাকালে ও সেই দশকটি

জুড়ে তিনি কি সত্যিই শুধু প্রিয়জনের মৃত্যুবেদনায় অভিভূত হয়ে অন্তর্মুখীই ছিলেন? তথ্য ও প্রেক্ষিত তো তা বলছে না। তিনি সেই সময়টিতেও বিচিত্র, জটিল ও কর্মমুখর জীবনই তো যাপন করেছেন। স্বদেশ, লাঞ্ছিত স্বদেশ ও শোষিত, ব্রাত্য স্বদেশবাসীদের জন্য উদ্বেগ ও তজ্জনিত মুক্তির আকাঙক্ষাতেও তিনি অধীর। ধর্মমোহ প্রসঙ্গে তীব্রভাবে সচেতন। ধর্মান্ধতা ও হিন্দুত্ববাদীদের প্রতি ধিক্কারে সোচ্চার। জীবনকে সত্য-সুন্দরের স্পর্শে সমুজ্জ্বল করার জন্যই ব্যাকুল।

গগন ঘটা ঘহরানী সাধো
গগন ঘটা ঘহরানী
পূরব দিসসে উঠাই বদরিয়া
রিমঝিম বরসত পানী ।···

উপরি-উদ্ধৃত অংশটিতে ও সমগ্র দোঁহাটিতে কবীরকেও নিসর্গসৌন্দর্য দেখে ও দেখিয়েই কবি তৃপ্ত? 'গগনে ঘোর ঘনঘটা'-র মতো একটি সূচনাংশ ও সমগ্র প্রথম স্তবকটিই কি দুর্দান্তভাবে আধুনিক নয়? পৌনে ছশো বছরের ব্যবধান পেরিয়ে ভানুসিংহ ঠাকুরের একটি পদকে চকিতে মনে পড়িয়ে দিয়েও এই পদাংশ আজকের শ্রাবণ-আকাশ জুড়ে জেগে থাকে।

কবীরের সৃষ্টিতেও জবরদস্তি আধ্যাত্মিকতার 'লেবেল' এঁটে দেওয়ার কুসংস্কার আজ সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। কবীরও কিন্তু আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য ব্যাকুল নন, জীবনসত্যের সন্ধানে যদিও অক্লান্ত তাঁর সাধনা। সহজ সর্বজনবোধ্য হিন্দিভাষায় তাঁর রচনাকর্ম। মাতৃভাষা, স্বদেশ ও স্বজাতির মুক্তির জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা এই দোঁহাটিতেও স্পষ্ট। কৃষকজীবনের, ধানচাষের ও ধানকাটার মূল কথাগুলি এখানে চমৎকার ও স্বচ্ছন্দ শিল্পরূপ লাভ করেছে এবং শেষ ছত্রটিতে যে-সাম্যবাদী সুরটি ধ্বনিত, তাতে এই দোঁহা একেবারেই আধুনিক জীবনবাদী বোধে ভাস্বর। কোনো ভাষ্য ছাড়াই এখানে কবীরের দোঁহাটির ক্ষিতিমোহন-কৃত বাংলা গদ্যানুবাদটি উদ্ধৃত করছি :

আজ গগনে ঘোর ঘনঘটা, আজ ঐ শোন মেঘের গভীর ধ্বনি। পূর্বদিক হইতে বাদল উঠিয়াছে, আজ রিম ঝিম্ জলধারা বর্ষণ হইতেছে।

আপন আপন ক্ষেত্রের আলি আজ সামলাও, আজ এই জল বহিয়া চলিল। প্রেম ও বৈরাগ্যের লতাকে আজ এই রসে সিক্ত করিয়া মুক্তি ক্ষেত্র প্রস্তুত করো। ধান কাটিয়া যে ঘরে আনিতে পারিবে সেই তো কুশল

কৃষাণ। যদি সেই প্রেম বৈরাগ্যের অন্নে পূর্ণ পাত্র সমানভাবে পরিবেশন করিতে পার, তবে মুনি জ্ঞানী সকলেই তোমার অন্নে পরম তৃপ্তি লাভ করিবেন।

'কুশল কৃষাণ' কাকে বলে, কবীর তা জানালেন এখানে। 'অন্নেপূর্ণ পাত্র'-টাই যে মানুষের সর্বাগ্রে প্রয়োজন, তা-ও স্পষ্ট করলেন। 'সমানভাবে পরিবেশন'-এর কথা বললেন। বললেন, যথার্থ মানবহিতৈষী সাধুরা ও জ্ঞানীরা সকলেই অন্নের সেই 'সমবন্টনেই পরম তৃপ্তি লাভ করবেন'। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না', কবীরও একথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ক্ষুধার্তের কাছে ধর্মনিষ্ঠা আশা করো না। জপমালা নিয়ে নাও, দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ার জন্য আধসের শস্য দাও, শোবার জন্য একটা খাটিয়া দাও, কাঠের বালিশেও চলবে।

'কেউ যদি তবু প্রশ্ন তোলেন, 'প্রেম ও বৈরাগ্যের অন্ন'-এর কথা বলছেন কবীর, এখানেই তাঁর আধ্যাত্মিকতা, যেমন রবীন্দ্রনাথও ব্যবহার করেছেন আধ্যাত্মিক পরিভাষা ; তা-হলে তারও দু'টি স্পষ্ট উত্তর আছে। প্রথমত, এখন থেকে প্রায় ছশো বছর আগের ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও মানবিক মূল্যবোধভিত্তিক প্রেম-এর প্রয়োজন কতটা ছিল, তা অনুভব করা কঠিন নয়, কাদম্বিনী দত্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির উদ্ধৃতাংশের আলোকে।

কবীর ও মধ্যযুগের অন্যান্য সন্তকবিসহ রবীন্দ্রনাথ কেন কবিতায়-গানে আধ্যাত্মিক পরিভাষা ব্যবহার করেন, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কোপানীর কথা অনুসরণে এই সন্দর্ভের সূচনাতেই আমরা তার সম্ভাব্য কারণটি অন্বেষণের চেষ্টা করেছি : কবীর-তুকারাম প্রমুখের গানে-রচনায় ধর্মীয় অনুষঙ্গ ও পরিভাষার ব্যবহার কেন আসে? সমকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসকশ্রেণীগুলির শোষণের হাতিয়ারই যখন ধর্ম, তখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কবিতার বা পদ্যের, এককথায় সাহিত্যের ভাষা ও প্রকাশও স্বভাবতই একই ধর্মীয় ভাবাদর্শের গড়ন বা নির্মাণশিল্পকেই অঙ্গীকার করে নেয়।

তাই, ধর্মীয় অনুষঙ্গ বা পরিভাষার ব্যবহার দেখেই কোনো বাঁধা বুলি আওড়ালে স্রষ্টার প্রতি অবিচার হয়ে যেতে পারে। তা-ছাড়া কবীরসহ মধ্য-যুগের সন্তকবিরা এবং রবীন্দ্রনাথ : কেউ ছিলেন না জীবনপলাতক বৈরাগ্য-বিলাসী তত্ত্বকথাসর্বস্ব আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। তাঁরা সকলেই গান করেছেন সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে এবং সেই গান সর্বসাধারণের উদ্দেশে বলেই তাঁদের কারো

গানের ভাষা দুর্বোধ্য পণ্ডিতের বা দার্শনিকের ভাষা নয়। কবীর বলেছিলেন, 'সংস্কৃত কূপ জল কবীরা ভাষা বহতানীর'। ক্ষিতিমোহনের অনুবাদে, 'হে কবীর, সংস্কৃত হইল কূপজল ; ভাষা হইল প্রবহমান জলধারা'!

চলিত হিন্দী ভাষাতেই জীবনের গানে নৃত্যের ছন্দ ফুটিয়ে তুলেছেন কবীর। বলেছেন, জগৎ ও জীবন থেকে দূরে কোথাও যাবে না। জন্ম ও মৃত্যু, দুই নিয়েই জীবন, হাসিকান্নাভরা লৌকিক জীবনটা সৃষ্টিসুখের আনন্দে নিবেদিত হোক :

নাচুরে মোর মন মও হোয়
প্রেমকো রাগ বজায় রৈন দিন
শব্দ সুনৈ সব কোই॥
রাহু কেতু নবগ্রহ নাচৈ
জন্ম জন্ম আনন্দ হোই।
গিরি সমুন্দর ধরতী নাচৈ
লোক নাচৈ হঁস রোই॥
ছাপা তিলক লাগায় বাঁস চঢ়
হো রহা জগসে ন্যারা
সহস কলা কর মন মেরো নাচৈ
রীঝৈ সিরজনহারা॥

নৃত্য করো আমার মন, মত্ত হইয়া নৃত্য করো। প্রেমের রাগিনী দিন রাত্রি বাজাইতেছে, সবাই শুনিতেছে সেই সঙ্গীত। রাহু কেতু নবগ্রহ নৃত্য করিতেছে, জন্ম মৃত্যু আনন্দে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে, গিরি সমুদ্র ধরিত্রী নৃত্য করিতেছে, হাস্যে ক্রন্দনে নিখিল লোক নাচিতেছে।

ছাপা তিলক লাগাইয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া জগৎ হইতে কেন দূরে রহিয়াছ? এই দেখ, সহস্র কলায় আমার মন নৃত্য করিতেছে, সৃজনকর্তা তাহাতেই পরিতৃপ্ত।

কবীরের এই জীবনসঙ্গীতই ভালো লেগেছিল রবীন্দ্রনাথের। জীবনবাদী-আনন্দবাদী রবীন্দ্রনাথকে এই সব গান প্রাণিত করবে না, উদ্দীপ্ত করবে না?

রবীন্দ্রনাথ এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে বলবেন না : জেগে আছি ?

কবীরের জন্মের পর ছ'শো বছরের বেশি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখন থেকে সাড়ে পাঁচশো-পৌনে ছশো বছর আগেও জাত-পাত-সাম্প্রদায়িকতার

অন্ধকার যে ছিল আর পাশাপাশি সেই অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর ক্রন্দন ও সংগ্রামও ছিল, তার নিদর্শন দেখা গেল। বস্তুত মহাভারতের যুগেও ব্রাত্য-দলিত মানুষের বিরুদ্ধে সমাজের শিষ্ট-অভিজাত ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর দলন-পেষণ যে ছিল, তারও দৃষ্টান্ত বিরল নয়। শ্রেণীতে-শ্রেণীতে এই অসাম্যের আখ্যান তাই ইতিহাসেরই সত্য। ধর্মের দোহাই দিয়েই এইসব অমানবিকতার শাখা বিস্তার, পাশাপাশি উভয় শ্রেণীরই সচেতন অংশের প্রতিবাদ ও সংগ্রামও লক্ষণীয়।

"কিন্তু সে অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছজাতি, 'সাধারণে'র (অর্থাৎ দ্রোণাচার্যের শিষ্যসাধারণের, এখানে অভিজাত বংশোদ্ভূত কৌরব ও পাণ্ডব রাজপুত্রশিষ্য-সাধারণের!) সতীর্থ (একই গুরুর সমকালীন শিষ্য) ও সমতুল্য হয়, ইহা নিতান্ত অনভিপ্রেত, এই বিবেচনা করিয়া দ্রোণ তাহাকে ধনুর্বেদে দীক্ষিত করিলেন না"—বেদব্যাস-বিরচিত মহাভারতের কালীপ্রসন্ন সিংহ-কৃত অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত এই অংশটি আদিপর্বের অন্তর্গত।

'একলব্যের অলৌকিক গুরুভক্তি' উপাখ্যানটি সর্বজনবিদিত হলেও প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সংক্ষেপে স্মরণ করা যেতে পারে। দ্রোণাচার্য কর্তৃক এইভাবে প্রত্যাখ্যাত নিষাদযুবক একলব্য অতঃপর কী করলেন? তিনি বিষাদমগ্ন হয়েও দ্রোণকে প্রণাম নিবেদন করে অরণ্যে প্রবেশ করলেন। সেখানে মৃন্ময় এক দ্রোণমূর্তি স্থাপন করে, সেই মূর্তিকেই আচার্যজ্ঞানে বরণ করে অস্ত্রশিক্ষায় মনঃসংযোগ করলেন। অল্পদিনেই একলব্য অস্ত্রপ্রয়োগ, সংহার ও সন্ধানবিষয়ে অসাধারণ পটুত্ব অর্জন করলেন। পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি মহাধনুর্ধর হয়ে উঠলেন।

একদিন কৌরব ও পাণ্ডব রাজভ্রাতারা মৃগয়ার উদ্দেশ্যে অরণ্যে প্রবেশ করেন। তাঁদের সঙ্গে কুকুর সহ অনুচরও ছিল। কুকুরটি মৃগের অনুসরণক্রমে অরণ্যের গভীরে সহসা মলিনকলেবর জটাধারী নিষাদযুবক একলব্যকে দেখে চিৎকার করতে থাকে। একলব্য নিজের অস্ত্রপ্রয়োগের কুশলতা পরীক্ষার জন্য কুকুরটির মুখবিবরে একসাথে সাতটি শর নিক্ষেপ করেন। কিছুক্ষণ পরে কুকুরটিকে দেখে পাণ্ডবেরা চমৎকৃত হয়ে বুঝতে পারেন, এ এক অসাধারণ নৈপুণ্য, যা তাঁদের আয়ত্তাতীত। তাঁরা হীনম্মন্যতাবোধে লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হন। পাণ্ডবেরা অতঃপর নিরবচ্ছিন্ন শরবর্ষণরত একলব্যকে দেখতে পান এবং অনুসন্ধানের উত্তরে জানতে পারেন যে, 'আমি নিষাদাধিপতি হিরণ্যধনুর পুত্র, দ্রোণের শিষ্য, এই আশ্রমে একাকী ধনুর্বেদ অনুশীলন করছি।'

পাণ্ডবেরা দ্রোণকে গিয়ে সব কথা জানালেন। অর্জুন দ্রোণকে নির্জনে জানালেন, দ্রোণ তাঁকে কথা দিয়েছিলেন যে, অর্জুনের চেয়ে তাঁর কোনো শিষ্যই অধিকতর নিপুণ হবেন না—'কিন্তু এক্ষণে তাহার অন্যথা দেখা যাইতেছে। নিষাদাধিপতির পুত্র মহাবল একলব্য আপনার এক শিষ্য, সে ধনুর্বেদে আমা অপেক্ষাও সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।'

বিভ্রান্ত ও বিচলিত দ্রোণ অর্জুন সহ অরণ্যে প্রবেশ করে বারংবার শরবর্ষণরত একলব্যের সম্মুখীন হলেন। সহসা সমাগত দ্রোণকে দেখে তাঁর

পাদবন্দনা করে একলব্য নিজেকে তাঁর শিষ্যরূপে পরিচয় দিয়ে বিধিমতো দ্রোণের পূজা ও উপবেশনের জন্য আসন প্রদান করে জোড়হস্তে গুরুর সামনে দাঁড়ালেন। দ্রোণ তখন বললেন, ' হে বীর, যদি তুমি সত্যিই আমার শিষ্য হও, তবে এবার গুরুদক্ষিণা প্রদান কর।'

সরল ও বীর নিষাদযুবক একলব্য এ কথা শুনে আনন্দিত হয়ে বললেন, গুরুকে অদেয় তাঁর কিছুই থাকতে পারে না। দ্রোণ কী দক্ষিণা চান, তা-ই একলব্য তাঁকে দেবেন। দ্রোণ শুধু আদেশ করলেই হয়।

তখন দ্রোণাচার্য যা বলেছিলেন, সর্বদেশে-কালে শিক্ষক বা শিক্ষকস্থানীয় কোনো ব্যক্তির পক্ষে সেই মানবতাবিরোধী চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতার কল্পনা পর্যন্ত অসম্ভব। মূল মহাভারতের অনুবাদ থেকেই পরবর্তী অংশটি উদ্ধৃত করছি :

"তখন দ্রোণ কহিলেন, 'হে বীর! যদি সম্মত হইয়া থাক তবে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া দক্ষিণাস্বরূপে আমাকে সম্প্রদান কর!'—সত্যবাক একলব্য দ্রোণের এইরূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়াও আপনার প্রতিজ্ঞা-প্রতিপালনার্থ প্রফুল্লমনে ও হৃষ্টবদনে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ গুরুদক্ষিণা প্রদান করিল।"

উদ্ধৃতি এখানেই শেষ করা যাচ্ছে না। মূল মহাভারতের অনুবাদ থেকে আর তিনটি মাত্র বাক্য উদ্ধার করলেই উপাখ্যানটির সম্পূর্ণ তাৎপর্য পরিস্ফুট হবে। গুরুদক্ষিণা প্রদানের পরই একলব্যের প্রথমেই মনে হয়েছিল, তাঁর শরবর্ষণনৈপুণ্যের কতটা ক্ষতি হল? মহাভারত-রচয়িতার এই সুগভীর মানব-সচেতনতা শ্রেষ্ঠ আধুনিক ঔপন্যাসিকেরও ঈর্যাস্থল। মহাভারতের বিশ্লেষণও বিস্তর নেই বললেই চলে। ন্যূনতম ও অত্যাবশ্যকের বাইরে মহাকবি পদসঞ্চার করেন না। একলব্য গুরুদক্ষিণা প্রদান করলেন—

'তৎপরে অপর অঙ্গুলিদ্বারা শরক্ষেপ করিয়া দেখিল, পূর্বাপেক্ষা শরের লঘুতা (অর্থাৎ ক্ষিপ্রকারিতা তথা মুহুর্মুহু নিক্ষেপশক্তি) হ্রাস পাইয়াছে।' অর্জুনের প্রতিক্রিয়াও লক্ষণীয়। অর্জুন কি একলব্যের এই অসামান্য গুরুভক্তি দেখে আরও একবার আত্মপক্ষে হীনম্মন্যতাবোধে জর্জরিত হয়েছিলেন? অর্জুন কি গভীর সমবেদনায় মর্মাহত হয়ে একবারও একজন সাধারণ মানুষের মতো ভেবেছিলেন, থাক! এই অমানবিক নিষ্ঠুরতার পর কাজ নেই আর দ্বিতীয়রহিত ধনুর্ধর হয়ে? এই জাতীয় অন্তত তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াও স্বাভাবিক ও মানবিক হত।

মহাভারতকার অকম্পিত হস্তে যা লিখেছিলেন, তা থেকে শুধু এই

সিদ্ধান্তেই পৌঁছানো চলে যে, আধুনিক সব নিষ্ঠুরতা, সব লোভ, সব অবিবেচনা, কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত সব উচ্চাশারই সুপ্রাচীন দৃষ্টান্ত রয়ে গেছে। মূল মহাভারতে অর্জুনের প্রতিক্রিয়া এই রকম :

'অর্জুন এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া অতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তখন তাঁহার অপকর্ষবিষয়ক আশঙ্কা তিরোহিত হইল ; এই ধরাধামে অর্জুনকে কেহই পরাভব করিতে পারিবে না, দ্রোণাচার্যের এই অঙ্গীকারবাক্যও রক্ষা হইল।'

সকলেই জানেন, মহাভারত ধর্মগ্রন্থ বা তথাকথিত গল্পগ্রন্থ নয়। মহাভারতকে প্রাচীন যুগের সাহিত্যতত্ত্ববিদ্‌গণ তথা সাহিত্য-সমালোচকেরাও সঠিকভাবেই ইতিহাস বলেই চিহ্নিত করে গেছেন। অসংখ্য বিচিত্র গল্পের কারুকার্যে সুসজ্জিত ও অলংকৃত এই তুলনারহিত গ্রন্থ তদানীন্তন সমাজজীবনের যাবতীয় তথ্য ও অন্তর্নিহিত সত্যসমৃদ্ধ এক অসামান্য ইতিহাস।

রামায়ণও ইতিহাস। সেখানেই শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ শূদ্রের অধিকার-বহির্ভূত ছিল বলে জানা যায়। শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠের অপরাধে শূদ্রের মস্তকচ্ছেদনে তাই রামকে তৎপর হতে হয়েছিল।

মহাভারতের অর্জুনাদি রাজপুত্র এবং রামায়ণের রাজা রামের যেসব আচার-আচরণ আধুনিক দৃষ্টিতে 'অসংগতি'রূপে বিবেচিত হয়, সেগুলিকে অসংগতিরূপে ধরে নেওয়ার কারণ এই যে, অর্জুনাদি ও রাম প্রভৃতিকে অতিমানব বা অবতাররূপে দেখার সংস্কার বহুকালাবধি সযত্নে লালিত হয়ে এসেছে। এবং এসবই উদ্দেশ্যমূলক। তথ্য ও যুক্তিবর্জিত অন্ধভক্তি ও কুসংস্কারের ক্ষতিকর প্রভাবে রামায়ণ-মহাভারতের মতো অসামান্য সাহিত্য-গুণসমৃদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থাদিকে আমরা বিকৃত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে হয় অলৌকিক ধর্মীয় মাহাত্ম্যপূর্ণ নয় নিছক শ্রুতিসুখকর কাহিনীমালায় পর্যবসিত করেছি। একলব্য তাঁর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করলে অর্জুনের 'অতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন' হয়ে ওঠার কারণ 'তাঁহার (অর্থাৎ অর্জুনের) অপকর্ষবিষয়ক আশঙ্কা তিরোহিত হইল' এবং শূদ্রবধে রামের আত্মতৃপ্তির অবকাশ এখানেই যে, রাম শূদ্রের তথা অন্ত্যজ অস্পৃশ্য শ্রেণীর মানুষের গ্রন্থপাঠের তদানীন্তন সমাজানুমোদিত শাস্তিপ্রদান করে 'রাজকর্তব্য' সমাধা করতে পারলেন!

মনে রাখতে হবে, মহাভারতকার স্পষ্টই লিখেছেন, 'অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছজাতি' অভিজাতবংশীয় রাজপুত্রগণের 'সতীর্থ ও সমতুল্য হয়, ইহা নিতান্ত

অনভিপ্রেত'! শূদ্রজাতি গ্রন্থাদি পাঠের জ্ঞান আহরণ করবে, রামায়ণ-এ দেখা যাচ্ছে, তা-ও 'নিতান্ত অনভিপ্রেত'!

সুতরাং একালের পাঠকের চোখে রাম ও অর্জুনাদির আচার-আচরণ অসংগত, অন্যায়, এমনকী মনুষ্যত্বদ্বেষী বলে মনে হলেও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ তদানীন্তন অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পটভূমিকায় এবং শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণীস্বার্থরক্ষার দিক থেকে দেখলে একলব্যকে তাঁর সাধনালব্ধ ধনুর্বিদ্যা থেকে বঞ্চিত ও অক্ষম করে অর্জুনের 'প্রীতি' 'প্রসন্নতা' এবং 'কষ্টার্জিত গ্রন্থপাঠক্ষমতার' অপরাধে 'শূদ্রকে হত্যা করে রামের' 'আত্মতৃপ্তি' আদৌ অপ্রত্যাশিত ও অসম্ভব বলে মনে করা যায় না!

দ্রোণাচার্যের আচরণকে মানবতাবিরোধী চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা বলে চিহ্নিত করতেই হবে কিন্তু তাঁর আচরণও উপরি-উক্ত কারণে অপ্রত্যাশিত ও অসম্ভব নয়। চরিত্রের বিচারেও এতে কোনো অসংগতি খুঁজে লাভ নেই।

একজন প্রকৃত শিক্ষক তথা গুরুর এই মনুষ্যত্বদ্বেষী নিষ্ঠুরতা কল্পনা করাও কঠিন বটে, তবু বাস্তব সত্য অতিশয় নির্মম!

দ্রোণাচার্য কে?

তিনি শিক্ষক তথা আচার্য। এই তাঁর বৃত্তি ও জীবিকা।

বৃত্তি ও চরিত্রের বিশ্লেষণে তিনি বুদ্ধিজীবী। বিদ্যাবুদ্ধির ব্যবহার তথা বিক্রয় দ্বারাই তাঁর জীবনযাপন । তিনি কৌরব ও পাণ্ডব রাজভ্রাতাদের শিক্ষাদানকার্যের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই কার্যের বিনিময়ে দ্রোণ বেতনস্বরূপ কী পেতেন, মূল মহাভারতের অনুবাদ থেকেই দেখা যেতে পারে—'ভীষ্মদেব প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া প্রচুর অর্থের সহিত পৌত্রদিগকে শিষ্যরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তাঁহার বাসের নিমিত্ত পরিচ্ছন্ন ও ধনধান্যসম্পন্ন এক গৃহ নির্দেশ করিয়া দিলেন।'

এই বেতনের বিনিময়ে দ্রোণ কুরুপাণ্ডব রাজপুত্রদের শিক্ষাগুরুরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রথমাবধি তিনি অর্জুনের প্রতি অধিকতর অনুকূল ছিলেন। খুব সংগত বাস্তব কারণেই তাই দ্রোণ 'অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছজাতি'ভুক্ত একলব্যকে কুরুপাণ্ডব রাজপুত্রদের 'সতীর্থ ও সমতুল্য'রূপে গ্রহণ ও শিক্ষাদান করতে পারেন না। একলব্যকে যে দ্রোণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তার কারণ তাঁর শ্রেণীচেতনাজনিত বিমুখতা ও অস্পৃশ্যতা নিশ্চয়ই। শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণী-স্বার্থকে যদি তিনি অস্বীকার করতেও চাইতেন এবং একলব্যকে অভিজাত রাজপুত্রদের 'সতীর্থ ও সমতুল্য' জ্ঞানে শিক্ষাদান করতেন তাহলে

রাজপরিবারের ওই লোভনীয় বেতন ও সুখসুবিধার শিক্ষকপদটি থেকে দ্রোণ নিশ্চিত বিতাড়িত হতেন। তাঁকে পুনরায় কর্মচ্যুত হতে হত। তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ ও নিরাপত্তা তাতে বিনষ্ট হত। চাকরি খোয়ানোর ভয় সেকালেও বুদ্ধিজীবী দ্রোণের এক তিল কম ছিল না। বাঁধা-বেতনের উপরেও বুদ্ধিমান ভীষ্ম তাঁকে 'কুরুদিগের' 'যাবতীয় ধন ও রাজ্য'-ভোগের আশ্বাসও দিয়ে রেখেছিলেন। মহাভারতের পাঠকমাত্রই জানেন, এই নবলব্ধ পদটি লাভের পূর্বে কীভাবে দ্রোণ দ্রুপদরাজের দ্বারা অপমানিত হয়েছিলেন। সুতরাং দ্রোণ নিষাদাধিপতির পুত্র অস্পৃশ্য অন্ত্যজ একলব্যকে কুরুপাণ্ডব রাজপুত্রদের সঙ্গে শিষ্যরূপে স্বতন্ত্রভাবে বা একাসনে গ্রহণ করতেই পারেন না। সেটা হত তাঁর পক্ষে বিলাসিতা ও অবিমৃশ্যকারিতা। অগ্রিম এককালীন প্রচুর অর্থ ('অ্যাডভান্স'), সুরম্য সুসজ্জিত ভবন ('ওয়েল-ফারনিশড কোয়ার্টার্স'), সেই ভবন আবার ধনধান্যসম্পন্ন এবং তদুপরি 'কুরুদিগের' 'যাবতীয় ধন ও রাজ্য' ভোগের আশ্বাসের লোভ পরিত্যাগ করে দ্রোণের মতো অদ্বিতীয় আচার্যও সে কালেও স্বাধীনচিত্ত, ন্যায়নীতিসংগত, মানবিকবিচারবোধ-সমন্বিত কার্যধারার পরিচয় দিতে পারেননি—এটা মনে রাখতে হবে। একই কারণে পরে দ্রোণকে অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুর আচরণে প্রবৃত্ত হতে দেখি। শ্রেণীচরিত্র, অর্জুনের প্রতি স্নেহাধিক্য এবং ব্যক্তিগত ঈর্ষাও এই আচরণের কারণ। ঘটনাটা কী? দ্রোণকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েও তো একলব্য শুধু তাঁর ব্যক্তিগত নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের জোরেই দ্রোণাচার্যের চেয়েও ধনুর্বেদে অনেক, অনেক বেশি নিপুণ হয়ে উঠেছিলেন? শুধু অর্জুনের আত্মাভিমানই নয়, দ্রোণের আত্মাভিমানও এইভাবে আহত হয়েছিল নিষাদযুবক একলব্যের অসামান্য দক্ষতা অর্জনের ফলে। তাই, একলব্যকে তাঁর সরলতা, নির্ভীকতা ও গুরুভক্তির দণ্ড দিতে হল এইভাবে। অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ যুবক একলব্য শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধররূপে পরিকীর্তিত হবেন, এটা অর্জুন-দ্রোণদের শ্রেণীস্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। বুদ্ধিজীবী দ্রোণাচার্য যখনই দেখলেন, তাঁর ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত প্রাধান্য ও গুণপনা ওই অন্ত্যজ অস্পৃশ্য নিষাদযুবক একলব্যের সাধনায় খর্ব হয়ে গেছে, তখনই তিনি চূড়ান্ত মানবতা-বিরোধী একটি পাপকার্যে প্রবৃত্ত হলেন। একলব্যের সরলতা ও শ্রদ্ধার সুযোগ নিয়ে তাঁর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠটি গুরুদক্ষিণারূপে দাবি করে বসলেন!

বুদ্ধিজীবী বলেই কি এই হীনতা ও নিষ্ঠুরতা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল? তা নিশ্চয়ই নয়। তবে যত বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীই হন-না-কেন যখন তিনি দ্রোণাচার্যের মতো আত্মবিক্রয় করে বসেন, তখনই এই জাতীয় বিবেকবর্জিত

নিষ্ঠুরতা অনিবার্য হয়ে ওঠে। বুদ্ধিজীবী যদি বুদ্ধিযোগীও হন তা হলে এই বিবেকবর্জিত আচরণ থেকে আত্মরক্ষা অসম্ভব নয়। বুদ্ধিযোগী অর্থাৎ বুদ্ধির সাত্ত্বিক সাধনায় যিনি প্রবৃত্ত হন এবং পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা ও সত্যসন্ধানের ব্যাকুলতা যাঁর নিরন্তর—তিনিই তামসিক আত্মমোহ ও আত্মখণ্ডন থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারেন। বুদ্ধি শুধু জীবিকা-অর্জনের মাধ্যম হতে পারে না, বুদ্ধিযোগে মানুষ তার পারিপার্শ্বিকতার বোধ ও সমাজচেতনার শুদ্ধ স্তরেও উপনীত হয়। তখনই একজন বুদ্ধিজীবীকে বুদ্ধিযোগীও বলি। অর্থাৎ সত্যের সাধনায় যিনি অক্লান্ত, সেই বুদ্ধিযোগীকেই প্রকৃত বুদ্ধিজীবী বলা যায়।

তা হলে বুদ্ধিজীবী হলেই তিনি বিভ্রান্ত বা বিচারবিবেকবর্জিত হবেনই, এ কথা মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু বুদ্ধিজীবীও বিভ্রান্ত এবং বিচারবিবেকবর্জিত হতে পারেন। প্রকৃত বুদ্ধিজীবী এই অর্থেই বুদ্ধিযোগী বা বুদ্ধির সাধক, সাধনা ও সন্ধানের সততায় যাঁর বুদ্ধি শুদ্ধ ও নির্মোহ । শুদ্ধ ও নির্মোহ বুদ্ধি থেকেই নির্মোহ দৃষ্টি অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টির অধিকার জন্মায়। নিরাসক্ত দৃষ্টি তথা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিও বলা যেতে পারে একে। এই দৃষ্টি ইতিহাস-সচেতন। এই দৃষ্টি গতিশীল। সে-গতি সম্মুখবর্তী, সে-গতি পশ্চাদ্‌গতি নয়।

নৃপতি রাম ও রাজপুত্রদের শিক্ষক দ্রোণ বিদ্যাবুদ্ধির শুধু অধিকারীই ছিলেন না, তাঁরা নিজের নিজের বিষয়ে পারদর্শী, সুপণ্ডিত ও প্রায় অদ্বিতীয় গুণী পুরুষ ছিলেন। বুদ্ধিজীবীরূপে তাঁরা ছিলেন তাঁদের সমকালে সর্বাগ্রগণ্য। তবু তাঁরা মানবতাবিরোধী, নৃশংস কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কারণ, তাঁদের বুদ্ধি ও দৃষ্টি বিশুদ্ধ অর্থাৎ নির্মোহ অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ সম্মুখগতি তথা প্রগতিশীল ছিল না। রাম তো তাঁর ব্যক্তিজীবনে প্রচলিত কুসংস্কারের দাসত্ববন্ধনে নিত্যজর্জরিত ছিলেন। অশেষ গুণপনা সত্ত্বেও তিনি নিরপরাধ নারী, তাঁর পত্নীর অমানুষিক লাঞ্ছনায় যন্ত্ররূপে নিজেকে ব্যবহৃত হতে দিয়েছিলেন। তাই মাইকেল যখন বলেন, তিনি রামকে ঘৃণা করেন, তখন সেই মন্তব্যের তাৎপর্য এইভাবেই দেখতে হয়।

সুতরাং নিজের নিজের বিষয়ে অসীম জ্ঞান ও পারদর্শিতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই কায়েমি স্বার্থের পরিপোষক ও প্রতিক্রিয়াশীলরূপে চিরকালই ব্যবহৃত হয়ে এসেছেন। বুদ্ধি ও দৃষ্টি নির্মোহ ও প্রগতিশীল না-হলে এ-রকমটা অনিবার্য বলেই মনে হয়।

তাই যাকে আমরা সাধারণত ব্যক্তিগত চরিত্রের অসংগতি ও জটিলতারূপে

নির্দেশ করে থাকি, তার মূল নিহিত আসলে ব্যক্তিবিশেষের শ্রেণীচরিত্র ও শ্রেণীস্বার্থরক্ষার সচেতন বা অনতিসচেতন বা আপাত-দুর্বোধ্য প্রয়াসের গভীরে।

লেখক-শিল্পী-সাংবাদিক-শিক্ষক প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী তো সমাজবিচ্ছিন্ন নন। তাঁদেরও অন্নবস্ত্রের সংস্থানের কথা ভাবতে হয়। স্বভাবতই তাঁদের ক্ষেত্রেও চিন্তা ও বুদ্ধির স্বাধীনতা রক্ষা একটি সুকঠিন কাজ। অর্থ, সম্মান, প্রতিষ্ঠা ও পদমর্যাদা লাভ বা বৃদ্ধির দিকে বুদ্ধিজীবীরা যদি ঝুঁকে পড়েন, তা হলে ক্রমশ দেশ ও সমাজের শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলির ইচ্ছাপূরণের যন্ত্রে তাঁদেব পর্যবসিত হতেই হয়। লেখকদের প্রসঙ্গে উচ্চারিত মনীষী মার্কসের সতর্কবাণীটি তাই সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবীর পক্ষেও প্রযোজ্য—'The writer, of course must earn in order to be able to live and write, but he must by no means live and write to earn.'।

রাম স্বয়ং প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন, কিন্তু সাধ্বী স্ত্রীর চরিত্রে ভিত্তিহীন সংশয় তাঁর নিজেরও জেগেছিল এবং তিনি নারীর ব্যক্তিত্ব ও নারীস্বাধীনতার প্রতি তদানীন্তন সমাজ-মানসিকতার দ্বারাই চালিত হয়ে সমাজের কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূরূপেই যা করার, তাই করেছিলেন, তিনি প্রজানুরঞ্জক সম্ভবত ছিলেন না, কারণ তা হলে তিনি শাস্ত্রগ্রন্থপাঠের অপরাধে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য তাঁরই প্রজাকে হত্যা করতে পারতেন না, কিন্তু তিনি যে কায়েমি স্বার্থের একনিষ্ঠ রক্ষক ছিলেন, রামায়ণ-এর নির্মোহ পাঠকের সে-বিষয়ে কোনো সংশয়ই থাকতে পারে না।

রামায়ণ-মহাভারতের দৃষ্টান্ত নিয়েই এই বাগ্‌বিস্তার কেন অত্যাবশ্যক বলে মনে করেছি, এই প্রবন্ধের যে-কোনো মনোযোগী পাঠকই তা অনুভব করবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের প্রধান সামাজিক ব্যাধিটির নাম স্থবিরতা। এস. ওয়াজেদ আলির 'ভারতবর্ষ' রচনার সেই মন্তব্যটি সত্যিই প্রবাদপ্রতিম—'সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে'। রামায়ণ-মহাভারতের মতো ক্লাসিক গ্রন্থাদির প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গের ব্যবহার এমনিতেই প্রত্যাশিত। তদুপরি, স্থবিরতাই আমাদের 'অপরিত্যাজ্য ধর্ম' হয়ে উঠেছে। নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমেই, রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে সময়ের বিচারে বহু দূরে চলে আসার পরেও আমাদের চলমান জীবনে না হলেও আমাদেব মানসিকতায় একটি দুর্বোধ্য ও দুর্ভেদ্য রক্ষণশীলতাই সতত সক্রিয়। তাই আমাদের রাষ্ট্রচিন্তার পরাকাষ্ঠা রামরাজত্বের

কল্পনাবিলাসে এবং আমাদের অগ্রণী কিছু বুদ্ধিজীবীও সর্বকালের দ্রোণাচার্যের পদাঙ্ক-অনুসরণে চরিতার্থ। রামায়ণ-মহাভারতের কাল থেকেই দুর্ভাগ্যজনক হলেও একটি নির্মম সত্য প্রতিভাত হয়ে এসেছে। একলব্যের শোচনীয় পরিণাম এবং গ্রন্থপাঠের অপরাধে রামায়ণে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের মস্তকছেদন যে-কারণে ঘটেছিল, পরাধীন ভারতবর্ষে বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিও সেই একই কারণে এই বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যর্থ নমস্কার লাভ করেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন।

সেই কারণটি কী? রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যার তীব্রতা এতটুকু হ্রাস পায়নি; সময় বদলাচ্ছে, যুগের অবসান ঘটছে, তবু প্রতিক্রিয়া ও কায়েমি স্বার্থের পরিপোষক একটা অদ্ভুত ও অসত্য দৃষ্টিভঙ্গি অটল প্রতিষ্ঠিত থেকে যাচ্ছে এ-দেশে সর্বকালেই—এই অবিশ্বাস্য রহস্যের মূল কোথায় নিহিত?

খুব সংক্ষেপে, এককথায় এর জবাব দিতে হলে বলা যায়—মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী অভিজাত একটি শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্যই, রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকেই যখনই জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের আলো বিকিরণের সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে তখনই ওই মুষ্টিমেয় শ্রেণী এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত, পুষ্ট ও আশ্রিত কিছু গণ্যমান্য মানুষ সেই চেষ্টার মূলে নির্মম কুঠারাঘাত করেছেন।

সেই প্রাচীনকাল থেকেই জ্ঞানলোকের উৎস শিক্ষা মুষ্টিমেয় মানুষের করতলগত থেকে গেছে। ওই কৃপণ মুঠি খুলবার চেষ্টা যখনই হয়েছে, যখনই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা হয়েছে, লোকশিক্ষা বা জনশিক্ষা বা গণশিক্ষার প্রস্তাব ও পরিকল্পনা যখনই উত্থাপিত ও গৃহীত হয়েছে, তখনই ওই মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী মানুষের শ্রেণী সর্বতোভাবে তাতে বাধাদানে প্রবৃত্ত হয়েছে। এই ঐতিহাসিক সত্যটিকে, শ্রেণীসংগ্রাম ও শ্রেণীস্বার্থের এই তত্ত্বটিকে তথ্য ও যুক্তির জোরেই মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় আর থাকে না।

কিন্তু আজকের ভাবনা, দেশের অগণিত দরিদ্র, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্যদের নিয়েই। ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকুন তাঁরাই। তাঁরা সুদীর্ঘকাল বঞ্চিত, অচরিতার্থ। কখনও রাজা ও শাসকেরা তাঁদের বিদ্যানুশীলনে বিচলিত হয়ে তাঁদের মস্তক ছেদন করেছেন, কখনও শাসকগোষ্ঠীর বেতনভুক গুরুমশাইরা তাঁদের বিদ্যা আহরণের নৈপুণ্যে চমৎকৃত ও সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁদের সরল ভক্তির সুযোগে তাঁদের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠটি ছিন্ন করতে বাধ্য করেছেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ, শক্তিশালী, কল্পনাশীল কর্মযোগী হলেও শিক্ষার হাতিয়ার না-থাকায় এঁরা নিষ্ফলতায় চিরজর্জরিত। আজ একলব্যদের অক্ষত হাতে আধুনিক

যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটিকে যদি তুলে দেওয়া যায়, তাঁরা সেই নতুন ভারতবর্ষ সৃষ্টি করবেন, যার স্বপ্ন দেখেছিলেন বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ।

তথাকথিত উচ্চবর্ণ ও অন্ত্যজ অস্পৃশ্য শ্রেণী—উভয় পক্ষের শ্রেণীচরিত্র বিবেকানন্দ চমকপ্রদভাবে নির্ণয় করেছিলেন এবং নতুন ভারত তথা ভবিষ্যতের ভারত কোন শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি করবেন, সে-সম্পর্কে তাঁর সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত বজ্রবৎ কণ্ঠে ও ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন—"আর্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর, আর যতই কেন তোমরা 'ডমমম' বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বছরের মমি ! যাদের 'চলমান শ্মশান' বলে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর 'চলমান শ্মশান' হচ্ছ তোমরা!···হুঁ, তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বকালের অনেকগুলি রত্নপেটিকা রক্ষিত আছে। এতদিন দেবার সুবিধা হয়নি। এখন ইংরেজ রাজ্যে—অবাধ বিদ্যাচর্চার দিনে [প্রাচীন কালের তুলনায় অবাধ বটে, বিদ্যাচর্চা করলে অঙ্গুষ্ঠ বা মস্তক ছেদনের আশঙ্কা অন্তত বিবেকানন্দর সমকালে ইংরেজ রাজত্বে আর ছিল না!—লেখক] উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। [ইংরেজ রাজত্বেও উচ্চবর্ণের প্রতি বিবেকানন্দের এই আহ্বানে সাড়া জাগেনি!—লেখক]। তোমরা শূন্যে বিলীন হও। আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালো মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে! বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ-জঙ্গল পাহাড়-পর্বত থেকে।··· এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মাণিক্যের আংটি, [বিবেকানন্দ এখানে শিক্ষা তথা জ্ঞানভাণ্ডারের কথা বলেছেন।—লেখক] ফেলে দাও এদের মধ্যে। যত শীঘ্র পার ফেলে দাও ; আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও।"

রবীন্দ্রনাথও কল্পনার বিহ্বল কবিত্বলোক থেকে কর্মচঞ্চল তীরে 'এবার ফিরাও মোরে' এই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায় 'মূঢ় ম্লান মূক' মুখগুলিতে প্রতিবাদের-প্রতিরোধের-সংগ্রামের ভাষা দিতে চাইলেন—সর্বপ্রকার অন্যায়-অবিচার-লাঞ্ছনা-বঞ্চনার বিরুদ্ধে অগণ্য অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য-ম্লেচ্ছ মানবশ্রেণীকে তিনি জাগ্রত-উদ্‌বুদ্ধ করতে চাইলেন, তাঁদের আশা-ভরসা দিতে হবে, কিন্তু সর্বাগ্রে চাই ভাষা আর সে-ভাষা সর্বাগ্রগণ্য তথা একমাত্র মাতৃভাষা—কারণ এই ভাষাই চেতনা সঞ্চার

করবে, প্রতিবাদে মুখর, প্রতিরোধে কঠিন এবং সংগ্রামে দুর্বার করবে—

'…এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে ;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে
পথকুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।'

১৯০১ থেকে বেশ কয়েক বৎসর জুড়ে সমকালের পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিষয়ক বিতর্ক-আন্দোলন প্রসঙ্গে মাতৃভাষার সর্বাগ্রগণ্য উজ্জীবনী সামর্থ্য নিয়ে এরকম বহু সহস্র পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট ও লেখক-বুদ্ধিজীবীকে লিখতে হয়েছে। মৌখিক উচ্চারণেও হাজার হাজার বাক্যের ব্যবহারও সে-সময়ে আমাদের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। সেই সূত্রেই ব্যবহার করতে হয়েছিল একলব্যের গুরুদক্ষিণা ও শাস্ত্রপাঠের অপরাধে শূদ্রের মস্তক-ছেদনের আখ্যান-প্রসঙ্গ।

লক্ষণীয় "বাংলা ভাষায় 'দলিত' সাহিত্য"-এর সংজ্ঞা, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য এবং সর্বোপরি উৎস-নির্ণয় প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক যে-আগ্রহ ও উৎসাহ, সেক্ষেত্রে 'বাংলা দলিত সাহিত্য'-এর প্রবক্তারা সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোনো কোনো বিষয়ে সূক্ষ্ম ও গভীর মতানৈক্যে বিচ্ছিন্নও বটে। একলব্যের আখ্যানটি প্রায় সকলেই তাঁরা ব্যবহার করছেন, এক্ষেত্রেও তাঁদের ভাষ্য বিভিন্ন। তবে একটি বিষয়ে তাঁরা নীরব। রামায়ণ ও মহাভারতও শিষ্ট ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং রচয়িতাদ্বয়ের পরিচয়ও নয় স্পষ্ট। সম্ভবত তাঁরা 'দলিত' নন। তবু তাঁদের রচনায় দলিত মানুষের মর্মবেদনা, যেভাবেই হোক, আত্মপ্রকাশ কিন্তু করেছে।

হতেই পারে যে, প্রাগুক্ত আখ্যানদুটি পরবর্তী প্রক্ষেপ। কিন্তু তাতে কী? সেগুলি তো মূল রচনারই সঙ্গে আজ ওতপ্রোত।

তবু, যতক্ষণ না প্রমাণিত হচ্ছে যে, ব্যাস-বাল্মীকি জন্মসূত্রে দলিত ততক্ষণ পর্যন্ত বাংলা দলিত সাহিত্যের প্রবক্তারা কিছুতেই স্বীকার করবেন না যে, রামায়ণ ও মহাভারতকার মহাকবি হিসেবেও দলিত মানুষের মর্মবেদনার অংশীদার হতে পারেন। যদিও মহাভারতকার শান্তিপর্বে ভীষ্মের সংলাপ

হিসেবে উচ্চারণ করেছিলেন দেবতার চেয়েও মানুষ বড়ো—

'ন মানুষাচ্ছ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ।'

ভারতবর্ষের যাবতীয় লোকধর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণে যিনি যাবতীয় কেতাবি বিদ্যার পাশাপাশি ব্যাপক ক্ষেত্রানুসন্ধানেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন সেই বিশ্রুত আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় ভীষ্মের এই উচ্চারণ-তাৎপর্যকেই খুঁজে পেয়েছিলেন চণ্ডীদাসের বহুশ্রুত ছত্রটিতে, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'।

বাংলা দলিত সাহিত্যের প্রবক্তাদের মধ্যে একজন বলেছেন :

'···বাংলা সাহিত্যের অনুপুঙ্খ ইতিবৃত্ত সামনে রেখে বোধকরি চর্যাপদের কালকে দলিত কবিতার সূচনাকাল বলা যায়। কারণ চর্যাপদের অনেক কবি অস্পৃশ্য সমাজের ছিলেন। তাঁদের কবিতায় দলিত মানুষের জীবনধারা উল্লেখ্য হয়ে স্থান পেয়েছে। ধরুন শবরীপাদের কথা।···কবি নিজে শবর ছিলেন, তাই শবরকন্যার কথা এত প্রাণবন্ত। দলিত কবিতার মূল স্ট্রাকচার বা কাঠামো অনুসারে এটা কি দলিত কবিতা নয়? নিশ্চয়ই এটা দলিত কবিতা।'

কিন্তু লেখক শবরীপাদের সমকালে 'জাতপাত ভাঙার আন্দোলন' অনুভব করেননি বলে সিদ্ধান্ত করেছেন :

'প্রকৃত অর্থে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে দলিত কবিতা আন্দোলন শুরু হয়েছে অতি সাম্প্রতিক কালে। আটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। সেদিক থেকে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য দলিত কবিতা আন্দোলনের বয়স এক দশকের বেশি নয়। এই যে দলিত কবিতা আন্দোলনের কথা বলছি এটা দলিত কবিতার সচেতন আন্দোলন। 'সচেতন' মানে, দলিত মানুষের মধ্যে থেকে যাঁরা তাঁদের নিজস্ব জীবন-বোধ নিয়ে, নিজস্ব আইডেনটিটির খোঁজ তালাশ নিয়ে সাহিত্যে এসেছেন তাঁরা সচেতনভাবেই এসেছেন।'

এখানেই একটি কথা বলে রাখি, শবরীপাদ যে শবরই ছিলেন, তার সপক্ষে যেমন ভাবা যায়, তেমনি আবার চর্যাপদের কবিদের আপাত-নাম থেকেই তাঁদের জাতি-গোত্র প্রভৃতি তথা জন্ম-উৎস সম্পর্কে চূড়ান্ত কোনো নির্ণয় অনায়াসসাধ্য নয়। কেননা, চর্যাগানের ভাষায় যেমন রূপক-সংকেত, তেমনি কবিদের নামেও তা থাকতেই পারে।

তাছাড়া, যুক্তির খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় শবরীপাদ শবর ছিলেন বলেই শবরকন্যার কথা সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তাহলে বিরুদ্ধ এই

প্রশ্নটিও কেউ তুলতে পারেন যে, রবীন্দ্রনাথের কলমে তাহলে 'কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ'-এর বর্ণনা কীভাবে সুন্দর বা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে?—এরকম দেশবিদেশের নানা ভাষার কবিতা অবলম্বনে অগণিত নির্দশন খাড়া করা যায়।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের অন্যতম অগ্রণী কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর কলমে ফুল্লরা-কালকেতুর ব্যাধজীবনের চিত্র এমন সজীব ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে কীভাবে?

চণ্ডীদাসই বা কীভাবে এমন স্বতঃস্ফূর্ততায় লিখতে পারেন :

'শুন রজকিনী রামী।
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি ॥'

বাংলা দলিত সাহিত্যের কোনো কোনো প্রবক্তা এহেন সিদ্ধান্তও করেন :

"···দলিতদের কথা বলতে চাইছেন প্রচুর অদলিত সাহিত্যিক। বাঘ কখনো হরিণের মতো জেব্রার মতো ভাবে একথা বিশ্বাসযোগ্য কি? এদেশে দলিতদের নিয়ে অদলিত সাহিত্যিকদের দরদী-লেখালেখিব ব্যাখ্যায় আমরা খুঁজে পাই মার্কিনী কৃষ্ণ সাহিত্যিক নিকি জোভান্নির মন্তব্য :

'কোনো সাদা মানুষই আমার বিষয়ে সত্যি কথা লিখতে পারে না'।"

লেখক এখানেই থামেননি। তিনি মুন্সী প্রেমচন্দের গল্প প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন:

"এই যে এখন মুন্সী প্রেমচাঁদেব গল্প নিয়ে বিতর্ক ঘনিয়ে উঠেছে তার কারণ তো ঐ—ওঁরা আমাদের ভুলভাবে এঁকেছেন—'বিকৃতির মধ্যে বিকৃত করে এঁকেছেন'।"

'বিকৃতির মধ্যে বিকৃত করে এঁকেছেন'—মুন্সী প্রেমচন্দের গল্পগুলি নিয়ে এ-হেন মন্তব্য জীবনবোধ ও সাহিত্যবোধের নিদর্শন নয়। বস্তুত, প্রেমচন্দের রসোত্তীর্ণ গল্পগুলি অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেই সেগুলির মূল্যায়ন সম্ভব, না-হলে এই সব মন্তব্য থেকে উত্তেজনা ও ক্রোধ যে পরিমাণে বেরিয়ে আসছে, সাহিত্যবোধ ততটাই অনুপস্থিত থাকছে। দলিত সাহিত্যের গুরুত্ব অনুধাবনে এই ধরনের দায়িত্বহীন ফতোয়া সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

বাংলা দলিত সাহিত্যের এই ধরনের প্রবক্তারা একই নিঃশ্বাসে বলছেন, অদলিত সাহিত্যিকের পক্ষে দলিতদের কথা বলা অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব, আবার 'বাংলার নানা খানে ছড়িয়ে থাকা দলিত সমাজের মানুষ যা লিখেছেন, তাই'ই দলিত কবিতা নয়, তা যদি হতো তাহলে দলিত কবিতার পত্তন হয়েছে ততদিন, যতদিন বাংলা সাহিত্য শুরু হয়েছে, অর্থাৎ চর্যাপদের শুরু থেকেই দলিত

কবিতার শুরু বলতে পারতাম।'

তিনি স্বীকার করেন, 'দলিত-অবজ্ঞাত-অবহেলিত-অস্পৃশ্য-সমাজবহির্গত মানুষের কথা পাই চর্যায়, পাই মঙ্গলকাব্যে, পাই বাউল-মুর্শেদ-সাহেবধনী-বলাহাড়িদের গানে। কিন্তু দলিত কবিতা শুধু দলিতের কবিতাই নয়—দলিত-বিষয়ক কবিতাও নয় শুধু, দলিতকরণ প্রক্রিয়ার বিপক্ষে দলিতের পক্ষ থেকে জীবনাদর্শগত সংগ্রামী প্রত্যয়ের বিস্ফোরণ এখানে।' যদিও তিনি সরহ্-লিখিত ব্রাহ্মণবিরোধী কয়েকটি ছত্রকে দলিত কবিতার আদ্য সূত্রানুসারী বলে মনে করেন, 'দলিতচেতনা কিছু খুঁজে পান চর্যাগীতির কবিদের রচনায়', তবু তাঁর সিদ্ধান্ত 'দলিত কবিতার সূচনা হিসেবে এই সময়গুলিকে আমি চিহ্নিত করার পক্ষপাতী নই'।

'আমি'-টাই এখানে বড়ো। সাহিত্যরুচি, সাহিত্যবোধ, জীবনবোধ, সাহিত্য-বুদ্ধি—এগুলির চেয়েও বড়ো হয়ে উঠছে 'আমি'। বাংলার দলিত সাহিত্য সংস্থার সভাপতি যখন এসব কথা বলেন, তখন একই সংস্থার যুগ্ম-সম্পাদক জানাচ্ছেন :

'নিম্নবর্গের মানুষের সাহিত্যপ্রয়াস আজও আছে, অতীতেও ছিল। অন্যান্য ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এই প্রয়াস সুপ্রাচীন। বলা যায় চর্যাপদের কাল থেকে। চর্যাপদের পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে নিম্নবর্গের মানুষের অনুপস্থিতি আমাদের পীড়ার কারণ—নতুন করে কিছু ভাবতে শেখায়। সেই ভাবনার ছায়াতলে গড়ে ওঠে দলিত সাহিত্যের আন্দোলন।'

চর্যাপদের পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে 'নিম্নবর্গের মানুষের অনুপস্থিতি' দেখেছেন যুগ্ম-সম্পাদক। কিন্তু সভাপতি অন্তত স্বীকার করেছেন, 'দলিত-অবজ্ঞাত-অবহেলিত-অস্পৃশ্য-সমাজবহির্গত মানুষের কথা পাই চর্যায়, পাই—মঙ্গলকাব্যে, বাউল-মুর্শেদ-সাহেবধনী-বলাহাড়িদের গানে'।

যুগ্ম-সম্পাদক 'আটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে, বাংলা ভাষা-সাহিত্যে দলিত কবিতার আন্দোলনের সূত্রপাত লক্ষ করেছেন। আগস্ট ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত তাঁদের সংস্থার 'চতুর্থ দুনিয়া' ত্রৈমাসিক পত্রিকায় তিনি স্পষ্টত জানিয়েছেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দলিত কবিতা তথা সাহিত্যের 'আন্দোলনের বয়স এক দশকের বেশি নয়'। এই আন্দোলন সভাপতি ও যুগ্ম-সম্পাদক দুজনেরই ভাষায় 'সচেতন আন্দোলন'। যুগ্ম-সম্পাদক প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে 'চতুর্থ দুনিয়া'-র একই সংখ্যায় 'দলিত সাহিত্যের নিজস্ব নন্দনতত্ত্ব'

বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে প্রেমচন্দের 'কাফন' গল্পটিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করেছেন। দলিত সাহিত্যের আলোচনাকারী ওমপ্রকাশ বাল্মীকির মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। ওমপ্রকাশ বাল্মীকি মন্তব্য করেছেন, 'কাফন গল্পটি নাকি দলিত নন্দনতত্ত্ব বিরোধী'। তাঁর মতে, 'দলিতেরা না খেয়ে মরতে পারে, সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু মৃত্যুর স্ত্রীর কাফন কেনার পয়সা দিয়ে হাড়িয়া খাওয়ার মতো অমানবিক নন। তাঁদের জীবনের মূল্যবোধের আসল জায়গাটা মুন্সী প্রেমচাঁদ স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয়েছেন'। ওমপ্রকাশজি আরও বলেছেন, 'কুঁড়েমিকে ঘিসু ও মাধবের জীবনের দারিদ্র্যের কারণ বলে চিহ্নিত করে মুন্সীজি আরো একটা অবিচার করেছেন।'

দলিত সাহিত্যের নিজস্ব নন্দনতত্ত্বটি তাহলে কী? যুগ্ম-সম্পাদক বলেছেন, 'নিজের এই দুর্গতি অবস্থানের মধ্যের সুন্দরতাই এই সাহিত্যের নান্দনিকতা। বাইরে থেকে দেখার সঙ্গে আছে এর বড়ো পার্থক্য'।

এই প্রসঙ্গে 'কাফন' গল্পের ওমপ্রকাশজি-কৃত বিশ্লেষণ উদ্ধৃত করেছেন তিনি।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে, দলিত ছাড়া দলিত সাহিত্য সৃষ্টির যোগ্যতা আর কারও থাকতেই পারে না।

বাংলা দলিত সাহিত্যের প্রবক্তাদের অর্থাৎ বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থার সভাপতি ও যুগ্ম-সম্পাদকের দুজনের সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত স্ব-বিরোধকে স্বীকার করেও এই রকমই দাঁড়াচ্ছে যে, দলিতরাই দলিত সাহিত্য সৃষ্টি করবেন।

কিন্তু 'চতুর্থ দুনিয়া'র পঞ্চম সংকলনে (ডিসেম্বর ১৯৯৬) ড. অরবিন্দ মালাগাট্টি কানাড়ি দলিত সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন :

'কন্নড় ভাষায় দলিত-এর সংজ্ঞা আছে।

'সেই সংজ্ঞাটা এই প্রকার : হাজার হাজার বছর ধরে আর্থিকভাবে, সামাজিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে শোষিত যারা, যারা বাস করতে সক্ষম হয়নি সাধারণ নিয়মে সবর্ণ মানুষের মধ্যে বা হীন পেশাকে আশ্রয় করে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে দূর প্রান্তিক সীমানায়—যারা এতকাল ছিল সংকোচপরায়ণ যে, নিজের নামটা পর্যন্ত সজোরে জানান দিতে পারেনি—এতদিন যারা ছিল অস্পৃশ্য বা বহিষ্কৃত, আজ তাদেরই বলা হয় দলিত।'

এই প্রসঙ্গে যদি আমাদের রবীন্দ্রনাথের 'দুর্ভাগা দেশ' কবিতাটি মনে পড়ে যায় এবং স্মৃতি না-হাতড়ে কেউ যদি কবিতাটিতে আরও একবার দৃষ্টিসংযোগ করেন তাহলেও কি 'দলিত'-এর সংজ্ঞা কিছু ভিন্নতর হয়ে দাঁড়াবে? দলিত না-হয়েও রবীন্দ্রনাথ কি 'দুর্ভাগা দেশ' কবিতাটিতে 'দলিত'-এর সংজ্ঞার্থ নিরূপণে

খুব কিছু ভুল করে ফেলেছেন? 'দুর্ভাগা দেশ' কবিতাটিকে 'দলিত সাহিত্য'-এর প্রবক্তারা কি 'দলিত কবিতা'-রূপে মেনে নিতে নারাজ হবেন?

ড. মালাগাট্টি তো দ্বিধাহীনভাবেই লিখেছেন :

'কন্নড় ভাষায় দলিত সাহিত্যের ধারণা পরিষ্কার। এ সেই সাহিত্য, যার আছে নিজস্ব আইডেনটিটি। দলিতরা দলিত সাহিত্য লিখেছেন—এটা স্বাভাবিক। অদলিতেরা দলিত সাহিত্য লিখছেন কখনো কখনো। কিন্তু তাঁদের থাকতে হয় সঠিক দলিত কনশাসনেস।'

আবার একই লেখক জানিয়েছেন, দলিত মানুষকে বুঝতে গেলে মনে রাখতে হবে 'মানুষই মূল কথা।···দলিত ও অদলিতের সহাবস্থান আছে—সমানাবস্থান নেই। সহানুভূতি দলিতের চাই না—সমানানুভূতি কাম্য।···নাম তার দলিত সাহিত্য—চেতনায় প্রতিবাদী।···জাতব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—প্রতিবাদ ধনবৈষম্যের বিরুদ্ধে—দলিত আর প্রতিবাদী লেখকেরা মূলত একসুরে গান গাইলেন'।

প্রসঙ্গত প্রেমচন্দের 'কাফন' গল্পটির যে-বিশ্লেষণ ওমপ্রকাশ-বাল্মীকি করেছেন, তার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু, এই প্রশ্ন যে-কোনো পাঠকের মনে জাগতেই পারে। বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থার যুগ্ম-সম্পাদক তাঁর প্রশ্নোত্তর-মূলক রচনাটিতে লিখেছেন—'দলিত কবিতা রচনার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু বড়ো, প্রকাশভঙ্গি বা প্রকাশের শৈল্পিকতা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। দলিত সমস্যার বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে অসাম্য, অবিচারের মতো রূঢ় প্রেক্ষাপট। ভাষার শৈল্পিকতা বা চারুতা প্রবল হলে বিষয়বস্তু তার নিত্যকালের সত্য প্রেক্ষাপট হারাতে বসে। এবং অন্তস্থলের বাস্তবতার প্রাখর্য মন্দগতি প্রাপ্ত হয়। ভাষার কারুকার্য দিয়ে বিষয়কে ম্লান করা দলিত সাহিত্যের ধর্মবিরোধী।' আমরা 'ফর্মালিস্ট' নই, তবু সাহিত্যের এ-হেন মনগড়া অসাহিত্যিক ভাষ্য অশ্রদ্ধেয় বলে মনে করি এবং এর ফলে বাংলায় দলিত সাহিত্য-এর তথাকথিত প্রবক্তারা প্রথম থেকেই 'দলিত সাহিত্য'কে মাঝারিয়ানায় পর্যবসিত করে দিচ্ছেন।

এই সূত্রেই স্মরণ করি 'দলিত সাহিত্যের সামাজিক জাগরণ' নিবন্ধে ড. কমলাকর গঙ্গাবানে দলিত সাহিত্য সম্পর্কে যে পনেরোটি সূত্র নির্ণয় করেছেন তার একটিতে আছে—'দলিত সাহিত্যের ঝোঁক লক্ষ করা যায় তার অভ্যন্তরীণ দুঃখবাদী উপাদান ও হীনম্মন্যতায়।'

দলিত সাহিত্যের নন্দনতত্ত্বের সারকথা যদি এই হয় যে, দুর্গত জীবনের অন্তর্নিহিত সুন্দরতাই সব, তাহলে কি তা বাস্তবসম্মত হবে? প্রেমচন্দের

'কাফন' গল্পটির বিশ্লেষণে ওমপ্রকাশজির এই মনগড়া তত্ত্ব নিতান্ত একদেশ-দর্শী। দলিত মানুষের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিয়ে যদি রসোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টিই কোনো লেখকের কাম্য হয়, তিনি কি দুর্গত জীবনের শোচনীয় বাস্তবতাকে, এককথায় সমাজবাস্তবতার দিকটিকে এড়িয়ে যেতে পারেন? এড়িয়ে যাওয়া উচিত? 'সুন্দর' আরাধ্য হতে পারে কিন্তু 'অসুন্দর'-এর অস্তিত্ব অস্বীকার করে কী লাভ ? সংগ্রাম তো তারই বিরুদ্ধে। সেই অসুন্দরের উৎস ও স্বরূপ তো চিনে নিতেই হবে।

তা না-হলে তো ডেসডিমোনার মতো চরিত্রই আঁকতে হবে। কিন্তু ওথেলোও তো বাস্তব, ইয়াগোও তা-ই। পরিণত বয়সের নান্দনিক ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের কাছে যেমন ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রটির সৃষ্টি-সৌন্দর্যও স্বীকৃতি পেতে পেরেছিল।

প্রেমচন্দ ঘিসু আর মাধবের জীবনের যে-ছবি এঁকেছেন, ঘরের বউ বুধিয়ার মৃত্যুতে তার 'কাফন' কেনার জন্য বাপ-বেটা যে ভিক্ষালব্ধ অর্থ সংগ্রহ করে, তাই দিয়ে যখন উদরভরে আহার্য গ্রহণ করে, প্রাণভরে হাড়িয়া সেবন করে, তখন কি প্রেমচন্দ দলিত মানুষের কুৎসা করেন? গল্পটির বোদ্ধা পাঠক কি তখন ঘিসু আর মাধবকে ঘৃণা করতে থাকে, নাকি ঠিক তার বিপরীতটাই ঘটে? ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, দারিদ্র্যবিড়ম্বিত জীবন, শিক্ষা ও চেতনার আলোকবঞ্চিত জীবন—সে তো এই বৈষম্যলাঞ্ছিত আর্থ-সামাজিক পরিবেশে স্থূল জৈব দাবিগুলির আনুষ্ঠানিক পূর্তিতেই প্রমত্ত হয়ে উঠতে বাধ্য। ঘিসু ও মাধবের জীবন থেকে মানবিক মূল্যবোধ কেন হারিয়ে গেল? তার জন্য দায়ি কি তারাই? তাদের আলস্য ও অপদার্থতার জন্য দায়ি শোষণমূলক যে সমাজব্যবস্থা সেটাই এই গল্পে প্রেমচন্দের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। যে-সমাজব্যবস্থা মানুষকে পশুর পর্যায়ে পর্যবসিত করে সেই সমাজব্যবস্থাটাকে আমূল বদলে ফেলাই যেন সকলের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এই গল্পে প্রেমচন্দের সেই মৌলিক আহ্বান ওমপ্রকাশজিকে কেন স্পন্দিত করে না? সাহিত্যবিশ্লেষণে কেন হীনম্মন্যতা বোধ সমালোচককে পেয়ে বসে? এই হীনম্মন্যতা শব্দটির ব্যবহার পাই, একটু আগেই উদ্ধৃত করেছি, ড. গঙ্গাবানের নির্ণীত ১৪-সংখ্যক সূত্রটিতে।

বাংলা দলিত সাহিত্যের অন্যতম প্রবক্তা যখন লেখেন, 'দলিত কবিতার (তথা সাহিত্যের) সূচনা যে আশির দশকে তার অন্য কারণও আছে। এই দশক, যা কিনা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের সৌধ ও প্রাচীরগুলিকে ভেঙে যেতে দেখেছে, ধাতু কারখানায় গলতে দেখেছে লেনিনের মূর্তি। বাংলাতেও

(অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গেও!) সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ঠাণ্ডা ঘরে নির্বিকল্প সমাধিস্থ। আর এই দশকে বাংলা কবিতায় পশ্চিমি হাওয়া আর তেজী নেই, ইয়োরোপ থেকে ধার করা আন্দোলনের শ্লোগানসমূহ হারিয়েছে যাবতীয় তাৎপর্য। পাঠকসমাজ কার্যত বর্জন করেছে কবিতাকে।—দলিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অগ্রসর অংশ আজ নতুন পথের সন্ধানী, অন্যের কাটা পথে নয়, দলিত কবিতা ঘরে ফেরার ডাক শোনাতে চায়—সন্ধান করে নতুন সমাজের নীল নক্‌শা।…' তখন পাঠক বিচলিত হয়ে উঠতে বাধ্য, লেখকের রাজনৈতিক চেতনার ধোঁয়াশা প্রসঙ্গে। ড. গঙ্গাবানে সহ দলিত সাহিত্যের সর্বভারতীয় প্রবক্তারা যখন ঘোষণাবাক্যের মতো উচ্চারণ করেন, 'দলিত সাহিত্য সাম্যবাদী মতাদর্শ ও মানবতাবাদী চিন্তার প্রসার ঘটায়' তখন বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থার সভাপতি মহাশয়ের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপরি-উদ্ধৃত বিশ্লেষণ পাঠককে বিস্মিত ও বিভ্রান্ত করে। তিনিও দাবি করেন, 'আমরা প্রগতিবাদী। তবে বাংলার (ভারতের) ছদ্ম-প্রগতিবাদী সংস্কৃতি আন্দোলন বিষয়ে আমাদের কিছু প্রশ্ন আছে। আছে সন্দেহ। ও হচ্ছে একপেশে প্রগতিচেতনা। দলিতরাই যে শোষিত এটা তো ঠিক।'— তখন পাঠকের সন্দেহ প্রায় এই বিশ্বাসে পরিণত হতে চায় যে, দলিত সাহিত্যের এই প্রবক্তা শোষিত জনগণের চেহারা ও চরিত্রের সঠিক ঠিকানাটা জানেন না। তাঁর প্রগতিচেতনা শুধু দলিতকেই কেন্দ্র করে, আর্থ-সামাজিক মানদণ্ডে তিনি শোষণব্যবস্থার ব্যাখ্যায় শুধু অপারগ নন, নিতান্ত নারাজ ; ধর্মীয় মানদণ্ডগুলি নিয়েই তিনি ব্যাপৃত। আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থাকে তিনি উপেক্ষা করেন। অথচ তিনিই প্রগতিবাদীদের তিরস্কৃত করছেন 'একচক্ষু হরিণ' সম্ভাষণে। 'দলিতরাই যে শোষিত' বাস্তবের এই অংশটিকেই তিনি দেখছেন। শোষিত জনগণের অন্যান্য অংশগুলিতে তাঁর দৃষ্টি পড়ছে না। তাঁর কথা তাঁকেই ফিরিয়ে দেওয়া যায়—'অর্ধসত্য তো মিথ্যার চেয়েও ক্ষতিকর'!

একটি বিষয় খুবই স্পষ্ট। তা হল : বাংলা দলিত সাহিত্যের প্রবক্তাদের একাংশ 'সাম্যবাদী'ও 'মানবতাবাদী'—এই দুটি শব্দকেই আভিধানিক—অ্যাকাডেমিক অর্থেই মান্য করেন কিন্তু এই প্রসঙ্গে ভুলেও কখনও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুধাবন করেন না। বস্তুত জন্মসূত্রে 'দলিতমাত্রকে'ই ওঁরা 'শোষিত' বলে মনে করেন, কিন্তু 'শোষিত' মানবসমাজের সর্বাংশে ওঁদের দৃষ্টি পড়তে চায় না।

বস্তুত 'জন্মসূত্র'-এ 'দলিত' হলেও বাংলা দলিত সাহিত্যের প্রবক্তাদের

একাংশ আত্মকেন্দ্রিক 'ব্রাহ্মণ্যবাদী'দের মতোই অহং-সর্বস্ব এমন-কিছু 'তত্ত্ব' খাড়া করে আসর জমাতে ব্যস্ত যে, ড. বাবাসাহেব আম্বেদকরের ভাষায় তাঁদের নিছক 'Careerists' বলতে হয়।

স্ব-ঘোষিত 'সাম্যবাদী' হলেও এই ধরনের দলিতবাদী বুদ্ধিজীবী যেমন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেন, তেমনি আরও একটি লক্ষণীয় দিক হল—তাঁরাও তাঁদের 'চেতনার সঙ্গে আফ্রিকা ও আমেরিকার সাহিত্য-আন্দোলনগুলির সম্পর্ক রচনা'র বিষয়টিকে 'কোনো কষ্ট কল্পনা' রূপে মনে করেন না এবং 'মূলত নিজেদের আফ্রিকা ও আমেরিকার কৃষ্ণ সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত' মনে করেন। এ কথাও অবশ্য ঠিক যে, দলিত মানুষ, পৃথিবীর যেখানেই যিনি থাকুন-না-কেন, পরস্পরের আত্মীয়রূপেই নিজেদের ভাববেন। বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার—'দুনিয়ার মজদুর এক হও'। সেই আহ্বান সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের প্রতি, শ্রমিকশ্রেণী তথা সর্বহারার প্রতি। আর সর্বহারার কোনো বিশেষ দেশ বা জাতি নেই। তাই তাদের পারস্পরিক একাত্মতা নিতান্ত প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক।

কিন্তু 'বাংলা দলিত সাহিত্য'এর এক শ্রেণীর প্রবক্তা মনে করেন, দলিত-মাত্রেই শোষিত তবে শোষিতমাত্রেই দলিত নন। এখানেই প্রশ্ন ওঠে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে নতুন একটি শ্রেণীভেদ সৃষ্টির কোনো অপরিহার্যতা কি সত্যিই আছে? যদি থাকে, তার যুক্তি কী?

'বাংলা দলিত সাহিত্য' নিয়ে যাঁরা সম্প্রতি (বিষয়টিই সাম্প্রতিক) সংস্থা গড়েছেন, ভাবছেন, লিখছেন, তাঁরা অর্জুন দাংলে সম্পাদিত 'পয়জনড ব্রেড' সংকলনটির দ্বারা কমবেশি নিজেদের সমৃদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছেন স্বভাবতই। সংকলনটিতে দাংলে, বাগুল ও ওয়াগমারের রচনায় 'দলিত সাহিত্য'-এর গতিপ্রকৃতি ও স্বরূপবৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা আছে। আছে আম্বেদকরের ১৯২৭ সালের উজ্জীবনী ভাষণ। চাভাদার হ্রদের জল শুধুই ব্রাহ্মণদের জন্য সংরক্ষিত ছিল, নিষিদ্ধ ছিল অস্পৃশ্যদের স্পর্শ। এই ব্যভিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন আম্বেদকর—'চাভাদার লেকের জল খেলেই আমরা অমর হয়ে যাব না। আমরা এই জল না খেয়েই খুব ভালভাবে বেঁচে থাকতে পারব। আমরা লেকের জল পান করার জন্য সেখানে যাচ্ছি না। আমরা সেখানে যাচ্ছি এটাই প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে, আমরা অন্যদের মতোই মানুষ।'

দলিত সাহিত্যের উৎস সম্বন্ধে কেউ নির্দেশ করেছেন গৌতম বুদ্ধের কাল, কেউ মহাত্মা ফুলের সময়, কেউ-বা অধ্যাপক মা তের কালপর্বটিকে। কিন্তু অর্জুন দাংলে সহ সকলেই শেষপর্যন্ত দলিত সাহিত্যের মুখ্য প্রেরণারূপে নির্দেশ করেছেন ড. আম্বেদকরের নাম। আন্দোলনের প্রারম্ভ-রূপে চিহ্নিত করেছেন ১৯৫৮ সালের দলিত সাহিত্যের অধিবেশন-কালটিকে। বাবুরাও বাগুল, দয়া পাওয়ার, নামদেও ধাসাল, অর্জুন দাংলে প্রমুখ লেখকদের প্রচেষ্টায় দলিত সাহিত্যের ধারণা কায়া ধারণ করতে থাকে।

সৃষ্টিশীল লেখকদের নেতৃত্বে সংগঠিত ১৯৭২ সালের 'দলিত প্যান্থার'দের যে রাজনৈতিক সংগ্রাম, তার প্রণোদনায় দলিত সাহিত্য বস্তুত প্রতিবাদী সাহিত্যের চেহারা-চরিত্র পেতে থাকল। আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের লক্ষ্যেই এই প্রতিবাদী সাহিত্য নিবেদিত হতে চাইল। যাঁরা অস্পৃশ্য, যাঁরা অবদমিত, বঞ্চনা ও অবমাননার বিরুদ্ধে তাঁদের বিদ্রোহ ঘোষণার পাশাপাশি মুক্তির জন্য তাঁদের নিরন্তর ব্যাকুলতার প্রকাশ হয়ে উঠল এই সাহিত্যের দ্বৈত লক্ষ্য। দলিত সাহিত্যের সূত্রে মার্কিনি কৃষ্ণ সাহিত্যের প্রসঙ্গ অনেকেই তুলে থাকেন। এইচ. বি. স্টো (১৮১১-১৮৯৬)-এর লেখা নিগ্রো-দাসদের পশুবৎ শোচনীয় জীবনের আখ্যান ১৮৫১-৫২ সালে 'ন্যাশনাল এরা' নামের পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয়, 'আঙ্কল টমস কেবিন' নামের এই আখ্যানটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে এক বৎসরের মধ্যে তিন লক্ষের বেশি কপি বিক্রি হয়ে যায়।

অর্জুন দাংলে যখন এই দলিত সাহিত্যের সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শন ও মার্কসীয় দর্শনের সাযুজ্য-সূত্রের উল্লেখ করেন, তখন তা গভীর মনঃসংযোগ দাবি করে। লাঞ্ছনা, অত্যাচার ও আত্মিক অবমাননার (তুলনীয়, 'ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে'—'দুর্ভাগা দেশ', রবীন্দ্রনাথ) বিরুদ্ধে শোষিত জনসাধারণের বিদ্রোহের সূত্রে কোনো-না-কোনো অর্থে বৌদ্ধ দর্শনের কথা যেমন, ঠিক তেমনই অবশ্যই মার্কসীয় দর্শনের কথাও মনে পড়তে বাধ্য। বাবু রাও বাগুল 'দলিত' শব্দটির সংজ্ঞার্থ নির্ণয়কালে বলেছেন, 'দলিত একটি পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের নাম' ('Dalit is the name for total revolution')।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর জীবনসত্যের সন্ধান-সাধনার স্তরগুলি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন, বৌদ্ধ দর্শনই তাঁকে ক্রমশ মার্কসবাদের দ্বার-প্রান্তে উপনীত করেছিল। ড. আম্বেদকরের সত্যানুসন্ধানের যাত্রাগতিপথটিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনিও বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামের সূত্রে একটি

পর্যায়ে বুদ্ধদেব ও তাঁর দর্শনকে গ্রহণ করেন। খুবই লক্ষণীয় বলে আমার মনে হয়, বৌদ্ধদর্শনে উপনীত হয়েই তাঁরও সন্ধান সমাপ্ত হল না। তিনি কবীরকেও আত্মস্থ করতে চাইলেন। কিন্তু এই দুই 'গুরু'র পরেও তাঁর অপরিহার্য মনে হয়েছিল তৃতীয় এক গুরুকে। এই প্রসঙ্গে লতা মুরুগকারের শরণাপন্ন হতে পারি আমরা, যিনি জানিয়েছেন—'ভারতে ব্রিটিশ শাসনে এইসব সামাজিক দাসত্বের নাগপাশে বন্দি অস্পৃশ্যদের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন সূচিত হতে শুরু করেছিল। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগের মাধ্যমে এই অস্পৃশ্যদের মধ্যে নতুন ভাবনা, নতুন জীবন ও সংস্কৃতির স্পর্শ লাগল। বিশেষত মহারাষ্ট্রে জ্যোতিবা ফুলের সংগ্রাম এইসব শ্রেণীর মধ্যে এই অভিনব সাড়া ও আন্দোলনের মাত্রা যোগ করে দিল। দলিতদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে জাগরণের তিনি ছিলেন অগ্রপথিক। তিনি অস্পৃশ্যদের মধ্যে প্রতিবাদের ভাষা জাগিয়ে তোলেন। তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম হিন্দু যিনি ১৮৫১ সালে হিন্দু গোঁড়ামির পীঠস্থান পুনায় প্রথম অস্পৃশ্যদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মহাত্মা ফুলে ছিলেন শূদ্র, সম্প্রদায়ে মালি এবং পেশায় মারাঠি চাষি সমাজের লোক। তিনি প্রথম তাঁর বাড়ির সামনে সকলের জন্য মুক্ত পুষ্করিণী খনন করেন। ১৮৭৩ সালে গড়ে তোলেন সত্যশোধক সমাজ—যার লক্ষ্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও সংখ্যালঘু ধনীদের দাসত্ব থেকে অব্রাহ্মণদের মুক্ত করা। ব্রাহ্মণ সমাজের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে তিনি খোলাখুলি আক্রমণ হানলেন, দাবি করলেন নারী ও পুরুষের সমান অধিকার, উচ্চবর্গীয় সমাজব্যবস্থায় প্রকৃত সাম্যের জন্য তিনি আওয়াজ তুললেন, দাবি করলেন অন্ত্যজদের জন্য চাই শিক্ষা। মহাত্মা ফুলের শ্রেষ্ঠ অবদান—সাম্য ও সুবিচারের জন্য বিপ্লবী উত্থান।'

তাঁর এই তৃতীয় গুরু অর্থাৎ মহাত্মা ফুলে সাম্য ও সুবিচারের জন্য 'বিপ্লবী উত্থান'কেই অপরিহার্য বিবেচনা করায় গান্ধিজির সমাজসংস্কারমূলক আহ্বান কখনও ড. আম্বেদকরের কাছে গ্রহণীয় হয়নি। নিম্নবর্গের জন্য উচ্চবর্ণের করুণা বা সহানুভূতি বর্ষিত হলেই গান্ধিজির তৃপ্তি, হাজার বছরের জাতিগত অত্যাচার থেকে নিম্নবর্ণের মুক্তির দাবি তাঁর ছিল না। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু প্রথম থেকেই এবং উত্তরোত্তর (দ্রষ্টব্য, 'লোকহিত' প্রবন্ধ, কালান্তর) 'দয়া' নয় 'দায়' (এখনকার ভাষায় দায়বদ্ধতাই) বদ্ধতার উপরেই জোর দিচ্ছিলেন। এই সূত্রেই উল্লেখ্য, তরুণ বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ, বিশেষত শিক্ষাসম্পর্কিত তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের' রচনাকাল থেকেই পিছিয়ে-পড়া গ্রামীণ

মানুষের জন্য ব্যাপক জনশিক্ষার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। দেশবাসীর দারিদ্র্য, দুর্ভোগ, লাঞ্ছনা, আত্মিক অবমাননা প্রভৃতি নির্মূল করার প্রথম পদক্ষেপ হল, কী তাঁদের প্রাপ্য অথচ কেন তাঁরা বঞ্চিত—এগুলি বুঝে নেওয়ার জন্য যেমন ঠিক তেমনি তাঁদের দাবিগুলি আদায়ের জন্য সংঘবদ্ধ অভিযান চালনার জন্যও সর্বাগ্রে প্রয়োজন সচেতনতা আর সেই সচেতনতা সৃষ্টির জন্যই চাই শিক্ষা। 'লোকহিত' প্রবন্ধটির পাঠক জানবেন, জনচেতনা-সৃষ্টির কাজে রবীন্দ্রনাথ 'অধ্যাত্ম-শিক্ষা'কে সুস্পষ্ট ভাষায় বাতিল করলেন এখানে, লিখলেন, বঞ্চিত-লাঞ্ছিত জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ হতে হলে সেই প্রয়োজনীয় ঐক্য অধ্যাত্ম-যোগে আসবে না, তা-ই অধ্যাত্ম-যোগ চাই না, মানুষের সঙ্গে মানুষের লৌকিক-যোগটাই অপরিহার্য।

রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর জনশিক্ষা-বিষয়ক চিন্তাধারার আভাসমাত্র এখানে দিতে হল, কেননা, ড. আম্বেদকর স্বয়ং জনচেতনা সৃষ্টির কাজে, জনজাগরণের কাজে, অন্যায় ও ব্যভিচারের বিরুদ্ধে, সর্বপ্রকার শোষণ-দলনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সংঘবদ্ধ অভিযান চালনার লক্ষ্যে শিক্ষার প্রচার ও ব্যবহার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন সহযাত্রী অনুভব থেকে। শিক্ষার জন্যই শিক্ষা নয়, শিক্ষামোহ নয়, সংগত সামাজিক ও মানবিক দাবি পূরণের জন্য শিক্ষাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের কথা এ-দেশে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রায় সমকালেই বিবেকানন্দ, আর পরবর্তী পর্যায়ে ড. আম্বেদকরকে ভাবতে হয়েছিল।

এখানেই স্মরণ করব লতা মুরুগকারকে। উদ্ধৃত করব তাঁর কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য। দেখব, শুধু মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নই নন, কীভাবে বৌদ্ধদর্শন হয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিমুখে ক্রমশ যাত্রারম্ভ হয়েছিল ড. আম্বেদকরেরও। 'দলিত প্যান্থার ও দলিত সাহিত্য' প্রসঙ্গে আলোচনাকালে লিখেছেন লতা মুরুগকার—'অস্পৃশ্য সমাজের শিক্ষা ও নির্বাচনী রাজনীতির পথে এগুতে হবে—আম্বেদকরের এই আহ্বানে বিংশ শতাব্দীর তপশিলী জনপ্রতিনিধিরাও উদ্বুদ্ধ হলেন। আম্বেদকরই প্রথম তপশিলীদের মধ্যে নাগরিক অধিকারের বোধ সঞ্চার করলেন। তিনি ডাক দিলেন ভারতীয় সমাজের আমূল পরিবর্তন আনতে হলে সকল ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদ শ্রেণীকে এক পতাকার তলে শামিল হতে হবে। সেইজন্য ১৯৩৬ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন শ্রমিকদল, লেবার পার্টি, পরবর্তী সময় তপশিলী জাতি ফেডারেশন। ১৯৫৬ সালে তিনি তাঁর হাজার হাজার অনুগামীদের নিয়ে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিলেন। উদ্দেশ্য—হয়তো এভাবে তিনি অস্পৃশ্যদের হিন্দু

সমাজের সর্বগ্রাসী অত্যাচার থেকে বাঁচাতে পারবেন। অবশ্য মৃত্যুর আগে তিনি বহুজন সমর্থনভিত্তিক একটি রাজনৈতিক দল গড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন—নামও দিয়েছিলেন রিপাবলিকান পার্টি।'

তা হলে, জীবনব্যাপী সর্বতোমুখী সংগ্রামের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, হাজার হাজার অনুগামী নিয়ে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েও 'তিনি অস্পৃশ্যদের হিন্দু সমাজের সর্বগ্রাসী অত্যাচার থেকে' বাঁচানো সম্ভব হল না দেখে 'মৃত্যুর আগে বহুজন সমর্থন-ভিত্তিক একটি রাজনৈতিক দল গড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেই' ক্ষান্ত হননি—কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক দলটির 'নামও দিয়েছিলেন রিপাবলিকান পার্টি'।

অর্থাৎ মৃত্যুকে অদূরে রেখেও ড. আম্বেদকর তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা ও সংগ্রামের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত কয়েকটি সত্যোপলব্ধিতে উপনীত হয়েছিলেন :

১. প্রথমত, যতই বিশিষ্ট, যতই উদার, যতই সমতাভিত্তিক ধর্ম হোক-না-কেন, কোনো সম্প্রদায়েরই আনুষ্ঠানিক ধর্মে দীক্ষিত হলেই ধর্মান্তরিত মানবগোষ্ঠীর শোষণ ও আত্মাবমাননা থেকে 'মুক্তি' ঘটতে পারে না। বস্তুত, কোনো সম্প্রদায়বিশেষের ধর্মই পারে না দলিত-শোষিত মানুষের দলন-শোষণমুক্তি ঘটাতে।

২. দ্বিতীয়ত, অস্পৃশ্যতা নির্মূল করার পথে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হল তেমন ধরনেরই জনশিক্ষা, যা 'ধর্মশিক্ষা বা অধ্যাত্মশিক্ষার সঙ্গে কোনোরকম প্রত্যক্ষ সম্পর্করহিত, যে-শিক্ষা মানুষকে সর্বপ্রকার কুসংস্কার থেকে, মানবতাবিরোধী সমস্ত কদাচার ও অপসংস্কৃতি থেকে মুক্ত করবে এবং দলন-শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রতিবাদী মানুষের হাতিয়ার হয়ে উঠবে। নিঃস্বার্থ, নির্ভীক ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অটল মানুষ তৈরি করাই যথার্থ জীবনমুখী শিক্ষা। এখানেই ড. আম্বেদকর রামমোহন-ডিরোজিও-বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার দত্ত-রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য ও উত্তর-সাধক। ঐতিহ্যের ইতিবাচক দিকগুলিকে তিনি ক্রমশ আত্মস্থ করে নিতে পারছিলেন, অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে তা-ই প্রতিভাত হয়।

৩. জীবনপ্রান্তে উপনীত আম্বেদকর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, 'একটি রাজনৈতিক দল' গঠন করতে হবে। এবং সেই দলটিকে হতে হবে 'বহুজনসমর্থনভিত্তিক'।

(ক) প্রমাণিত হচ্ছে, বিশ্বের সব কালের সবচেয়ে অগ্রণী মননশীল নেতৃবৃন্দের

মতোই আম্বেদকর ছিলেন চলিষ্ণু স্বভাবের মানুষ। চিন্তায়-বাক্যে-কর্মে গতিশীল ছিলেন বলেই বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ করতে করতে, নিজেকে সমৃদ্ধ ও পরিশীলিত করতে করতে, চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে সততা ও নির্ভীকতার সঙ্গে এগিয়ে গেছেন। তাঁর জীবনে প্রগতি আছে, পশ্চাদগতি নেই।

(খ) জাতব্যবস্থা-ধর্মব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে বিচ্ছিন্নভাবে তা করা যাবে না। সেই সংগ্রাম বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগ্রামেরই অন্তর্গত যে-রাজনীতির ভিত্তিতে আছে প্রচলিত আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থা। তাই সেই সামগ্রিক সংগ্রামের জন্য চাই রাজনৈতিক দলেরই মঞ্চ।

(গ) জাতব্যবস্থার শিকার দলিতদের যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ মুক্তির সংগ্রামও শুধু তাঁদের নিয়েই হবে না। সঙ্গে নিতে হবে সমাজের প্রত্যেকটি শোষিত অংশকে। জাতব্যবস্থার শিকার দলিতরা হলেন দেশব্যাপী (এবং দুনিয়া-ব্যাপী) শোষিতদেরই একটি অংশ। অংশ কখনও সমগ্রের সমান হতে পারে না। কাজেই দলিতদের 'মুক্তি' তখনই সম্ভব, যখন সামগ্রিকভাবে 'শোষিত' ব্যাপক জনসাধারণের 'শোষণ'-মুক্তি ঘটবে।

(ঘ) আবার 'শোষিত' জনসাধারণের সংগ্রামে সচেতন ও মুক্তচিন্তার মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র-যুবক : ব্যাপক অংশের অর্থাৎ 'বহুজন'-এর শামিল হওয়া চাই। নারীরাও দূরে থাকতে পারেন না। তাঁরাও প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় সমাজের দুর্বলতর অংশ। তাঁদের সচেতন-অংশকেও সঙ্গে পাওয়া চাই। সুতরাং, তীক্ষ্ণধী ড. আম্বেদকর 'মৃত্যুর আগে বহুজন-সমর্থন-ভিত্তিক একটি রাজনৈতিক দল গঠনের' জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন।

(ঙ) তাই, 'দলিত দলিত' বলে যাঁরা সংকীর্ণতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তর্জন-গর্জন করছেন, তাঁরা কেউ কেউ ড. আম্বেদকরকে ব্যবহার ও বিকৃত করছেন, এবং অনেকেই ভুলে যাচ্ছেন, শুধু দলিতদের নেতারূপেই ড. আম্বেদকরের জীবনাবসান হয়নি। মৃত্যুর আগে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষেরই জাতীয় নেতার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য দাবিদার-রূপে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

(চ) তাঁর প্রতিষ্ঠিত পার্টির নামও রেখেছিলেন তিনি, 'রিপাবলিকান পার্টি'।

(ছ) তিনি কেন তদানীন্তন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন না, প্রশ্ন উঠতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে সমকালের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসে এবং অবশ্যই উত্তর খুঁজতে হবে তদানীন্তন

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গতিপ্রকৃতি ও স্বয়ং ড. আম্বেদকরের চলমান চেতনার তাৎক্ষণিক স্তরটিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আম্বেদকর শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র মুখপত্র 'পিপলস ডেমোক্রাসি'তে প্রকাশিত ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ লিখিত প্রবন্ধটিতে পার্থক্য সূত্রের বিশ্লেষণ।

শুধু দলিতদের কোনো সংগঠন ও দলিতদের সাহিত্যই তা হলে ড. আম্বেদকরের জীবনের অন্তিম পর্বের অভীপ্সা হয়ে ছিল না। তাঁর চলমান জিজ্ঞাসু জীবনের কোনো-একটি কালপর্বের উক্তি বা উদাহরণ টেনে তাঁর মধ্যেই তাঁর অন্তিম পর্বের পরিণত প্রজ্ঞার একমাত্র বা চূড়ান্ত স্বাক্ষর সন্ধান বড়ো বেশি একদেশদর্শী সন্ধান হয়ে উঠবে।

অথচ অনেকেই দলিত সাহিত্য প্রসঙ্গে আম্বেদকরকে উদ্ধৃত করেন, তাঁকে সাক্ষী মানেন। একথা সত্য যে, বিশের দশকে আম্বেদকরের নেতৃত্ব ব্রাহ্মণ্য-বাদের বিরুদ্ধে সঞ্চিত ক্রোধের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে মনুস্মৃতি ভস্মীভূত করার মাধ্যমে। ইংরেজি ভাষায় লিখিত ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে 'দলিত আন্দোলন' প্রসঙ্গেও এই তথ্যোল্লেখ পাই :

> The most significant Feature of modern Indian Literature in respect of the emergence of the underdogs as a literary force is what has come to be known as the Dalit movement. The word Dalit means 'the downtrodden' and the socially underprivileged who asserted themselves as a significant socio-political category called themselves by this name. It is a movement, different from the Ezhva's initiated by Narayan Guru or even the Gandhian movement for the upliftment of Harijan in its robustness and unstined criticisms of the Brahmanical orthodoxies. It gained momentum around 1920 under the leadership of Dr. B. R. Ambedkar with the burning of the Manusmriti.

এই সূত্রেই কেউ কেউ এতদূর পর্যন্ত লিখেছেন যে,

> প্রকৃতপক্ষে এই মনুস্মৃতি পোড়ানোর দিন থেকেই দলিত ভাবনা ও দলিত সাহিত্যের জন্ম। এই দিনটি ছিল ২৯ ডিসেম্বর, ১৯২৭।

'মনুস্মৃতি' কী, এই প্রসঙ্গে তা-ও জেনে রাখা ভালো। 'সনাতন ও প্রগতিশীল বনাম দলিত সাহিত্য' প্রবন্ধটিতে এ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তারই মধ্যে প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি পাওয়া যাবে, তাই উদ্ধৃতি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হলেও

অপরিহার্য :

'প্রশ্ন হলো, এই মনুস্মৃতি কী? মনুস্মৃতিতে যাওয়ার আগে মনু সম্পর্কীয় একটা গল্প আমাদের মনে রাখতে হবে। মনুর পূর্বের সমস্ত সৃষ্টির ধ্বংস করে, মনু থেকে নতুন সৃষ্টি ও সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করা হয়। এখানে বৈদিক ও উপনিষদীয় সংস্কারকে অস্বীকার করার কথা বলা হয়েছে এবং পারম্পর্য রক্ষা করা হয়েছে বিষ্ণুর মৎস্য অবতার দিয়ে। অর্থাৎ উপনিষদীয় উদারতাকে অস্বীকার করে খুব পরিকল্পিতভাবে নতুন সমাজব্যবস্থা তৈরি করার লক্ষ্যে মনুসংহিতার রচনা। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয়ে গেছে যে মনু কোনো এক ব্যক্তিবিশেষ ছিলেন না। স্বায়ম্ভুর প্রমুখ চৌদ্দজন ব্রাহ্মণের সম্মিলিত প্রয়াসে 'মনুসংহিতা' রচিত হয়। ঐতিহাসিকভাবে এও জানা যায় আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে মোট আটটি ধর্ম প্রচলিত আছে—হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ঋষি, ইহুদি, ইসলাম, জরাথুসত্রীয় ও কনফুসীয়। এদের মধ্যে ছয়টির জন্ম হয়েছে প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তির আধ্যাত্মিক দর্শনে। একমাত্র ইহুদি ও হিন্দুধর্ম ঈশ্বরের বাণী থেকে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। হিন্দুধর্মের মূল প্রবক্তা বেদে কিন্তু জাতি-বর্ণ-ভেদাভেদের কোনো কথা নেই। মনুসংহিতা থেকে বর্ণভিত্তিক মানুষকে পৃথকীকরণ ও শোষণের শুরু। এই নিপীড়ন ও শোষণ শেষ করতে তাই মনুসংহিতাকে প্রথম ও একমাত্র শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মনুর বিধানগুলোর উপর যদি ক্রমাগত আঘাত করা যায় এবং তাকে ভেঙে ফেলা যায় বা তার উপর জাতির বিশ্বাসকে নষ্ট করে ফেলা যায় তাহলে দেশের অধিকাংশ নিপীড়িত তথা দলিত মানুষের মুক্তি সম্ভব। হিন্দু পুরাণে কথাগুলো কল্পিত গল্প, মনুসংহিতার বিধানগুলোকে সংহত জোরদার করার প্রয়োজনে। মানুষের বিশ্বাসকে তার প্রতি আকর্ষণ করার জন্য। মনুসংহিতা-কথিত ব্রাহ্মণ কেবল ব্রাহ্মণ্যবাদী হবেন এমন না—যে কোনো জাতির মানুষ ব্রাহ্মণ্যবাদী হতে পারেন। কারণ মনু-সৃষ্ট সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর ভূমিকাই ক্ষত্রিয় শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা ও বৈশ্য শ্রেণীর কায়েমী আর্থিক স্বার্থকে বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। ব্রাহ্মণদের সৃষ্ট ধর্মীয় আচার ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনের মাধ্যমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শ্রেণীই সাধারণ মানুষের উপর শাসন ও শোষণ চিরায়ত করেছে। ব্রাহ্মণ মানে ধনী হবেন তা নয়, আসলে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সুযোগ যাঁরা নিচ্ছেন তাঁরা বুর্জোয়া ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চেহারার নিচে তাঁদের ঘৃণার কদর্য চেহারা লুকিয়ে থাকেন। সেখানে আর্থিক শোষণ ও সামাজিক শোষণের মধ্যে ভেদরেখা থাকে না। শুধু তাই নয়, দেখা যায় শূদ্র জনগণের মধ্য থেকে কিছু

শূদ্র শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে এবং আর্থিক সংগতিতে এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন যে তাঁরা নিজেরাও আজ নিজেদের শূদ্র বলে ভাবেন না। এঁরা কি তাহলে ব্রাহ্মণ হয়ে গেলেন? দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি শূদ্র দলভুক্ত হয়ে যাবেন? তা হয় না, কারণ এদেশের আর্থিক কাঠামোটা অদ্ভুত একটা বুনিয়াদের উপর দণ্ডায়মান। ধর্মের আধারে শ্রেণী বিন্যস্ত সমাজ কাঠামোর সঙ্গে অর্থনৈতিক কাঠামোর সহাবস্থান ও সাযুজ্য এখানে আছে। এদেশে শূদ্র ধনে সম্পদে প্রতিষ্ঠিত হলেও সামাজিক মর্যাদায় শূদ্রই থাকেন। ড. আম্বেদকরের মতে অস্পৃশ্যতা এমন একটি বিধি ব্যবস্থা যা হিন্দুদের কাছে (ব্রাহ্মণ্যবাদীদের) স্বর্ণখনি বিশেষ। যেখান থেকে শুধু পাওয়া যায়, দিতে হয় না কিছুই। এতদিন দেশের এই ৮৫ শতাংশ মানুষকে না দিয়েই বঞ্চিত রেখেছে এ দেশের ১৫ শতাংশ উচ্চবর্ণের বুর্জোয়া সমাজ। সুতরাং এর প্রতিবাদ তো একদিন হবেই, প্রতিবাদ যখন ভাষা পাবে তখন তার প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে সাহিত্য খুঁজে নেবে অবশ্যই।'

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির উদ্দেশ্য দলিত-অদলিত-নির্বিশেষে অগণিত ডিগ্রিধারী মানুষেরও হয় জানা থাকে না, নয়তো মনে থাকে না যে, বেদ-উপনিষদের উদার মানবতাবাদী দর্শন কোনো মানুষ বা মানবেতর কোনো প্রাণীকেই জন্মসূত্রে 'হেয়' বলে চিহ্নিত করেনি। করার কথাও নয়।

ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও সাধনার ধারা নির্ণয়কালে রবীন্দ্রনাথ প্রায় ঘোষণা-বাক্যের মতো বারবার উচ্চারণ করেছেন—'বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যের যোগদৃষ্টি ও ঐক্যের যোগ সাধনাই ভারতের বিশেষ ধর্ম।···ভারতের উঁচু-নিচু বহু ধর্ম ও সংস্কৃতিই পাশাপাশি রয়েছে।···বিরোধের মধ্যে-যোগের সাধনার নামই মধ্যযুগের সাধুদের ভাষায় ভারতপন্থ। এবং এই সাধনায় সিদ্ধ ভারতপথিকেরাই হলেন ভারতের মহাপুরুষ।' ভারতকে 'একটি বহুতন্ত্রী বীণা' নামে চিহ্নিত করে রবীন্দ্রনাথ যে-সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন তার গুরুত্বও অসাধারণ—

'কাজ সহজ করবার জন্য যাঁরা ভারতের এই অপূর্ব বহুতন্ত্রী বীণার নানা বৈচিত্র্যকে জোর করে নিঃশেষ করে এই সর্বৈশ্বর্যময়ী বীণাকে দীনহীন একতারায় পরিণত করে ফেলতে চান তাঁরা ভারতের সেই মহাধর্ম হতে ভ্রষ্ট। এই বিশেষত্বকে হারালে স্বধর্মভ্রষ্ট ভারতের আর রইল কী?'

বাংলা দেশের বিশেষত্বের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ :

'মানবপন্থী বাংলাদেশ প্রাচীনকালেও ভারতের শাস্ত্রপন্থী মন্ত্রজ নেতাদের

কাছে নিন্দনীয় ছিল। তীর্থযাত্রা ছাড়া এখানে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। তার মানে বাংলাদেশ চিরদিনই শাস্ত্রগত সংস্কার মুক্ত।···কাজেই এখানে শাস্ত্রগত বা সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতার স্থান নেই। বাংলাদেশের এই উদার বিস্তৃতির ফল দেখা যাবে তার সর্বক্ষেত্রে, তার শিল্পে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে, সাধনায়'।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 'মানবতত্ত্বের খুব বড়ো পণ্ডিত'। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর 'বাংলার সাধনা' পুস্তিকাটিতে ব্রজেন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক যে বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন, বাঙালিত্ব অনুধাবনে তা অত্যাবশ্যক। ব্রজেন্দ্রনাথ যুক্তিসংগতভাবেই যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা হল :

'বাংলাদেশে কত-জাতীয় মানুষের যে মিলন ঘটেছে তা বলে শেষ করা যায় না। এখানে আর্য-অনার্য-ভোট-কিরাত প্রভৃতি মঙ্গোলিয়ন জাতি মিলেছে। মণিপুর দিয়ে শাণবাসী চীনেরা এসেছে। গারো-খাসিয়া-কাছাড়ী-কোচ প্রভৃতি জাতি এখানে আছে। সাঁওতাল-ভীল-কোল প্রভৃতি রয়েছে। দ্রাবিড়দের তো এটা একটা মূল আস্তানা। বহু মানবজাতির মিলনভূমি বলেই মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে বাঙালিরা এত সচেতন।'

'মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে বাঙালিরা এত সচেতন' বলেই বাঙালির 'ভারত-আবিষ্কার'ও বিশিষ্ট চারিত্র্য-যুক্ত। কিছু কিছু ব্যতিক্রম সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে বাঙালির ভারত-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি তথা বাঙালির 'ভারত-দর্শন'ও মানবতত্ত্ব-ভিত্তিক। তাই রবীন্দ্রনাথ-ব্রজেন্দ্রনাথ শীল-ক্ষিতিমোহন প্রমুখ বাঙালি ভাবুকদের দৃষ্টিতে বাংলার বাউল-সাধকদের মর্মবাণীর সঙ্গে মধ্যযুগের ভারতীয় সাধক তথা সন্তদের জীবনদর্শনের তেমন কোনো ব্যবধান আর থাকে না। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের ভাষায়—"দীর্ঘকাল কাজ করিয়া দেখিলাম এই সন্তমত ও বাউলমত অনেকটা একই। উভয়েরই সাধনীয় 'সহজ', উভয়েরই পথ 'মধ্য-পন্থা', উভয়েই শাস্ত্রভার হইতে মুক্ত, উভয়েরই লক্ষ্য আপনার কায়ার মধ্যে। দেহের মধ্যেই তাহাদের বিশ্ব। জাতি ও সমাজের বন্ধন উভয়ের কাছেই অর্থহীন। তাহাদের সবকিছুই মানবের মধ্যে, কাজেই তাহাদের উভয়ের ধর্মকেই মানবধর্মও বলা চলে।"

সন্ত ও বাউল সাধকদের মধ্যে আরও-একটি ঐতিহাসিক সম্পর্ক ক্ষিতিমোহন লক্ষ করেছিলেন। উভয়মতেরই উদ্ভব বৈদিক আর্যভূমির বাইরে ভারতের পূর্ব-উত্তর সীমান্তে। এই অঞ্চলেই বেদ-বিরুদ্ধ জৈন ও বৌদ্ধ মতের জন্ম হয়েছিল। শৈব্য নাথ যোগ বৌদ্ধ সহজিয়া মত ধর্ম-উপাসনা শক্তি-পূজা প্রভৃতি অবৈদিক মতেরও 'মুখ্য স্থান ও আদি এই প্রদেশেই'। বৈদিক ভূমির

মধ্যে এইসব মতাদর্শের প্রতিপত্তি অপেক্ষাকৃত কম ছিল। মধ্যযুগে কবীর প্রভৃতির মতবাদও ভারতের পূর্ব-উত্তর অবৈদিক অঞ্চলেই উদ্ভূত হয়েছিল।

লক্ষণীয় যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-হলে আয়োজিত ভারতীয় দর্শন মহাসভা মহাঅধিবেশনের সভাপতিরূপে ১৯২৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ Philosophy of Our People-নামে পঠিত ভাষণে বাংলা দেশের নিরক্ষর বাউলদের কথাই বললেন। এই ভাষণের তত্ত্ব ও বাণী বাংলার পল্লিবাসী নিরক্ষর বাউলদের রচনা থেকেই গৃহীত।

পাঁচ বছর পরে ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন, তাতেও ভারতের কোনো শাস্ত্র-সম্মত অভিজাত দর্শন বা কেতাবি ধর্মতত্ত্ব নিয়ে নয়, ইংরেজিতে Religion of man-শিরোনামযুক্ত বক্তৃতায় ভারতের নিরক্ষর দীনহীন সন্ত-বাউলদের মানবধর্মের কথাই রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছিলেন।

বস্তুত বহুশতাব্দব্যাপী জাতিপঙ্ক্তি-বহির্ভূত নিরক্ষর একদল সাধক শাস্ত্রভারমুক্ত মানবধর্মেরই সাধনা করেছেন। সমাজের বিধিবিধানের সীমার বাইরে মুক্তচিত্ত এই সব সাধক কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মের ধার ধারেননি। বাউলদের সাধনার আর-একটি অঙ্গ হল 'জ্যান্তে মরা'। সুফিদের মধ্যেও একদল সাধক মুসলমান শাস্ত্রের দাবির বাইরে বিচরণ করেছেন। তাদের মধ্যেও আছে 'জ্যান্তে মরা'। বাউলদের বেশ ও ভাষে হিন্দু-মুসলমান দুই ভাবেরই মিলন আছে। ক্ষিতিমোহনের ভাষায়—'তাঁহার সর্ব-কেশ রক্ষা করেন, কারণ কেশের বিশেষভাবে রক্ষা না-রক্ষার দ্বারা বিশেষ সম্প্রদায় সূচিত হয়। দেহকে ইঁহারা নগ্ন রাখেন না, সযত্নে নানা বস্ত্রখণ্ড জোড়াতালি দিয়া দেহকে আচ্ছাদিত করেন। সেই বেশও কতকটা মুসলমানী ভাবের।'

ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা অন্বেষণকালে রবীন্দ্রনাথ যে গভীর সত্যটি প্রত্যক্ষ করেছেন সেই একই স্বরূপ-সত্য তিনি মর্মস্থ করতে পেরেছেন—ভারতবর্ষের বিচিত্র ধর্মসাধনার ইতিহাস পর্যালোচনাকালেও। আচার্য ক্ষিতি-মোহন ও আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ প্রমুখ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টি-ভঙ্গির সঙ্গে একাত্মবোধ করেছেন গভীরভাবে। পৃথিবীর সর্বত্র নবোদ্ভূত কোনো ধর্ম এসে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মকে উচ্ছেদ করলেও ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম এই যে, এখানে সাধনার পর সাধনা এসেছে এবং বিভিন্ন ধর্ম-সাধনার সহাবস্থান ঘটেছে খুব স্বাভাবিকভাবেই। বিরোধ-সংঘাতের কিছু কিঞ্চিৎ অবকাশ ঘটলেও নবাগত সাধনার ধারা প্রচলিত ধর্ম-সাধনাগুলিকে নিরস্ত বা নির্মূল কোনোটাই

করেনি। এক্ষেত্রেও আমরা ক্ষিতিমোহনের ভাষা ও ভাষ্য উদ্ধৃত করছি :

"একের সাধনার উপরে অন্যের সাধনা রক্ষিত হইয়াছে। ব-দ্বীপে যেমন নানা স্তরে ভূভাগ গঠিত হয় তেমনি ভারতের ধর্ম নানা দলের সাধনায় গড়িয়া উঠিয়াছে। তাই ভারতের ধর্ম ভারত বা হিন্দের নামে 'হিন্দু' ('ভারতীয়') নামেই অভিহিত। ব্যক্তিবিশেষ বা কোনো প্রবর্তকের নামে এই হিন্দু ধর্ম নহে।"

কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের চতুঃশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিকাগোয় আয়োজিত বিশ্বমেলার অন্যতম অঙ্গরূপে ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে ধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন দিনে বিবেকানন্দ যে-ভাষণগুলি প্রদান করেছিলেন, তার প্রথমটিতেই তিনি বলেন, 'আমরা (হিন্দুরা) শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি' ('We belive not only in universal toleration,but we accept all religion as true')।

শিকাগো-ভাষণগুলি, ১১ থেকে শুরু করে ২৭ পর্যন্ত প্রদত্ত ভাষণগুলি, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, হিন্দুধর্মকে বিবেকানন্দ 'বেদোক্ত' ধর্মরূপে চিহ্নিত করেছেন, শুধু তাই নয়, ১৯ সেপ্টেম্বর নবম দিবসের ধর্মমহাসম্মেলনে বিবেকানন্দ 'হিন্দুধর্ম' শিরোনামে প্রদত্ত ভাষণে হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে বলেন, 'ভারতবর্ষে সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় উত্থিত হইল, যেন বেদোক্ত ধর্মের ভিত্তি পর্যন্ত নড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় সাগরসলিল যেমন কিছু পশ্চাৎপদ হইয়া সহস্রগুণ প্রবল বেগে সর্বগ্রাসী বন্যারূপে ফিরিয়া আসে, সেইরূপ ইহাদের জননীস্বরূপ বেদোক্ত ধর্মও প্রথমত কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ হইয়া আলোড়নের অগ্রগতি শেষ হইলে ঐ সম্প্রদায়গুলিকে সর্বতোভাবে আত্মসাৎ করিয়া নিজের বিরাট দেহ পুষ্ট করিয়াছে।'

১৯ সেপ্টেম্বরের বক্তৃতাটিতেই বিবেকানন্দ বলেছিলেন—'The Hindus received their religion through revelation, the Vedas.'। 'উদ্বোধন' সংগঠিত বঙ্গানুবাদ—'আপ্তবাক্য বেদ হইতে হিন্দুগণ তাহাদের ধর্ম লাভ করিয়াছেন'।

এখন প্রশ্ন, 'বেদ বলতে কী বুঝিয়েছেন বিবেকানন্দ'। বিবেকানন্দের ইংরেজিতে প্রদত্ত ভাষণাংশের প্রাসঙ্গিক বঙ্গানুবাদটুকু হলো—'তাহারা (হিন্দুগণ) বেদসমূহকে অনাদি ও অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন। একখানি পুস্তককে অনাদি ও অনন্ত বলিলে এই শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তাহা হাস্যকর

বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু বেদ শব্দ দ্বারা কোনো পুস্তক-বিশেষ বোঝায় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে যে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, বেদ সেই সকলের সঞ্চিত ভাণ্ডারস্বরূপ'।

বিবেকানন্দ বিশদ করে বলেছিলেন, 'এইসব আধ্যাত্মিক সত্য আকাশ থেকে পড়েনি, এইগুলির আবিষ্কারকগণের নাম ঋষি।—আমরা তাহাদিগকে সিদ্ধ বা পূর্ণ বলিয়া ভক্তি ও মান্য করি।'

বিবেকানন্দ গর্ব ও গৌরবের সঙ্গে জানিয়েছেন : 'আমি এই শ্রোতৃমণ্ডলীকে অতি আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, অতিশয় উন্নত ঋষিদের মধ্যে কয়েকজন নারীও ছিলেন'।

হিন্দুধর্মকে 'বেদোক্ত ধর্ম'-রূপে চিহ্নিত করে বিবেকানন্দ 'বেদ'-এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, ভারতবর্ষে বিভিন্ন কালপর্যায়ের সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় তরঙ্গের মতোই উত্থিত হয়েছে, ফলে বেদোক্ত ধর্ম সাময়িকভাবে পশ্চাৎপদও হয়েছে কিন্তু অবশেষে ওই সব সম্প্রদায়কে 'সর্বতোভাবে আত্মসাৎ করিয়া নিজের বিরাট দেহ পুষ্ট করিয়াছে'। বিদ্যাপতির প্রাসঙ্গিক পদাংশ মনে পড়ে :

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা।

বেদোক্ত ধর্মের এই বৈশিষ্ট্যকে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'হিন্দুধর্মের বিরোধগ্রাসিতা'-রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। বেদ-বিরোধী ধর্মের প্রবক্তা বুদ্ধদেবকেও কত অনায়াসেই হিন্দুধর্ম নিজস্ব অবতাররূপে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছিল বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবভূমি এই ভারতবর্ষেই। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বুদ্ধদেব-চরিত' নাটকটি এই সূত্রে মনে পড়তে পারে। বলেন্দ্রনাথ উদয়গিরি-খণ্ডগিরি বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণপূর্বক দেখিয়েছেন, কীভাবে নিজের উদ্ভবভূমিতেই বৌদ্ধধর্ম বেদোক্ত ধর্মের আচার-আনুষ্ঠানিকতার খপ্পরে পড়ে ক্রমশ নির্জীব হয়ে পড়ল এবং তান্ত্রিকতার দ্বারা গ্রস্ত হল। জন্মভূমি ভারতবর্ষেই বৌদ্ধধর্মের ক্রমিক অবক্ষয়ের চেহারা ও চরিত্র পরিস্ফুট করেছিলেন বলেন্দ্রনাথ।

বিবেকানন্দ কুয়োর ব্যাঙ আর সমুদ্রতীরের ব্যাঙের গল্পটি শুনিয়েছিলেন ১৫ সেপ্টেম্বরের ধর্মীয় বাগবিতণ্ডার সময়ে এবং 'কূপমণ্ডুকতা'কেই ধর্ম নিয়ে

বিভেদ-বিরোধের ও যাবতীয় ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের কারণরূপে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। খ্রীস্টধর্ম ও ইসলাম প্রভৃতির মতোই তাঁর নিজের ধর্ম হিন্দুধর্মের মধ্যেও এই একই সংকীর্ণতা বিদ্যমান, এই একই কূপমণ্ডুকতা, সে কথাও ১৫ সেপ্টেম্বরের ভাষণেই উল্লেখ করেছিলেন তিনি।

নিবেদিতা বেদোক্ত ধর্মের ব্যাখ্যাতারূপে বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

যে-রত্নরাজি ভারত নিজেরই মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কেবলমাত্র সেগুলির প্রকাশরূপে, ব্যাখ্যাতারূপেই স্বামীজী বিরাজমান।

নিবেদিতার মতে, বিবেকানন্দ ছাড়া বেদ-উপনিষদের সত্যগুলি কেতাবি পণ্ডিতদের 'দুর্বোধ্য তর্কবিচারেই পরিচিত থাকিয়া যাইত'। বিবেকানন্দ পণ্ডিতদের মতো কেতাবি বুলি আওড়াতেন না, তিনি বেদ-উপনিষদের সত্য আত্মস্থ করেছিলেন বলেই তাঁর মুখে সেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। বেদ-উপনিষদভিত্তিক ধর্মের লোকগ্রাহ্য, লোকায়ত রূপায়ণেই তিনি বিবেকানন্দ। স্বদেশের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের এবং বিদেশিদের কাছে বিবেকানন্দ-প্রচারিত বক্তব্য কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মমাত্র নয়, তা কতকগুলি সত্য। নিবেদিতার ভাষায়, 'কারণ তিনি যে-বিষয়ে শিক্ষা দিতেন—সে বিষয়ের উপলব্ধির গভীরে তিনি অবগাহন করিয়াছেন এবং রামানুজের মতো তিনি সেই অবস্থা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন—শুধু পরিচয়, অন্ত্যজ ও বিদেশীদের নিকট ঐ উপলব্ধির রহস্য প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য।···তাঁহাকে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল—সমভাবে সাধু, পণ্ডিত ও সরল সাধারণ মানুষের সহিত মিশিতে হইয়াছিল, সকলের নিকট শিখিতে হইয়াছিল, সকলকে শিখাইতে হইয়াছিল, সকলের সহিত বাস করিতে হইয়াছিল—।'

হিন্দুধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য স্বামী বিবেকানন্দকে অনুসরণ করে নিম্নোক্তরূপে বিন্যস্ত করলে জিজ্ঞাসু পাঠকের পক্ষে সেগুলি অনুধাবন করা সহজ হবে :

১. হিন্দুধর্মে বিগ্রহ-পূজা যে সকলেরই অবশ্যকর্তব্য, তা নয়।
২. কিন্তু কেউ যদি বিগ্রহের সাহায্যে সহজে নিজের ভাব উপলব্ধি করতে পারে, তাকে 'পাপ' বলা সংগত হবে কী—প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। যে-সাধক বিগ্রহ-পূজার স্তর অতিক্রম করে অগ্রসর হয়েছেন, সেই সাধকও বিগ্রহ-পূজাকে 'ভুল' বলতে পারেন না।
৩. হিন্দু-দৃষ্টিতে মানুষ ভ্রম থেকে সত্যে যায় না, পরন্তু সত্য থেকেই সত্যে—

নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে উপনীত হচ্ছে।

৪. হিন্দুর কাছে নিম্নতম জড়োপাসনা থেকে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত সাধনার অর্থ অসীমকে ধরার, উপলব্ধি করার জন্য মানুষের বিবিধ চেষ্টা।

৫. কে কোন সাধনপন্থা তথা সাধনপ্রচেষ্টা গ্রহণ করবে, সেটা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের বাস্তব পারিপার্শ্বিকের উপর তথা জন্ম, সঙ্গ ও প্রতিবেশ—পরিস্থিতির উপর। কোনো পথই ভুল বা অনন্য নয়, প্রত্যেকটি সাধন ক্রমোন্নতির অবস্থা। বিবেকানন্দের ভাষায়, 'প্রত্যেক মানবাত্মাই ঈগলপাখীর শাবকের মতো ক্রমশ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিবে এবং ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করিয়া শেষে এক মহান সূর্যে উপনীত হয়'।

৬. বহুত্বের মধ্যে একত্বই প্রকৃতির ব্যবস্থা, হিন্দুগণ এই রহস্য ধরিতে পারিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম কতকগুলি নির্দিষ্ট মতবাদ বিধিবদ্ধ করিয়া সমগ্র সমাজকে বলপূর্বক সেগুলি জানাইবার চেষ্টা করে। সমাজের সম্মুখে তাহারা একমাপের জামা রাখিয়া দেয়—জ্যাক, জন, হেনরি প্রভৃতি সকলকেই ওই একমাপের জামা পরিতে হইবে। যদি জন বা হেনরি গায়ে না-লাগে, তবে তাহাকে জামা না-পরিয়া খালি গায়েই থাকিতে হইবে।

মূর্তিপূজার বিষয়টি বিবেকানন্দ তাঁর ওই দিনের ভাষণের শেষ অংশে পুনরায় উত্থাপন করলেন, বুঝিয়ে বললেন :

'ভারতবর্ষে মূর্তিপূজা বলিলে ভয়াবহ একটা কিছু বুঝায় না। ইহা দুষ্কর্মের প্রসূতি নয়, বরং ইহা অপরিণত মন কর্তৃক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব ধারণা করিবার চেষ্টা স্বরূপ।'

বিবেকানন্দের এই উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এবং আজ থেকে একশো বৎসর আগের এই উক্তিটি শতবর্ষ পরেও গভীরভাবে বিবেচনার যোগ্য। মূর্তিপূজার সপক্ষে বিবেকানন্দ কোনো ধর্মীয় মাহাত্ম্য কীর্তন করছেন না এখানে। শুধু বলছেন, এটা কোনো ভয়াবহ অপরাধ বা অন্যায় অন্তত নয়। কিন্তু ব্যাপক সাধারণ মানুষ যেখানে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা-গ্রস্ত, সেখানে অজ্ঞতাও থাকবে। বস্তুত, এই অংশটির আলোচনার সূচনাতেই বিবেকানন্দ বলে নিয়েছেন—

'এখন দর্শনের উচ্চ শিখর হইতে অবরোহণ করিয়া অজ্ঞ লোকদের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করি।'

আলোচনাকালে বিবেকানন্দ 'মূর্তিপূজা'-র সপক্ষে কোনো কুযুক্তির অবতারণা করেননি।' তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 'যত মত তত পথ'

সূত্রটি মনে রেখে তিনি বিভিন্ন ধর্মের সাধনপদ্ধতির বাস্তব অবস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের মতোই হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যেও কিছু 'কুসংস্কার' বিদ্যমান (কুসংস্কার মানুষের শত্রু বটে) মন্তব্যটি লক্ষণীয়। কিন্তু একই বাক্যে এই কথাও যুক্ত করে দিয়েছেন যে, খ্রীস্টধর্মাবলম্বী ও অন্যান্য ধর্মানুসারী ব্যক্তিগণ যখন 'মূর্তিপূজা'-র বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে সমগ্র হিন্দুধর্মেরই বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করেন, তা হয়ে দাঁড়ায় সমালোচনাকারী ভিন্নধর্মাবলম্বীর পক্ষে 'ধর্মান্ধতা'-রই নামান্তর ('কিন্তু ধর্মান্ধতা আরো খারাপ') ! এই সূত্রেই তিনি ধর্ম তুলেছেন, খ্রীস্টানরাও গির্জায় যান, ক্রুশকে পবিত্র বলে মনে করেন। প্রার্থনার আকাশে তাকান, ক্যাথলিকদের গির্জায় তো অজস্র মূর্তি থাকে। এগুলিও কোনো দোষাবহ ঘটনা নয়। 'মূর্তির মতো এগুলিও সব প্রতীকমাত্র।' আর একথাও বিবেকানন্দ অনুভব করেন যে, 'হিন্দুদেরও অনেক দোষ আছে, অনেক বৈশিষ্ট্য আছে'! হিন্দুদের মধ্যেও 'ধর্মোন্মাদ হিন্দু'ও আছে। এমনই 'ধর্মোন্মাদনা' যে, 'চিতায় স্বীয় দেহ দগ্ধ' করে।

এই ধরনের আচারব্যবহার-প্রথাপদ্ধতিকে বিবেকানন্দ 'ধর্ম' বলেননি, সুস্পষ্ট ভাষায় 'ধর্মোন্মাদনা'-ই বলেছেন এবং মনে করিয়ে দিয়েছেন. এই সব দোষের জন্য হিন্দুধর্মকে অভিযুক্ত করা সঠিক নয়, 'যেমন ডাইনি নামে চিহ্নিত করে আগুনে পুড়িয়ে নারীহত্যার দোষ' খ্রীস্টধর্মের উপর দেওয়া যায় না।

অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে 'দিল্লি ডায়েরি'-তে (রচনাকাল ১০.৯.৪৭ থেকে ২৯.১.৪৮) ২১.১১.৪৭ তারিখে 'হিন্দু' এবং 'হিন্দুধর্ম' কী, আক্ষরিকভাবে 'হিন্দুর লক্ষণ কী', হিন্দু শব্দের আদি কী?' এবং 'হিন্দুধর্ম বলিয়া কিছু আছে কি?' প্রশ্নগুলির উত্তরে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি লিখেছিলেন—"প্রশ্নগুলি খুব সময়োপযোগী। কিন্তু আমি ঐতিহাসিক নহি, পাণ্ডিত্যের দাবি আমি করি না। তবে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কোনো প্রামাণ্য পুস্তকে আমি পড়িয়াছি যে, বেদে 'হিন্দু' শব্দটি নাই। মহাবীর আলেকজান্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন সিন্ধুনদীর পূর্বতীরস্থ লোকদিগকে 'হিন্দু' নামে বর্ণনা করা হইয়াছে। যে সকল ভারতীয় ইংরেজিতে কথা বলেন তাঁহারা এই সিন্ধুনদীকে বলে ইন্ডাস। গ্রিক ভাষায় 'S' অক্ষরটি 'H' হইয়া গিয়াছে, আর এই সকল অধিবাসীদের ধর্ম হইয়া গিয়াছে হিন্দুধর্ম। তাঁহারা এই ধর্মকে অত্যন্ত উদার বলিয়া জানিতেন। প্রাচীনকালে যে সকল খ্রীস্টান নির্যাতনের ভয়ে পালাইয়া আসিয়াছিল, এই হিন্দুধর্ম তাহাদের আশ্রয় দিয়াছিল। হিন্দুগণ বেনি-ইসরাইল নামক ইয়ুদীদের

এবং পার্শিদেরও আশ্রয় দিয়াছিল। উদার বলিয়া হিন্দুধর্মে সকলের স্থান আছে। সেই হিন্দুধর্মাবলম্বী বলিয়া আমি গৌরব অনুভব করি। আর্য পণ্ডিতগণ যাহাকে বৈদিক ধর্ম বলেন, তাহাতেই একান্ত বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের মতে হিন্দুস্থানের তখন অন্য নাম ছিল আর্যাবর্ত। আমার সেরূপ কোনো পাণ্ডিত্যের দাবি নাই। হিন্দুস্থান বলিতে আমি যাহা বুঝি, আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। আমার সেই ধারণার মধ্যে বেদ রহিয়াছে, আবার তদতিরিক্ত আরও অনেক কিছু রহিয়াছে। হিন্দুধর্মের মর্যাদা কোনো-প্রকারে ক্ষুণ্ণ না করিয়া আমি ইসলাম, খ্রীস্টান, জরথুস্ত্র ও ইয়ুদীদের ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের প্রতি সমান শ্রদ্ধা দেখাইতে পারি, আর সে কথা প্রচার করিতে আমি কোথাও অসঙ্গতি দেখি না। আকাশে যতদিন সূর্য, ততদিন এই হিন্দুধর্ম থাকিবে। তুলসীদাস একটি দোঁহায় হিন্দুধর্মের সার কথাটি গাঁথিয়া দিয়াছেন—'ধর্মের মূল নিহিত রহিয়াছে করুণায়, আর দেহের প্রতি অনুরাগের মধ্যে রহিয়াছে মানুষের অহংকার। তুলসী বলেন, শরীর যদি ধ্বংসও হয়, তবু করুণা কখনও ত্যাগ করিও না।"

সুতরাং, ক্ষিতিমোহন বলেন,—'তাই ভারতের ধর্ম ভারত বা হিন্দের নামে 'হিন্দু' ('ভারতীয়') নামেই অভিহিত। ব্যক্তিবিশেষ বা কোনো প্রবর্তকের নামে এই হিন্দু ধর্ম নহে।'

এখানেই পুনশ্চ স্মর্তব্য, 'কিন্তু বেদ শব্দ দ্বারা কোনো পুস্তক-বিশেষ বোঝায় না ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে যে আধ্যাত্মিক সত্য সমূহ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, বেদ সেই-সকলের সঞ্চিত ভাণ্ডার স্বরূপ।'

বেদসংহিতায় আর্য বেদপন্থীদের যাগযজ্ঞ-সমন্বিত আচার-অনুষ্ঠান যথেষ্ট প্রাধান্য পেলেও বেদের শেষভাগে ও উপনিষদে আর্যেতর বেদবিরোধীদের যাগযজ্ঞ-বিরোধী মানবসত্য তথা মানবধর্মের পরিপোষক বাণীরও অভাব নেই। সেইসব বাণীতে সকাম যাগযজ্ঞ, স্বর্গকামনা, দেবতাদের কাছে প্রার্থনা প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হলো, ঘোষিত হলো এই উপলব্ধি : 'মানব-সত্যই বিশ্বের সার সত্য। মানুষের আন্তর-সত্তাই পরম মানব বা ভগবান। অন্তরের প্রেম দিয়েই যদি তাঁকে পাওয়া যায় শাস্ত্রবচনের ভার বহন করব কেন? মানব-কায়ার মধ্যেই তো ব্রহ্মাণ্ড। এই ভাণ্ডের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ড সিদ্ধি মিলিবে।'—এইসব কথাই আর্যেতর সাধনার কথা।

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাগানগুলির প্রথমটিতেই আছে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের গভীরতম উপলব্ধির প্রতিধ্বনি—যা বেদেও আছে :

কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চীএ পৈঠা কাল॥

ধর্মসাধনার প্রধান তিন পথ কর্ম, জ্ঞান ও প্রেমের মধ্যে প্রেমই সবচেয়ে অন্তরঙ্গ। কাজেই প্রেমই সাধনার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বা প্রধানতম পথ। প্রেমের আদি-অন্ত এই মানুষে। জ্ঞান ও কর্মের পথে শাস্ত্র আর লোকাচার বহুলাংশে সহায়ক হতেও পারে কিন্তু প্রেমকে পথ দেখাতে পারে এমন শাস্ত্র বা লোকাচার কোথায়।

তেমন প্রেমিক হলে তাঁকে দেখে অন্যের প্রেম জাগতে পারে। যেমন—বুদ্ধদেব, যেমন—শ্রীচৈতন্য। প্রেমের পথে তেমন গুরু পথপ্রদর্শক হতে পারে। যথার্থ গুরুর সংজ্ঞা কী—'আসলে সাধকদের অন্তরের মধ্যস্থ আদর্শ মান্য-গুরুই এই প্রেম-সাধনার আসল গুরু।' অর্থাৎ, মানস-গুরুই আসল গুরু। সাধকের নিজের বাইরেও গুরু ও সাধুসজ্জন এই পথের সহায় হতে পারেন। তাই তাঁরাও নমস্য।

যথার্থ গুরুর সহায়তায় প্রেমের পথে অগ্রসর হলে সমস্ত বহিরঙ্গ বন্ধন ঘুচে যায়, তখন স্বাধীন ও মুক্ত সাধকের কাছে বাইরের পূজা-অর্চনার, মূর্তি-প্রতিমা, তীর্থ-দেবালয়, শাস্ত্রবিধি প্রভৃতি সমস্ত কৃত্রিমতার দাসত্ব নির্মূল হয়ে যায়।

পরিণত বয়সে রবীন্দ্রকবিতা ও গানের অসংখ্য ছত্রে এই সহজ সরল সত্যটিরই শিল্পিত উচ্চারণ আমরা শুনেছি।

বাউলরা আরও বিশ্বাস করেন, বাইরের বেদকে বিদায় দিলেই অন্তরের বেদ উদ্ভাসিত হয়। অন্তর বেদ গ্রহণ করতে পারলে তথাকথিত শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। 'পূজা-রোজা-নিয়ম-নৈসাজ সবই ঘুচিয়া যায়। জাতি-বর্ণ প্রভৃতি ভেদবুদ্ধিরও অবসান হয়। ইহারই নাম কায়াগত সহজবেদ।…এই সব মতই সহজ বা অনাদি মত। বেদের পূর্বে ইহা ছিল।…বেদেও ইহার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে।…যাগযজ্ঞওয়ালা বেদপন্থীরাও ক্রমেই এই পথে আগাইয়া আসিতেছেন।'

স্বভাবতই এই বাউলমত ও বাউলিয়া সাধনা মানুষের আবির্ভাব কাল থেকেই চলে আসছে। বাউলের মতে বেদ-পথ নিতান্ত অর্বাচীন এবং কৃত্রিম। ঋষিরা মাত্র সেদিন তা সৃষ্টি করেছেন—'বাউলিয়া সহজ মতই অনাদি কালের। বেদের আদি আছে'।

ঋগবেদ প্রাচীনতম। সেখানেও মানুষের এই প্রেমধর্মের কথা আছে।

সামবেদে ও যজুর্বেদেও আছে। অথর্ববেদকে তো বাউলেরা নিজেদেরই প্রাচীনতম বাণী বলেন। এইভাবেই বেদের পর উপনিষদ, জৈন-বৌদ্ধ মত, পুরাণ প্রভৃতি নানা রকমের গ্রন্থ আছে। শৈব নাথ যোগী ও বৌদ্ধ সহজমত ও তন্ত্রের নামও এই সঙ্গে মনে করা উচিত। তন্ত্রের সঙ্গে বাউল-ভাবনার মিল ও অমিল দুই-ই আছে। তান্ত্রিকদের সঙ্গে বাউলদের কায়াবোধ এবং কায়াযোগেরই মিল দেখা যায়। অনুরাগতত্ত্ব অবশ্য বাউলদের বিশেষত্ব। ব্রাহ্মণেও বিশেষত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে মানুষের শিল্পসাধনার গভীর তত্ত্বকথা আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও পাই—

'চরৈবেতি'-র মর্মসত্য। রবীন্দ্রনাথের বলাকায় এই গতিশীলতার তত্ত্বই পাশ্চাত্য দার্শনিক বার্গস-র ভাবনার সঙ্গে সুন্দরভাবে গ্রথিত হয়েছে। 'চরৈবেতি' মন্ত্রে গতিশীলতার যে আকুতি আছে পরবর্তীকালে কবীর-এর বাণীতে তারই প্রতিধ্বনি শুনেছেন ক্ষিতিমোহন। কবীর বলেন :

'বহতা পানি নির্মলা বন্ধ্যা গনধিলা হোয়' অর্থাৎ 'যে জল বহিয়া চলে তাহা নির্মল থাকে বদ্ধ জল ওঠে পচিয়া'। উপনিষদের সঙ্গে বাউল-ভাবনার মিল গভীর বলেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে উপনিষদ ও বাউল দুটি সমান গ্রহণযোগ্য হতে পেরেছিল। মহাভারতেও বাউলের তত্ত্ব আছে। সেখানেও মানব-মাহাত্ম্য উচ্চারিত। উপনিষদেও আছে।—জাতির দ্বারা কোনো ব্যক্তির যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না। মহত্ত্বের পরিচয় দিতে হবে চরিত্রের সাহায্যে। জাতি বিচারের দ্বারা মহত্ত্বের উৎস-সন্ধান নিরর্থক। মানুষই হলো সকলের সার। মহাভারতে ভীষ্মের উক্তি প্রথম দিকেই উদ্ধৃত হয়েছে—'সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ' তার চেয়ে বড়ো কিছু নেই। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব কোথায়? জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হলেই কেউ ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করে না। একতা, সমতা, সত্যতা, শীল, অহিংসা, সরলতা, তপস্যা ও কর্মফলের ত্যাগশক্তিই ব্রাহ্মণত্বের বৈশিষ্ট্য। মহাভারতেও বাউলিয়া বস্তুতত্ত্ব আছে, সেখানেও জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে মানুষেরই জয়গাথা উচ্চারিত হয়েছে—বিশেষজ্ঞেরা এইরকমই বলে থাকেন।

মৈত্রেয় উপনিষদ ঘোষণা করেছে :

বর্ণাশ্রম ধর্ম পরিত্যাগ করে অন্তরের সাধনা করেই মানুষ আনন্দতৃপ্ত হতে পারে। এই উপনিষদেই আছে—দেহই তোমার দেবালয় তাতে যে জীব, তিনিই শিব। বেদ-বাহ্য ধর্মগুলির তো কথাই নেই। জৈন ও বৌদ্ধ মতেও মানুষই শেষ কথা। জাতি-পঙক্তি প্রভৃতির বিচার মিথ্যা মাত্র। জৈন-বৌদ্ধমতের সঙ্গে বাউলমতের সাদৃশ্য গভীর। কোনো কোনো পুরাণেও জাতি-পঙক্তি অগ্রাহ্য

হয়েছে। যেমন, ভবিষ্য-পুরাণ মতে :

শূদ্রেরাও ব্রাহ্মণের সমান। ব্রাহ্মণের চেয়ে শূদ্রেরা যদি কোনো অংশেই কম না হয়, তাহলে আর ব্রাহ্মণে-শূদ্রে ভেদ করা কেন?

ভবিষ্যপুরাণ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে ক্ষিতিমোহন যে বঙ্গানুবাদ করেছিলেন তা এই সূত্রে মনে রাখা ভালো—

কোনো দিক দিয়াই তো শূদ্রে-ব্রাহ্মণে কোনো ভেদ মেলে না। না বাহিরে-ভিতরে, না সুখে-ঐশ্বর্যে, না আস্তায়-অভয়ে, না বীর্যে-আকৃতিতে, না জ্ঞানে-কর্মে, না আয়ুতে-স্বাস্থ্যে, না দৌর্বল্যে-স্থৈর্যে, না চপলতায়-প্রজ্ঞায়, না বৈরাগ্যে-ধর্মাচরণে, না পরাক্রমে-ত্রিবর্গে, না রূপে-নৈপুণ্যে, না ভেষজে-স্ত্রীগর্ভে, না গতিতে-দেহমলসংপ্লবে, না অস্থিরন্ধ্রে , না প্রেমে, না প্রমাণে, না লোমে। ব্রাহ্মণ-শূদ্রে কোথাও কি একটুও ভেদ আছে?—

ভারতবর্ষে এরও পরে যখন মুসলমানেরা এলেন, তখন ভারতীয় চিন্তায় ও ধর্মসাধনায় বড়ো একটি সংস্পর্শ ঘটল। বহুদিন পাশাপাশি থেকে ও হিন্দু-মুসলমান দুই দলেরই পণ্ডিতেরা চেষ্টা করেও দুটি ধারাকে মেলাতে পারলেন না। তখন নিরক্ষর সাধকদেরই এগিয়ে আসতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আমরা পুনশ্চ আচার্য ক্ষিতিমোহনের বক্তব্য স্মরণ করতে পারি—"কবীর যখন হিন্দু-মুসলমান সাধনাকে উদার প্রেম ও ভক্তি ভাবের মধ্যে মিলাইতে চাহিলেন তখন পণ্ডিতেরা বলিলেন, 'তুই তো নিরক্ষর মূর্খ! পণ্ডিতেরা যাহা পারিলেন না, তাহা তুই কি পারিবি?' কবীর বলিলেন, 'আমরা পণ্ডিত নহি বলিয়াই হয়তো পারিব। পণ্ডিতেরা পড়িয়া পড়িয়া পাথর বনিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা লিখিতে লিখিতে ঝামা ইঁট হইয়া গিয়াছেন। তাই দুই দলের ইঁটে পাথরে ঠোকাঠুকি হইলে আগুন জ্বলে। আমরা মূর্খ, আমরা হইলাম সহজ কাদামাটি। তাই হিন্দু কাদা মুসলমান কাদার সঙ্গে সহজে মিলিবে। কিন্তু মোল্লাতে পণ্ডিতে কখনও মিল হইবে না'।"

কবীরের গুরু সাধক রামানন্দ ছিলেন ব্রাহ্মণ। তিনি আচারপন্থী রামানুজদের সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও অন্তরের প্রেমভক্তির উপলব্ধিতে আচারের সমস্ত বেড়া ভেঙে বেরিয়ে এলেন। তাঁর স্বজাতি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তাঁকে ত্যাগ করলেও তাঁর ভক্ত কিছু ব্রাহ্মণ তো তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তবু তাঁর প্রধান শিষ্যরা হলেন— জোলা কবীর, মুচি রবিদাস, নাপিত সেনা, জাঠ ধন্না প্রমুখ। নারীকেও তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন।

রামানন্দের জীবনবাণীতে বাউলতত্ত্বের সার্থক প্রকাশ লক্ষণীয়। রামানন্দ

বলেছিলেন, আচার-অনুষ্ঠান বাইরের-দেবমন্দিরে কোনো সত্য নেই। ব্রহ্ম বা সত্য মনের মধ্যে। বেদে পুরাণে ঈশ্বরের সন্ধান বৃথা। রামানন্দ কবীরের প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞগণের তাত্ত্বিক গবেষণামূলক উক্তি-প্রত্যুক্তি উদ্ধৃত করার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত একটি কবিতার প্রতি দৃষ্টিপাতই যথেষ্ট :

রামানন্দ পেলেন গুরুর পদ
সারাদিন তাঁর কাটে জপে তপে
সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরকে ভোজ্য করেন নিবেদন,
তার পরে ভাঙে তাঁর উপবাস
যখন অন্তরে পান ঠাকুরের প্রসাদ।

সেদিন মন্দিরে উৎসব,
রাজা এলেন, রানী এলেন,
এলেন পণ্ডিতেরা দূর দূর থেকে
এলেন নানা চিহ্নধারী নানা সম্প্রদায়ের ভক্ত দল।
সন্ধ্যাবেলায় স্নান শেষ করে
রামানন্দ নৈবেদ্য দিলেন ঠাকুরের পায়ে,
প্রসাদ নামল না তাঁর অন্তরে,
আহার হল না সেদিন।

এমনি যখন দুই সন্ধ্যা গেল কেটে,
হৃদয় রইল শুষ্ক হয়ে,
গুরু বললেন মাটিতে ঠেকিয়ে মাথা,
'ঠাকুর, কী অপরাধ করেছি।'
ঠাকুর বললেন, আমার বাস কি কেবল বৈকুণ্ঠে।
সেদিন আমার মন্দিরে যারা প্রবেশ পায় নি
আমার স্পর্শ যে তাদের সর্বাঙ্গে,
আমারই পাদোদক নিয়ে
প্রাণপ্রবাহিনী বইছে তাদের শিরায়।
তাদের অপমান আমাকে বেজেছে,
আজ তোমার হাতের নৈবেদ্য অশুচি।'

'লোকস্থিতি রক্ষা করতে হবে যে প্রভু'—
বলে গুরু চেয়ে রইলেন ঠাকুরের মুখের দিকে।
ঠাকুরের চক্ষু দীপ্ত হয়ে উঠল, বললেন,
'যে লোকসৃষ্টি স্বয়ং আমার,
যার প্রাঙ্গণে সকল মানুষের নিমন্ত্রণ,
তার মধ্যে তোমার লোকস্থিতির বেড়া তুলে
আমার অধিকারে সীমা দিতে চাও
এতবড়ো স্পর্ধা।'

রামানন্দ বললেন, 'প্রভাতেই যাব এই সীমা ছেড়ে,
দেব আমার অহংকার দূর করে তোমার বিশ্বলোকে।'
তখন রাত্রি তিন প্রহর,
আকাশের তারাগুলি যেন ধ্যানমগ্ন,
গুরুর নিদ্রা গেল ভেঙে, শুনতে পেলেন,
'সময় হয়েছে ওঠো, প্রতিজ্ঞা পালন করো।'
রামানন্দ হাতজোড় করে বললেন, 'এখন রাত্রি গভীর,
পথ অন্ধকার, পাখীরা নীরব।
প্রভাতের অপেক্ষায় আছি।'
ঠাকুর বললেন, 'প্রভাত কি রাত্রির অবসানে।
যখনি চিত্ত জেগেছে, শুনেছ বাণী,
তখনি এসেছে প্রভাত।
যাও তোমার ব্রত পালনে।'
রামানন্দ বাহির হলেন পথে একাকী,
মাথার উপরে জাগে ধ্রুবতারা।
পার হয়ে গেলেন নগর, পার হয়ে গেলেন গ্রাম।
নদীতীরে শ্মশান, চণ্ডাল শবদাহে ব্যাপৃত।
রামানন্দ দুই হাত বাড়িয়ে তাকে নিলেন বক্ষে।
সে ভীত হয়ে বললে, 'প্রভু আমি চণ্ডাল, নাভা আমার নাম
হেয় আমার বৃত্তি,
অপরাধী করবেন না আমাকে।'
গুরু বললেন, 'অন্তরে আমি মৃত, অচেতন আমি,

তাই তোমাকে দেখতে পাইনি এতকাল,
তাই তোমাকেই আমার প্রয়োজন,
নইলে হবে না মৃতের সৎকার।'
চললেন গুরু আগিয়ে।
ভোরের পাখি উঠল ডেকে,
অরুণ আলোয় শুকতারা গেল মিলিয়ে।
কবীর বসেছেন তাঁর প্রাঙ্গণে,
কাপড় বুনছেন আর গান গাইছেন গুন গুন স্বরে
রামানন্দ বসলেন পাশে,
কণ্ঠ তাঁর ধরলেন জড়িয়ে।
কবীর ব্যস্ত হয়ে বললেন
'প্রভু' জাতিতে আমি মুসলমান,
আমি জোলা, নীচ আমার বৃত্তি।'
রামানন্দ বললেন, 'এতদিন তোমার সঙ্গ পাইনি বন্ধু,
তাই অন্তরে আমি নগ্ন,
চিত্ত আমার ধুলায় মলিন,
আজ 'আমি পরব শুচিবস্ত্র তোমার হাতে
আমার লজ্জা যাবে দূর হয়ে।'
শিষ্যেরা খুঁজতে খুঁজতে এল সেখানে
ধিক্কার দিয়ে বললে, 'এ কী করলেন প্রভু!'
রামানন্দ বললেন, 'আমার ঠাকুরকে এতদিন যেখানে হারিয়েছিলুম
আজ তাঁকে সেখানে পেয়েছি খুঁজে।'
সূর্য উঠল আকাশে।
আলো এসে পড়ল গুরুর আনন্দিত মুখে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে আমরা কি দেখিনি রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের হাতে প্রচলিত শাস্ত্রসমূহকেই শস্ত্রের মতো ব্যবহৃত হতে? সতীদাহ প্রথা রদ করার জন্য রামমোহনকে ও বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের জন্য বিদ্যাসাগরকে কি সেই শাস্ত্রেরই দ্বারস্থ হতে হয়নি, তন্ন তন্ন করে ঢুঁড়ে ফেলতে হয়নি সেইসব পুথির পর পুথির পাতা—যে শাস্ত্রগ্রন্থাদি ও পুথিপত্রের উল্লেখ-উদ্ধৃতির উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ব্যবহারের মাধ্যমে সতীদাহ ও বিধবা-নিগ্রহের মতো কুৎসিত মানবতা-বিরোধী কুসংস্কার চালু করেছিল সমাজ ও শাস্ত্রের অধিপতিশ্রেণী।

এ থেকেই স্পষ্ট, শোষণ অব্যাহত রাখার স্বার্থে সমাজের অধিপতিশ্রেণীকে শোষণের অনুকূল কিছু তাত্ত্বিক বচন ও বিধি ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে রচনা করতে হয়, যখন ও যেখানে তা-ও সম্ভব নয়, সেখানে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাষ্য রচনার জন্য আসবেন দ্রোণাচার্য-চাণক্যের মতো গুরু-পুরোহিতের দল। বেদ উপনিষদ-ব্রাহ্মণ-মহাভারত প্রভৃতি মূল গ্রন্থাদি পড়তে যাচ্ছেন বা পড়তে পারছেন আর ক-জন? সেগুলির পূর্ণাঙ্গ ভাষ্যরচনা করার মতো বিশিষ্ট ক্ষমতার অধিকারীই বা ক-জন? আর্থ-সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী সমাজের অন্যান্য দুর্বলতর অংশগুলি সহ অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা তো নিরক্ষর থাকতেই বাধ্য। কেননা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা ফতোয়া জারি করেই রেখেছেন, নারী ও শূদ্র প্রভৃতি বিদ্যাভ্যাস করলেই রাজ্যব্যাপী মহামারি-মড়কই পরিণাম!

ব্রাত্য তথা ব্রাহ্মণের জনসাধারণ প্রধানত বেদবিরোধী, বিশেষত যাগযজ্ঞ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক-বিরোধী। কেউ কেউ এঁদেরই চার্বাকের নামান্তর বলে গণ্য করে থাকেন। ভেবে দেখতে গেলে, এমত ধারণা ভুল নয়। কেননা, ভারতীয় দর্শন প্রধানত ভাববাদী। চার্বাক দর্শনই ব্যতিক্রম। বার্হস্পত্য তথা চার্বাক-অনুগামীরা স্বর্গ পরলোক আত্মা প্রভৃতিতে কানাকড়িও বিশ্বাসী নন। বর্ণাশ্রমাদির সমস্ত ক্রিয়াই বিফল, তাঁদের মতে। পরিদৃশ্যমান বস্তুবিশ্ব ও প্রত্যক্ষ বর্তমানই তাঁদের কাছে সত্য। ভস্মীভূত দেহ কোনোমতেই ফিরে আসতে পারে না। প্রেতকার্য প্রভৃতিও তাই নিরর্থক। বৃহস্পতি প্রবর্তিত দর্শনই আদি দর্শন। তাই চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন তিনটি দর্শনই নাস্তিক্যবাদের মর্মকথা ধারণ করে আছে। এ দিক থেকে চার্বাক দর্শনকেই পথিকৃৎ বলা যায়—'এ স্বাধীন চিন্তার পথিকৃৎ। চার্বাক বার্হস্পত্য, নাস্তিক ও লোকায়ত। এর দৃষ্টিতে পাপপুণ্য নেই, কর্মফল নেই, জন্মান্তর নেই—নেই ধর্মাধর্ম আর প্রত্যক্ষের বাইরে অন্য কিছু'।

'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' অন্বেষণকালে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপোক্তি, প্রায়-আত্মধিক্কার, মনে পড়ে যায়—'ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি'! রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি তাই, তাঁর তরুণ বয়স থেকেই, লোকায়ত। বস্তুত তিনিই প্রথম লোকসাহিত্যের প্রতি, ব্রাত্যজনের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের প্রতি তথাকথিত 'ভদ্রলোক'দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

আচার্য সুনীতিকুমার প্রাসঙ্গিকভাবে দেখিয়েছিলেন, বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে দু-রকমের উপাদানই জায়গা পেয়েছে—'Matter of Sanskrit' এবং 'Matter of Bengali' বাংলা সাহিত্যের এমনকী বাঙালির

সাহিত্যেরও আদি পর্ব থেকেই এই দ্বিবিধ উপাদানেরই সহাবস্থান যেমন লক্ষণীয়, তেমনি রবীন্দ্রসাহিত্যে তথা রবীন্দ্রভাবনায়ও আমরা গত শতাব্দীর শেষ দশকেই একটি আশ্চর্য ত্রিবেণীসংগম প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি—প্রায় সমকালেই তাঁকে ভাবিত হতে হয়েছিল—প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্য প্রসঙ্গে।

রবীন্দ্রদৃষ্টিতে সমগ্রতার চেতনা ও গতিশীলতার বোধ কী গভীরভাবেই-না সমন্বিত হতে পেরেছিল। বেদ-উপনিষদ-ব্রাহ্মণ থেকে মধ্যযুগের সন্তসাধকবর্গ পর্যন্ত—যাঁদের মধ্যে আছেন জাতিতে কসাই সদনা, দর্জি নামদেব, মুসলমান-বংশীয় জোলা কবীর, মুসলমান তুলা-ধুনকর রজ্জব প্রমুখ : কী অনায়াস রবীন্দ্রভাবনার সঞ্চরণ । মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকদের ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয়-সাধনার দুরূহতা তাঁর নজরে ছিল। রবীন্দ্রনাথ জানতেন, কী কঠিন দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার পরিণামে এই অসাধ্য সাধিত হয়েছিল। সেই দূরবগাহী চেতনাই তাঁকে বাউলের সাধনার সমীপবর্তী করেছিল। বাংলা ও বাঙালির প্রতিবাদী স্বাতন্ত্র্যসন্ধানের পাশাপাশি ভারতবর্ষীয় সাধনার ধারায় বাংলা ও বাঙালির অনায়াস অবগাহনের ক্ষেত্রেও ঊনবিংশ শতাব্দীর নব-জাগ্রত বঙ্গীয় মনীষার প্রতিনিধিরূপে বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ আপাত-বিস্ময়কর হলেও চলমান ইতিহাসেরই প্রত্যাশিত পরিণাম!

এই সূত্রে বিনম্র নিবেদন, আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে যাঁরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 'দলিত'-ভাবনার সূত্রপাত ঘোষণা করছেন, সেই 'দলিত'-পন্থীদের মনে রাখা ভালো—আশির দশকের সূচনা থেকেই এই ভাবনার বলিষ্ঠ প্রকাশ: বক্তব্যে ও রচনায়। এই প্রকাশের অব্যবহিত উপলক্ষ ছিল : পশ্চিমবঙ্গের নবাগত (১৯০১, জুন) বামফ্রন্ট সরকারের ভাষা ও শিক্ষানীতি। এই বিষয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ মুদ্রিত রচনা : 'এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে···' (দ্রষ্টব্য, যুবমানস, ফেব্রুয়ারি ১৯০১)। প্রবন্ধটির উপসংহার-অংশটিতে পুনশ্চ দৃষ্টিপাত বাঞ্ছনীয় :

'কিন্তু আজকের ভাবনা, দেশের অগণিত দরিদ্র, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্যদের নিয়েই। ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকুন তাঁরাই। তাঁরা সুদীর্ঘকাল বঞ্চিত, অচরিতার্থ। কখনও রাজা ও শাসকেরা তাঁদের বিদ্যানুশীলনে বিচলিত হয়ে তাঁদের মস্তক ছেদন করেছেন, কখনও শাসকগোষ্ঠীর বেতনভুক গুরুমশাইরা তাঁদের বিদ্যা আহরণের নৈপুণ্যে চমৎকৃত ও সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁদের সরল ভক্তির সুযোগে তাঁদের দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠটি ছিন্ন করতে বাধ্য করেছেন।

'সংখ্যাগরিষ্ঠ, শক্তিশালী, কল্পনাশীল ও কর্মযোগী হলেও শিক্ষার হাতিয়ার

না থাকায় এঁরা নিষ্ফলতায় চিরজর্জরিত। আজ একলব্যদের অক্ষত হাতে আধুনিক যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটিকে যদি তুলে দেওয়া যায়, তাঁরা সেই নতুন ভারতবর্ষ সৃষ্টি করবেন, যার স্বপ্ন দেখেছিলেন বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ!'

বস্তুত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় লেখক মূলকরাজ আনন্দ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন, রেনেসাঁস আন্দোলনে আমাদের আত্মসচেতন করে তোলাই রবীন্দ্রনাথের মহত্তম দান। সমগ্র জাতি হিসাবে আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায়, মানবসম্বন্ধের বৃহত্তর পটভূমিকায় জীবনের দিগন্তবিস্তারী আয়োজনে আমরা যে নিজেদের প্রতিমুহূর্তে রচনা করে চলেছি, আবহমানকালের ভারতবর্ষ যে জীবনচাঞ্চল্যে অস্থির, এই আলোড়নে প্রতিটি দেশবাসী যে সক্রিয়ভাবে যুক্ত, একথা রবীন্দ্রনাথই প্রথম আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন। প্রাচীন সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্যাস সহজ উত্তরাধিকারের মতো রবীন্দ্রনাথের আয়ত্ত হওয়ারই কথা. এতে মূলকরাজ আনন্দ বিস্ময় বোধ করেন না, কিন্তু 'উত্তরাধিকারের এত বিত্ত ও বৈভব সত্ত্বেও তিনি যে অন্তঃপ্রেরণার তাগিদে ক্ষীয়মাণ লোকসংস্কৃতির শীর্ণ ধারার দিকে ছুটে গিয়েছেন. পাশ্চাত্য আবেগ অনুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েও যে সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের মতো তার বহিরঙ্গরূপের কাছে আত্মবিক্রয় করেননি, এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব'।

পিরালি বা পতিত ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে দ্বিধাহীন চিত্তে আত্ম-পরিচয় দিলেন। ঘোষণা করলেন—

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছাল না।

এ হলো ১৯৩৬ সালের কথা। কিন্তু ১৯১০ সালেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

১৮ আষাঢ় (শনি, ২ জুলাই)—'হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে' (মাতৃ অভিষেক),

১৯ আষাঢ় (রবি, ৩ জুলাই)— 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন'(প্রণীত),

২০ আষাঢ় (সোম, ৪ জুলাই)— 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান' (অপমান)।

এই তিনটি কবিতা প্রসঙ্গে রবি-জীবনীকার লিখেছেন—'বর্তমান কাব্য-

ধারায় প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়'।

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন মনোভাব বহুলাংশে স্পষ্ট হতে পারে ২০ ও ২৯ আষাঢ় কাদম্বিনী দত্তকে লিখিত তাঁর দুটি চিঠি থেকে। ২০ আষাঢ় তারিখে লেখা চিঠির নিম্নোক্ত অংশ আক্ষরিকভাবেই প্রাসঙ্গিক :

'আমাদের দেশে ধর্মই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘটিয়েছে। আমরাই ভগবানের নাম করে পরস্পরকে ঘৃণা করেছি, স্ত্রীলোককে হত্যা করেছি, শিশুকে জলে ফেলেছি, বিধবাকে নিতান্তই অকারণে তৃষ্ণায় দগ্ধ করেছি, নিরীহ পশুদের বলিদান করেছি—এবং সকল প্রকার বুদ্ধি যুক্তিকে একেবারে লঙ্ঘন করে এমন সকল নিরর্থকতার সৃষ্টি করেছি যাতে মানুষকে মূঢ় করে ফেলে।··· কেন এমন হয়েছে?···আমরা কেবলি বলেছি, আমরা নিকৃষ্ট অধিকারী, আমরা পারি নে, বিশুদ্ধ সত্য, বিশুদ্ধ মঙ্গল আমাদের জন্যে নয়। অতএব আমাদের পক্ষে এই সমস্ত মুগ্ধ কল্পনাই ভালো। এমনি ধর্মকে সহজ করতে গিয়ে যে তাকে কেবলি নিচু করেছে তার আর উদ্ধারের উপায় নেই। ধর্মকে যে উপরে রেখেছে, ধর্ম তাকে উপরে টেনেছে—হিন্দু তা করে না। হিন্দু কেবলি বলেছে মেয়েদের জন্যে সর্বসাধারণের জন্যে এই রকম আটপৌরে মোটা ধর্ম দরকার—এই বলে সমস্ত দেশের বুদ্ধি ও আকাঙ্ক্ষাকে সেই মোটার দিকে ভারাক্রান্ত করে নেবে যেতে দিয়েছে। আর যাই হোক সাধনাকে নিচের দিকে নামতে দিলে কোনো মতেই চলবে না। কল্পনাকে, হৃদয়কে, বুদ্ধিকে, কর্মকে কেবলি মুক্তির অভিমুখে আকর্ষণ করতে হবে—তাকে কোনো কারণেই কোনো সুযোগের প্রলোভনেই ভুলিয়ে রাখতে হবে না। আমি নিজের জন্যে এবং দেশের জন্যে সেই মুক্তি চাই। মনে কোরো না সেই মুক্তি জ্ঞানের মধ্যেই মুক্তি—সে প্রেমের মধ্যে মুক্তি। তুমি মনে কোরো না প্রতিমা পূজা ছাড়া প্রেম হতেই পারে না—যদি সুফীদের প্রেমের সাধনার বিবরণ পড়ে থাক তবে দেখবে তাঁরা কি আশ্চর্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে কি অপরিসীম প্রেমের মিলন সাধন করিয়েছেন। তাঁদের সেই প্রেম কেবল একটা শূন্যভাবের জিনিস নয়, তা অত্যন্ত নিকট, অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ অথচ তার সঙ্গে কোনো প্রকার কাল্পনিক জঞ্জালের আবর্জনা নেই।'

কাদম্বিনীদেবী নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা রমণী। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিতে হিন্দুদেবতা ও আচার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য পড়ে তিনি দুঃখ পাওয়ায় ২৯ আষাঢ় শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন :

'তুমি যেখানে বেদনা পেয়েছ আমি যে সেখানে কোনো বেদনা অনুভব

করিনে তা মনেও কোরো না। আমাদের দেশে প্রচলিত পূজার্চনাবিধির মধ্যে এমন সুগভীর তত্ত্ব আছে যা বহুমূল্য। আমাদের দেশে যাঁরা মহাপুরুষ জন্মেছিলেন আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁরা আশ্চর্য সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এ সমস্তই আমি মানি কিন্তু আমার মনের সমস্ত শ্রদ্ধা সত্ত্বেও দেশব্যাপী দুর্গতি এবং তার কারণের কথা যখন ভাবি তখন কল্পনার ইন্দ্রজাল দিয়ে নিজেকে এবং অন্যাকে ভোলাবার প্রবৃত্তি একেবারেই চলে যায়।'

রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক দুটি চিঠি থেকে উদ্ধৃতির ব্যবহার করে রবি-জীবনীকার সঠিকভাবেই জানিয়েছেন :

"...এর মধ্যে আমরা গীতাঞ্জলি-র অনেক কবিতা বা গানের মানস-পটভূমিটি প্রসারিত দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ পত্রে বৈষ্ণব পদাবলী ও ধর্মতত্ত্ব এবং সুফীদের প্রেমসাধনার কথা উল্লেখ করেছেন—গীতাঞ্জলি-তে এই উভয় সাধনার প্রভাব অনুভব করা যায়। মহর্ষি বিখ্যাত সুফী কবি হাফেজ (১৩২০-৮৯)-এব ভক্ত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই অনুরাগ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। বহুদিন পরে পারস্যে গিয়ে তিনি বলেছিলেন : 'আমার পিতা ছিলেন হাফেজের অনুরাগী ভক্ত। তাঁর মুখ থেকে হাফেজের কবিতার আবৃত্তি ও তার অনুবাদ অনেক শুনেছি। সেই কবিতার মাধুর্য দিয়ে পারস্যের হৃদয় আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল।' এই সময়ে তিনি সুফী ধর্মতত্ত্ব নিয়েও কিছু পড়াশোনা করেছিলেন, হেমলতা দেবীর সাক্ষ্য থেকে তা জানা যায়।"

রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক দুটি পত্রাংশ থেকে এটুকু স্পষ্ট যে, ১৮ থেকে ২০ আষাঢ় পর্যন্ত তিনদিনে যে তিনটি কবিতা (মাতৃ-অভিষেক, প্রণতি ও অপমান) তিনি লিখেছিলেন, সেগুলির আকস্মিক তীব্রতা তিনি নিজেও ব্যাখ্যাযোগ্য বলে অনুভব করেছেন। পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অভিভবকারী প্রচণ্ড প্রভাবই তাঁর যে ভাববাদী আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছিল, তাঁরই ভাষায় তা তাঁকে 'জড়ায়ে আছে বাধা,/ছাড়ায়ে যেতে চাই,/ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে'। তাই তাঁকে বলতেই হচ্ছে, আধ্যাত্মিক সাধনা গভীরতা প্রভৃতি '...সমস্তই আমি মানি কিন্তু আমার মনের সমস্ত শ্রদ্ধা সত্ত্বেও দেশব্যাপী দুর্গতি এবং তার কারণের কথা যখন ভাবি তখন কল্পনার ইন্দ্রজাল দিয়ে নিজেকে এবং অন্যাকে ভোলাবার প্রবৃত্তি একেবারেই চলে যায়'!

অর্থাৎ এখানেও রবীন্দ্রমানসে সেই আইডিয়াল বনাম রিয়্যালের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম—যে-সংগ্রামে মননের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে প্রায়শ ভাববাদী মোহজাল

ছিন্ন হতে থাকে এবং কঠিন বাস্তব সত্যের অপ্রতিরোধ্য চাপে রবীন্দ্রনাথকে ঘৃণিত অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতেই হয়—

চরণে দলিত হয়ে
ধূলায় সে যায় বয়ে
সেই নিম্নে নেমে এসো নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ
অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান।

অতএব, বিস্ময় প্রকাশ অনুচিত, যখন পরিণত প্রজ্ঞার অধিকারী তিনি ঘোষণা করবেন—'আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন'।

ঠিক একই বাস্তব কারণে, 'দলিত সাহিত্য' কী ও কেন প্রসঙ্গে এবং দলিত সাহিত্যের প্রবল সমর্থনে সম্প্রতি যখন বিবিধ উদ্যোগ-আয়োজন লক্ষণীয় হচ্ছে তখন কোনো অজুহাতেই অনীহা বা ঔদাসীন্য আমাদের মানাবে না। পরিচিত বা প্রচলিত শাস্ত্রের সুবিধাবাদী ভাষ্য রচনা করেই হোক বা কোনো-না-কোনোভাবে বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমেই হোক, শাসক ও শোষকশ্রেণী যখন ধর্মের নামে জাতি ও বর্ণভেদ সৃষ্টি করে চলেছে, জাতের নামে বজ্জাতি যখন বল্গাহীন—তখন শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী শোষিত-দলিত মানুষ প্রতিবাদে-প্রতিরোধে সোচ্চার হবেন, এই বাস্তব পরিস্থিতি শুধু প্রত্যাশিত নয়, প্রথমত ও প্রধানত সেই পরিস্থিতিকে স্বাগত জানাতেই হবে।

বাংলায় দলিত সাহিত্য অবলম্বনে আন্দোলন সংগঠনের চেষ্টা এখনও সাম্প্রতিক বলেই নানা বিতর্কও এই পর্যায়ে প্রত্যাশিত। সুখের বিষয়, বাংলার শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে নতুন চেতনার সঞ্চার, বিস্তার ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রণী ভূমিকা এখানেও পথিকৃতের মর্যাদায় তথ্যের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সারা পশ্চিমবঙ্গে (সারা ভারতবর্ষের কথা স্পষ্টত জানা নেই) সর্বপ্রথম কলকাতার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ আয়োজিত উজ্জীবনী পাঠমালার উদ্যোগে এই গ্রন্থকার দলিত সাহিত্য শিরোনামে তিন ঘণ্টা ব্যাপী একটি বিতর্কমূলক আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করেছিলেন সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে। মারাঠি দলিত সাহিত্য, হিন্দি সাহিত্য ও বাংলা দলিত সাহিত্য প্রসঙ্গগুলি আলোচনার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল প্রাসঙ্গিক ভাষাসাহিত্যগুলিতে বিশেষজ্ঞ বক্তাদের। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও রাজ্যের বাইরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রতিনিধি বক্তারা যোগ দিয়েছিলেন সেই আলোচনাচক্রে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রগুলির একটিতে অল্পদিনের মধ্যে দলিত

সাহিত্য প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য এই যে, তখন তেমন সাড়া মেলেনি।

অতঃপর অল্পদিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে দলিত সাহিত্য অবলম্বনে একটি আন্দোলন গড়ে উঠেছে। কয়েকজন লেখক ও কিছু পত্র-পত্রিকার সাম্প্রতিক পরিচিতি সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। দলিত সাহিত্য প্রসঙ্গ সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য পরিচিতির প্রধান কারণ ঐকতান গবেষণা পত্রের ১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যার আত্মপ্রকাশ । সংখ্যাটি দলিত সাহিত্য: একটি বিতর্ক তথা দলিত সাহিত্য সংখ্যা রূপে চিহ্নিত।

যে-কোনো আন্দোলন বা তত্ত্ব আবির্ভাব-লগ্নে কম-বেশি 'অতিরেক'-এর শিকার হয়ে পড়ে। এই আতিশয্য বা বাড়াবাড়ি বেপরোয়া যৌব-ধর্মেরই বহিরঙ্গ লক্ষণ, পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত কলকাতা শহরের সজাগ বুদ্ধিজীবীমহলে দলিত সাহিত্যের প্রসঙ্গে চেতনার যে সঞ্চর ও ক্রমপ্রসার লক্ষণীয় হচ্ছে, সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে তার পরিমাপ এই মুহূর্তে তেমন পরিদৃশ্যমান না-হলেও দলিত সাহিত্য-বিষয়ক বিতর্কমূলক প্রস্তাবনার গুরুত্ব তাতে কিন্তু কিছুমাত্র কমে যাচ্ছে না।

আবির্ভাবলগ্নে 'অতিরেক'টুকু কোনো কোনো কঠোর সমালোচকের দৃষ্টিতে যদি বা ভর্ৎসনা বা তিরস্কারযোগ্য বলেও মনে হয়, তাও তেমন দোষাবহ বলতে পারব না। যেমন সম্পূর্ণ সমানুভূতিমূলক আত্মীয়তা সত্ত্বেও ঐকতান গবেষণা পত্রটির দলিত সাহিত্য সংখ্যায় সম্পাদকীয় নিবেদনের সংগত ঋজুতাও বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য—

"কেউবা প্রশ্ন তুলেছেন দলিত সাহিত্য কোন্ সাহিত্যকে বলবো? একি বাংলা সাহিত্যে 'বৈষ্ণব' বা 'শাক্ত' সাহিত্যের মতো, যেখানে ভারতীয় সমাজের বর্ণ বিভাজনের কারণে সামাজিক শোষণ ও লাঞ্ছনা রয়েছে সেই লাঞ্ছিত মানুষের কথা যে সাহিত্যের উপাদান—তাই দলিত সাহিত্য? বিশেষ করে আধুনিক সময়ে, ১৯০১-এ ঘোষিত তপশিলি জাতি ও আরো পরে সংযোজিত তপশিলি উপজাতি ও অতি সম্প্রতি সংযোজিত অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত মানুষদেরকে একত্রে 'দলিত' বলে যে বোঝানো হয়ে থাকে—এই সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে পেছিয়ে-পড়া মানুষেরাই কি কেবল দলিত? এককালে যারা সামাজিকভাবে উঁচু ছিলেন কিন্তু এখন অর্থনৈতিকভাবে ও সামাজিকভাবেও নিঃস্ব, এমন কোনো দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষ কি এই সাহিত্য বৃত্তে আসবে না? আমরা মনে করি আসবে। এটা ঐকতানের মত।"

এই নিবেদনেরই পূর্ববর্তী একটি অনুচ্ছেদে আছে—'কেউ বা দলিত সাহিত্য শব্দটাই মানেন না। তাঁরা বলেছে ভারতীয় বৈদিক অনুশাসনভিত্তিক সমাজ-বিন্যাসে তা হতে পারে ব্রাত্য সাহিত্য। বেদ যাঁদের অধিকার স্বীকার করেনি তাঁরাই ব্রাত্য। তাঁদের আনন্দ বেদনার কথাই ব্রাত্য সাহিত্যের উপজীব্য'।

এখানে সম্ভবত সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটির অন্তর্গত 'অথাতো ব্রাত্যজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধটির কথাই বলা হয়েছে। বস্তুত বহু বিশিষ্ট লেখকের রচনাসমৃদ্ধ এই সংখ্যাটিতে নানা কারণে এই রচনাটিই সর্বাধিক স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত।

এই রচনাটিতে লেখক যুক্তিসংগত-ভাবেই প্রতিপাদন করতে পেরেছেন যে, কোনো দিক থেকেই 'দলিত' নামটির প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নয়। এমনকী 'দলিত' নামটি আত্মমর্যাদার পরিপন্থী এবং ড. আম্বেদকরের বক্তব্য অনুসরণ করতে চাইলে 'সাহিত্যের আগে দলিত শব্দটি অচল'। আমেরিকার নিগ্রোদের সঙ্গে দলিতপন্থীরা নিজেদের যে তুলনা করেছেন তাও বস্তুত অবান্তর। ড. অনিল বিশ্বাস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, 'দলিত অবশ্যই বর্জনীয় এবং সাহিত্যে তার আমদানি স্বভাবতই নিষিদ্ধ'।

ড. বিশ্বাসের মতে, 'ব্রাত্য' শব্দটি সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য। তিনি মনে করেন, 'নতুন যুগের সাহিত্যে সমাজবাদী বাস্তবতাই বিশেষভাবে জরুরি'। তা ছাড়া ব্রাত্য সাহিত্যে থাকবে সচেতন ঐতিহাসিক বোধ। থাকবে দ্বান্দ্বিকতা ও মানবিকতা। এ সাহিত্য হবে ব্রাত্যজনের, ব্রাত্যজনের জন্যে। তবে এর কর্মকর্তা হবেন প্রথমে ব্রাত্য লেখকবৃন্দ বা কলাবিদেরা। অন্য লেখকরাও এতে যোগ দিতে পারেন। ব্রাত্য সাহিত্যের লেখকেরা শুধু সাহিত্যসৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ থাকবেন না, তাঁদের যোগ দিতে হবে সংগ্রামে। আর এই ব্রাত্য জমানা শুরু হবে ১৯০১ সাল থেকে।

ড. বিশ্বাসের বক্তব্যের দুর্বল অংশটি এখানেই নিহিত। ব্রাত্যজনের সাহিত্য যেমন রচনা করতে পারবেন ব্রাত্য লেখকবৃন্দ ছাড়াও অন্যান্য লেখকেরা, তেমনি তা নিশ্চয়ই সকলেরই পাঠোপযোগী হবে। কিন্তু ব্রাত্যসাহিত্য রচিত শুধু ব্রাত্যজনের জন্য, এই অভিমতটি যুক্তিসিদ্ধ নয়। ব্রাত্যজমানা শুরুর বৎসর নির্দেশ করেছেন লেখক—১৯০১ সাল। এরই বা যুক্তি কী? 'ব্রাত্য' শব্দটির প্রতি ড. বিশ্বাসের আসক্তি যতটা, যুক্তির ভিত্তি ততটাই শিথিল। কেননা তিনি অন্তত দু-বার বলেছেন :

১. এই 'ব্রাত্য' শব্দটি বৈদিক।

২. 'ব্রাত্য' নামটি চলতে পারে—এর আছে বৈদিক কৌলীন্য।

ফলে ব্রাত্য সাহিত্য নতুন যুগের সঙ্গে খাপ খায়। 'ব্রাত্য' নামকরণের সপক্ষে প্রদত্ত এই বৈদিক যুক্তিটিই ড. বিশ্বাসের সর্বাধিক আযৌক্তিক উক্তি।

বস্তুত 'দলিত' শব্দটি যদি গ্রহণযোগ্য না-হয়, তাহলে 'ব্রাত্য' শব্দটিরও কোনো বাড়তি শিরোপা প্রাপ্য হতে পারে না। 'বৈদিক' হলেও নয়।

ড. বিশ্বাস সমাজনিষ্ঠ বাস্তবতা অর্থাৎ সোস্যালিস্ট রিয়্যালিজম কাঙ্ক্ষিত বলে মনে করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করেন, এই সমাজনিষ্ঠ বাস্তবতার 'প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সোভিয়েত মুলুকে তিরিশের দশকে। এর প্রথম নিদর্শন মেলে গোর্কির 'মা' (১৯০৭) উপন্যাসে। এ দু'টি মতের উপর দাঁড়িয়ে আছে। একটি হলো ফয়েরবাখের (১৮০৪-৭২) উপর মার্কসের একাদশ মত : 'দার্শনিকরা শুধুমাত্র ব্যাখ্যান দিয়েছেন বিভিন্ন উপায়ে : তবে আসল ব্যাপার হলো এর পরিবর্তন ঘটানো', দ্বিতীয়টি লেনিনের প্রতিফলন মতবাদ, যাকে বলা হয় 'জ্ঞানের বস্তুবাদী মতাদর্শের প্রাণ।' প্রথমটির তাৎপর্য হলো এই যে বাস্তবের সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক হবে সক্রিয় ও ইতিবাচক। অর্থাৎ কিনা লেখক শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয় বর্ণনায় আবদ্ধ থাকবেন না—তিনি আনবেন সমাজবাস্তবের পরিবর্তন। সাহিত্যের কাজ হ'লো 'জীবন যা হওয়া উচিত' তারই সম্বর্ধন, এখানে আছে 'ঔচিত্যনীতি' অন্যদিকে থাকবে প্রতিফলন মতাদর্শ। যাতে প্রকাশ পায় 'জীবন যা আছে' তাই, এ বাস্তবের তন্ময় উপস্থাপন। তবে ব্রাত্য সাহিত্য হবে সোভিয়েত সমাজনিষ্ঠ বাস্তবতার পরিবর্তন। অর্থাৎ ভারতীয় কাঠামোয় সোভিয়েত উদাহরণের হবে রূপান্তর'।

ব্রাত্যসাহিত্যের স্বরূপ-লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশকালে মার্কস ও লেনিনের উল্লেখ তথা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রযোজ্যতা ঘোষণায় ড. বিশ্বাস সুস্পষ্ট। তাঁরই মতো দলিত সাহিত্যের আরও অনেক প্রবক্তাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ও ভাষায় (প্রসঙ্গত, দলিত সাহিত্য বিষয়ক ইস্তেহারেও) কখনও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, কখনও সাম্যবাদ, কখনও শ্রেণীহীন সমাজ, ভাষান্তরে কখনও সর্বপ্রকার শোষণ-পীড়নহীন সমাজ গঠনের কথা, প্রায়শ প্রতিবাদী, বিদ্রোহী, সংগ্রামী প্রত্যয়ের পাশাপাশি বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সংকল্প ঘোষণা করে থাকেন। বস্তুত, দলিত সাহিত্যের প্রবক্তাগণের ঘোষিত এই সমস্ত প্রত্যয় ও সংকল্পের প্রেরণারূপে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সঙ্গে তাঁদের কমবেশি পরিচয়েরও আভাস পাওয়া যায়।

সেইজন্যই, দলিত (বা ব্রাত্য) সাহিত্যের প্রবক্তাদের বক্তব্যের স্পষ্ট,

অনুপুঙ্খ ও সামগ্রিক পরিচয় যদি গ্রহণ করতে হয়, তা হলে শিল্প-সাহিত্য তথা সংস্কৃতি প্রসঙ্গে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সম্যক ধারণা থাকতেই হবে। নানা কারণে মার্কস-লেনিন বা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উল্লেখ ও উদ্ধৃতি সম্প্রতি যত অনায়াস ও অবিরল, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বোধ প্রায় ততটাই দুরধিগম্য হয়ে উঠেছে।

তাই, লেনিন-অবলম্বনে শিল্প-সাহিত্য তথা সংস্কৃতি বিষয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য অনুধাবন অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

লেনিনকে অবলম্বন করেই সংস্কৃতির সর্বাধিক গভীর, সামগ্রিক, বৈজ্ঞানিক ও যথাযথ সংজ্ঞা ও বিবরণ পেতে পারি আমরা। কারণ, লেনিন সংস্কৃতির অর্থাৎ প্রলেতারীয় সংস্কৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছিলেন মার্কসকে অবলম্বন করে এবং মার্কসবাদের উৎস অন্বেষণকালে। শুধু তাই নয়, তথাকথিত প্রলেতারীয় সংস্কৃতির ধ্বজাধারীদের সাংস্কৃতিক স্বেচ্ছাচারিতাকে ধিক্কৃত করতে গিয়েও লেনিনকে যথার্থ প্রলেতারীয় সংস্কৃতির স্বরূপটা বুঝিয়ে দিতে হয়েছিল।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা অবশ্যই জানবেন, সংস্কৃতির উদার ও যথাযথ, গভীর ও বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা ও ভাষ্য রচনা করতে পেরেছে মানবসভ্যতার ইতিহাসে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। সংস্কৃতির নানা পণ্ডিতি ও প্রচলিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সারকথাগুলি সমস্তই পাওয়া যাবে সংস্কৃতির মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বক্তব্য-দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই। প্রচলিত সেইসব কেতাবি সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা বিবরণ থেকে স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত 'প্রলেতারীয় সংস্কৃতি'র পরিচয় গ্রহণ করতে হবে আমাদের।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, 'সংস্কৃতি'র আগে 'প্রলেতারীয়' শব্দটি বসিয়ে দিলে অর্থাৎ 'প্রলেতারীয়' সংস্কৃতিকেই যথার্থ সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করতে চাইলে দুনিয়ার যাবতীয় কায়েমি স্বার্থবাদীরা প্রচণ্ড প্রতিবাদস্পৃহায় ফেটে পড়বেন এবং তথাকথিত মার্কসবাদী তথা বামপন্থীদের মধ্যে অনেকে মনে মনে রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। অবশ্য বুর্জোয়া ভাবধারার লেখক-বুদ্ধিজীবীরাও কখনও কখনও কৌশলগত কারণে শুধু শব্দ হিসেবে প্রলেতারীয় সংস্কৃতির ব্যবহার মেনে নিতে পারেন। দায়ে পড়লে, বিভ্রান্তি সৃষ্টির অতি সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে অথবা সত্যিই বিভ্রান্ত হয়ে এমন লেখক-বুদ্ধিজীবীরা অনেকসময়েই মার্কস-লেনিন-গোর্কির অবিরল উদ্ধৃত ও মার্কসীয় 'টার্ম'গুলি ব্যবহার করে থাকেন। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে ভালো পরিচয় না-থাকলে সাধারণ পাঠক এই জাতীয় রচনাপাঠে বিভ্রান্ত হতে

পারেন। এই ধরনের রচনার লেখকরা মার্কস-লেনিন ও গোর্কি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে, বেশ-কিছু কেতাবি বুলি ব্যবহার করে নিজেদের সম্পূর্ণ মার্কসবাদ-লেনিনবাদবিরোধী বক্তব্য ও সিদ্ধান্তগুলিকেও সাধারণ পাঠকদের কাছে প্রতীতিযোগ্য করে তুলতে চান। বলাই বাহুল্য, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারা প্রসঙ্গে অজ্ঞতা বা বিরুদ্ধতা অথবা দু-ই থেকেই কায়েমি স্বার্থের পরিপোষকবৃন্দ যেমন, তেমনই তথাকথিত বামপন্থীরাও এই জাতীয় রচনা বা কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারেন। হয়েও থাকেন।

কিন্তু 'প্রলেতারীয় সংস্কৃতি'ই যে যথার্থ সংস্কৃতি আর 'প্রলেতারীয় সংস্কৃতি' শব্দযুগল ব্যবহারের সংকোচ তো দূরের কথা, সেটাই যথাযথ ও গৌরবো-দ্দীপক, এই সত্যটি অত্যন্ত দ্রুত ও গভীরভাবে অনুভব করতে হবে।

'প্রলেতারীয় সংস্কৃতি' অর্থাৎ 'সংস্কৃতি' বলতে কী বুঝতে হবে এবং কী বুঝতে হবে না, সে-বিষয়ে বিপ্লবের পরেও লেনিনকে বারবার লেখনী ধারণ করতে হয়েছিল। এবং একই মূলকথা বারবার উচ্চারণ করতে হয়েছিল। এ থেকেই বুঝতে পারি, সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গটিকে কী গভীর গুরুত্ব ও তাৎপর্যের সঙ্গে দেখতেন লেনিন।

বয়স্ক-শিক্ষার প্রথম সারা রুশ কংগ্রেস-এ (৬ মে, ১৯১৯) প্রদত্ত ভাষণে লেনিন বয়স্ক শিক্ষার প্রসারে প্রতিবন্ধকতার অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন—'…বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের প্রাচুর্য, যারা নতুন ধারায় গঠিত শ্রমিক ও কৃষকদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে অতি প্রায়শই ধরে নিয়েছে দর্শন ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত স্বকপোলকল্পনার অতি অনুকূল ক্ষেত্র হিসাবে, যেখানে অতি প্রায়শই একান্ত বিদ্‌ঘুটে মুখভঙ্গিকেই চালানো হয় নতুন কিছু বলে এবং বিশুদ্ধ প্রলেতারীয় শিল্প ও প্রলেতারীয় সংস্কৃতির নামে হাজির করা হয় এমন কিছু যা অস্বাভাবিক ও উৎকট।'

দেড় বছর যেতে-না-যেতেই ২ অক্টোবর ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে প্রদত্ত 'যুব লিগের কর্তব্য' ভাষণে লেনিন বললেন—'প্রলেতারীয় সংস্কৃতি এমন একটা কিছু নয় যা কোত্থেকে উঠেছে কেউ জানেন না, যাঁরা নিজেদের প্রলেতারীয় সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ বলে অভিহিত করেন, তাঁদের স্বকপোলকল্পিত উদ্ভাবন তা নয়। ওটা একেবারে বাজে কথা।'

এই দুটি উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় ভাষণেই দেখা যাচ্ছে, প্রলেতারীয় সংস্কৃতি কী তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেনিন সমপরিমাণেই জোর দিচ্ছেন, প্রলেতারীয় সংস্কৃতি কী নয়, সেটাও বুঝিয়ে বলতে।

লেনিনের এই ঝোঁক ও ব্যগ্রতা অকারণ ছিল না। বুর্জোয়াদের পতন ঘটলেও অথবা তারা ক্ষমতাচ্যুত কোণঠাসা হলেও সহসা নিঃশেষিত হয় না। এমনকী তারা দৃশ্যত নিঃশেষিত হওয়ার পরেও বুর্জোয়া অভ্যাস ও সংস্কারগুলি দীর্ঘ ব্যবহারেও বিলুপ্ত হয়ে যায় না।

প্রলেতারীয় সংস্কৃতির 'নাম'-ধারী, মার্কসীয় মতবাদের পবিত্র নামাবলি-ভূষিত কিন্তু কার্যত মার্কসবাদ-বিরোধী মতবাদের কথাও তাঁর ভাষণগুলিতে বলেছেন লেনিন। 'প্রলেতকালত' বা সাংস্কৃতিক শিক্ষামূলক সংস্থাটি ছিল সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েতের স্বাধীন কার্যকলাপের স্বেচ্ছামূলক সংগঠন হিসাবে। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সংগঠিত আকারে প্রলেতকালত দেখা দেয়। অক্টোবর বিপ্লবের পরে এর নেতৃত্ব চলে যায় বগদানভ ও তাঁর সমর্থকদের হাতে। তাঁরা উত্তরোত্তর আরও বেশি-বেশি স্বাধীনতা দাবি করতে থাকেন। কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে ওঁরা ক্রমশ দাঁড়াতে থাকেন।

এই সুযোগে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের অনুপ্রবেশ প্রলেতকালত-এ ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং তাঁরাও নিজেদের প্রভাব খাটাতে থাকেন। প্রলেতকালত-এর সদস্যরা অতীতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে থাকেন, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কর্মসূচি রূপায়ণে দারুণ অবহেলা দেখান, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং একটা 'বিশেষ প্রলেতারীয় সংস্কৃতি' পত্তন করার উদ্দেশ্যে উঠে-পড়ে লেগে যান। প্রলেতকালত-এর প্রধান তাত্ত্বিক বগ্‌দানভ মার্কসবাদের প্রতি ওপরে-ওপরে মৌখিক একটি আনুগত্য দেখালেও আসলে আত্মগত ভাববাদের তত্ত্বই প্রচার করতেন। বুর্জোয়া লেখক-বুদ্ধিজীবীরা 'প্রলেতকালত'-এর অনেক সংস্থায় কর্তৃত্ব করলেও সাংস্কৃতিক নির্মাণকর্মে আন্তরিক তরুণ শ্রমিকরাও এতে ছিলেন। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে প্রলেতকালত-এর সবচেয়ে বাড়বাড়ন্ত দেখা গিয়েছিল। বিশের দশকের গোড়ায় অবক্ষয় দেখা দিলেও ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের আগে প্রলেতকালত বিলুপ্ত হয়নি।

স্বভাবতই, ১৯১৯-২০ খ্রীস্টাব্দের কালপর্যায়ে লেনিনকে সংস্কৃতি প্রসঙ্গে বিশেষ মনঃসংযোগ করতে হয়েছিল এবং প্রলেতারীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য নিরূপণ করতে গিয়ে মার্কসবাদের নামাবলি-শোভিত মার্কসবাদ-বিরোধীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের দায়িত্বও গ্রহণ করতে হয়েছিল।

মার্কসবাদের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় প্রসঙ্গে লেনিন বলেছিলেন, মার্কসের শিক্ষা কী

করে সর্বাধিক বিপ্লবী শ্রেণীর লক্ষ কোটি মানুষের হৃদয় অধিকার করতে পারল, এ প্রশ্নের একটিই জবাব : কারণ, পুঁজিবাদের অধীনে সঞ্চিত জ্ঞানের পাকা বনিয়াদের উপরেই মার্কস দাঁড়িয়েছিলেন। মানবসমাজ ও মনুষ্যচিন্তা যা-কিছু সৃষ্টি করেছিল, তা সবই তিনি বিচার করে ঢেলে সাজান, একটি পয়েন্টও উপেক্ষা করেননি। এই প্রসঙ্গেই লেনিন প্রলেতারীয় সংস্কৃতির সংজ্ঞা-নির্ধারণ করতে গিয়ে বললেন :

'···মানবজাতির সমগ্র বিকাশের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট সংস্কৃতির যথাযথ জ্ঞান লাভ করেই এবং সেই সংস্কৃতিকে ঢেলে সেজেই কেবল আমরা প্রলেতারীয় সংস্কৃতি গড়তে পারি—এ কথা যদি আমরা না বুঝি তাহলে সমস্যার সমাধান করতে পারব না।···পুঁজিবাদী সমাজ, জমিদারী সমাজ, আমলাতন্ত্রী সমাজের জোয়ালের নিচে মানবজাতি যে জ্ঞান-ভাণ্ডার জমিয়েছে, প্রলেতারীয় সংস্কৃতিকে হতে হবে তারই সুনিয়মিত বিকাশ।'

সংস্কৃতির অর্থাৎ প্রলেতারীয় সংস্কৃতির শুধু বৈশিষ্ট্য নয়, তার লক্ষ্য পর্যন্ত নিরূপণ করে লেনিন পরবর্তী বাক্যটিতে যা বলেছিলেন তা এড়িয়ে গেলে চলবে না--'মার্কসের হাতে ঢেলে সাজা অর্থশাস্ত্র যেমন আমাদের দেখিয়েছে, মানবসমাজকে কোথায় যেতে হবে, অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে শ্রেণীসংগ্রামে উত্তরণে, প্রলেতারীয় বিপ্লব শুরুর দিকে, ঠিক তেমনিভাবেই এই সমস্ত পথ ও রাস্তা পৌছেছে, পৌছায় ও পৌছাচ্ছে প্রলেতরীয় সংস্কৃতিতে'।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ২ অক্টোবর রুশ যুব কমিউনিস্ট লিগের সভায় প্রদত্ত ভাষণে প্রলেতকালত-এর প্রসঙ্গনির্দেশ এবং প্রকৃত প্রলেতারীয় সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যনির্ধারণ লেনিনের কাছে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। কারণ, ওই বছরেই (১৯২০) ৫ অক্টোবর থেকে প্রথম সারা রুশ প্রলেতকালত কংগ্রেস মস্কোয় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঠিক দু-দিন পরেই।

সুতরাং প্রলেতকালত ও প্রলেতারীয় সংস্কৃতির প্রকৃত সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ের প্রসঙ্গটি লেনিনের চিন্তায় ওই সময়ে বিশেষ অগ্রাধিকার পাওয়ারই কথা।

প্রলেতকালত কংগ্রেসে লুনাচারস্কি বক্তৃতা করবেন। তিনি কী বলবেন সেখানে? লেনিনের সঙ্গে তাঁর এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বক্তব্য সম্পর্কে দুজনেই একমত হন। কিন্তু ৮ অক্টোবরের ইজভেস্তিয়ায় তাঁর ভাষণের বিবরণ পাঠ করে লেনিন দেখতে পান, লুনাচারস্কির বক্তব্য বলে যা কাগজে বেরিয়েছে, ওঁদের দুজনের আলোচিত সিদ্ধান্ত থেকে তা সম্পূর্ণ বিরোধী, একেবারে উলটো। লুনাচারস্কিকে ডেকে পাঠান লেনিন এবং তাঁর সঙ্গে কথা

বলে জানতে পারেন, লুনাচারস্কি তাঁর বক্তব্য দৃঢ় ও সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থিত না-করে একটু নরম সুরে, প্রলেতকালতওয়ালাদের সঙ্গে সমঝোতার সুরে পেশ করেন এবং ভলাদিমির ইলিচের কাছে তাঁর বক্তৃতার প্রেরিত ভাষ্য ছিল আরও নরম সুরে বাঁধা।

যা-ই হোক, লেনিন সংস্কৃতির প্রসঙ্গটিকে কতটা গুরুত্ব দিতেন (কেন দিতেন, এই অধ্যায়ের মনোযোগী পাঠকমাত্রই তা অনুভব করবেন), তা বুঝতে পারা যায়, যখন দেখি ৮ অক্টোবরের ইজভেস্তিয়া পড়েই তৎক্ষণাৎ তিনি 'প্রলেতারীয় সংস্কৃতি প্রসঙ্গে' শিরোনাম দিয়ে পাঁচটি সূত্রে গ্রথিত একটি খসড়া প্রস্তাব রচনা করে ফেলেন। চলতি প্রলেতকালত কংগ্রেসেই এই খসড়া প্রস্তাব তুলতে ও ভোটে দিতেই হবে। তার আগে ওই খসড়া প্রস্তাব সম্পর্কে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন নিতে হবে। সর্বশেষে সোভিয়েতের জনশিক্ষা কমিসারিয়েট এবং প্রলেতকালত কংগ্রেস-উভয়েরই সম্মতি প্রয়োজন।

সমগ্র বিষয়টিকে, লেনিনের ভাষায় 'আটমোস্ট আরজেন্সি'র সঙ্গে দেখতে হবে। লেনিন রচিত 'প্রলেতারীয় সংস্কৃতি প্রসঙ্গে' পাঁচটি সূত্রে গ্রথিত খসড়া প্রস্তাবটি সেন্ট্রাল কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরো কর্তৃক আলোচিত ও অনুমোদিত হয়। প্রলেতকালত কংগ্রেসও খসড়া প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে।

কিন্তু কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পরেও প্রলেতকালত-এর কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি গৃহীত প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করতে থাকেন এবং তার চেয়েও যা মারাত্মক, সংস্কৃতিকর্মীদের কাছে প্রস্তাবগুলির অপভাষ্য প্রচার করতে থাকেন—কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ ও কুৎসা রটনা করতে থাকেন যে কেন্দ্রীয় কমিটি শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষকে পিছনে বেঁধে রাখতে এবং প্রলেতকালতকে ভেঙে দিতে চাইছে। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ১ ডিসেম্বরের ২৭০ সংখ্যক প্রাভদা-য় এইসব ধরতাই বুলিকে খণ্ডন ও প্রলেতকালত-এর কাণ্ড-কারখানা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশ্লেষণ করে লেখা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি প্রকাশিত হয়।

প্রলেতারীয় সংস্কৃতি প্রসঙ্গে ভলাদিমির ইলিচ যে-পাঁচটি খসড়া সিদ্ধান্ত রচনা করেন ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ৮ অক্টোবর, সেগুলির ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত অর্থাৎ দেশকাল-প্রসঙ্গ আমরা সযত্নে আক্ষরিকভাবেই বিশ্লেষণ করেছি।

সাম্প্রতিক ইতিহাস এবং বিশেষ করে 'কমিউনিস্ট ইস্তেহারে'র আবির্ভাবের সময় থেকে বিশ্বের সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়েতের থেকে বিশ্বের সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়েতের প্রায় সার্ধশতাব্দী বছরের বিপ্লবী সংগ্রামের সমগ্র

অভিজ্ঞতায় তর্কাতীতরূপে প্রমাণ হয়েছে যে, কেবল মার্কসবাদের বিশ্বধ্যানই হল বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ, দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কৃতির সঠিক অভিব্যক্তি (খসড়া সিদ্ধান্তের তৃতীয় সূত্র)। এবং বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের ভাবাদর্শ হিসাবে মার্কসবাদ বিশ্ব-ঐতিহাসিক তাৎপর্য অর্জন করেছে এই জন্য যে, মার্কসবাদ কখনোই বুর্জোয়া যুগের মূল্যবান সংস্কৃতিকে বিসর্জন দেয়নি, পক্ষান্তরে মানবচিন্তা ও সংস্কৃতির দুই সহস্রাধিক বছরের বিকাশের মধ্যে যা-কিছু মূল্যবান ছিল, সেই সমস্তই আত্মস্থ করেছে ও ঢেলে সেজেছে। এই ভিত্তিতেই ও এই ধারাতেই সর্ববিধ শোষণের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের শেষ সংগ্রামস্বরূপ তার একনায়কত্বের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় অনুপ্রাণিত হয়ে আরও যে কাজ চলবে, তাকেই সত্যকার প্রলেতারীয় সংস্কৃতির বিকাশ বলে স্বীকার করা যায় (খসড়া সিদ্ধান্তের চতুর্থ সূত্র)।

সর্বোপরি, এই অধ্যায়ের নির্গলিতার্থ : সর্বহারার সংস্কৃতিই সর্বোৎকৃষ্ট কেন, লেনিনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আলোকেই তা বুঝে নেওয়া। আসল কথা, লেনিন যেমন বলেছেন, সর্বহারার সংস্কৃতি তো আকাশ থেকে পড়েনি। মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির, এককথায় মানবচিন্তার দুই সহস্রাধিক বছরের বিকাশের মধ্যে যা উৎকৃষ্ট, প্রত্যেকযুগের সবচেয়ে সেরা অংশগুলিকে আত্মস্থ করে এবং সেগুলিকে ঢেলে সাজিয়েই সর্বহারার যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তা-ই তো সর্বোৎকৃষ্ট হবে? বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করাই লক্ষ্য হলেও বুর্জোয়া যুগের মূল্যবান সুকৃতিও বর্জন করেনি, তাকেও যথাযথ মূল্যে আত্মস্থ করে নিয়ে ঢেলে সাজিয়েছে সর্বহারার সংস্কৃতি। এইসব বাস্তব ও ঐতিহাসিক কারণেই সর্বহারার সংস্কৃতিই সর্বোৎকৃষ্ট।

যে-নামেই ডাকা যাক, প্রলেতারীয় বা প্রগতি বা দলিত বা ব্রাত্য শিল্প-সাহিত্য তথা সংস্কৃতির স্বরূপ-লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যগুলি মূলত অভিন্ন। 'টার্ম'-হিসাবে কোনটি কার ব্যক্তিগতভাবে মনঃপূত, সেটা আদৌ কোনো গভীর সমস্যাই নয়। দলিত আন্দোলন-প্রসূত দলিত সাহিত্যকে আক্ষরিক অর্থ ধরে কেউ-কেউ সাম্প্রতিক বলে মনে করতে প্ররোচিত হলেও ইতিহাসচেতনার আলোয় দলিত সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য আছেই। সেই ইতিবাচক ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করেই বিষয়টি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

'একজিসটেনশিয়ালিজম' খুব পুরানো কোনো 'টার্ম' নয়, কিন্তু সফোক্লিস থেকে শেকস্‌পিয়ার—মহৎ স্রষ্টাদের সৃষ্টিকর্মে অস্তিত্ববাদী জীবন-চৈতন্যের

সন্ধান পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচকবৃন্দ করেই থাকেন।

সুতরাং, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের সুমহান ঐতিহ্যের পাশাপাশি এদেশেও বেদ-উপনিষদ-ব্রাহ্মণ থেকে চর্যা সহ প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য, বাউল-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-প্রেমচন্দ্র-নজরুল-মানিক-অদ্বৈত মল্লবর্মন-সুকান্ত—অগণিত সৃষ্টি ও স্রষ্টার উল্লেখ সম্ভব, দৃষ্টান্তও অবিরল—লাঞ্ছিত-শোষিত মানুষের প্রতিবাদী উচ্চারণ অশ্রুত থাকেনি, থাকে না।

ব্যাপারটা কোনোমতেই এমন নয় যে, 'আমি এলেম, ভাঙলো তোমার ঘুম···'! যিনি যত বড়ো পণ্ডিত, জ্ঞানী বা মহাপুরুষ হোন-না-কেন, অথবা, যিনি নিজেকে যা-ই ভাবুন-না-কেন, তিনিই অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষই পথিকৃৎ, বিষয়টি তেমনভাবে দেখাটা না-হবে ঐতিহাসিক, না-হবে বস্তুনিষ্ঠ অথবা বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠ কোনো দাবি।

সময়ের দাবিতে ইতিহাস কথা বলে ওঠে।

একটি-দুটি ঘটনাও, যত বড়ো ঘটনাই হোক-না-কেন, একটি কোনো মহৎ ইতিহাস চেতনার জনকত্ব দাবি করতে পারে না। বলা যায়, 'Series of Events'—'ঘটনার মালা···' স্ফুরিত করে সময়ের দাবি।

লেনিন বলেছেন বলেই নয়, তাঁর এই বক্তব্য যুক্তিনিষ্ঠ বলেই মান্য যে, পুঁজিবাদের অধীনে সঞ্চিত জ্ঞানের পাকা বনিয়াদের উপরেই মার্কস দাঁড়িয়ে-ছিলেন। মানবসমাজ ও মনুষ্যচিন্তা যা-কিছু সৃষ্টি করেছিল, তা সবই তিনি বিচার করে ঢেলে সাজান, একটি পয়েন্টও উপেক্ষা করেননি।

'···মানবজাতির সমগ্র বিকাশের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট সংস্কৃতির যথাযথ জ্ঞান লাভ করেই এবং সেই সংস্কৃতিকে ঢেলে সেজেই কেবল আমরা প্রলেতারীয় সংস্কৃতি গড়তে পারি—এ কথা যদি আমরা না বুঝি তাহলে সমস্যার সমাধান করতে পারব না।···পুঁজিবাদী সমাজ, জমিদারী সমাজ, আমলাতন্ত্রীসমাজের জোয়ালের নিচে মানবজাতি যে জ্ঞানভাণ্ডার জমিয়েছে, প্রলেতারীয় সংস্কৃতিকে হতে হবে তারই সুনিয়মিত বিকাশ।'

'···সর্বহারার সংস্কৃতি (প্রগতি বা দলিত বা ব্রাত্য সাহিত্যও) তো আকাশ থেকে পড়েনি। মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির, এককথায় মানবচিন্তার দুই সহস্রাধিক বছরের বিকাশের মধ্যে যা উৎকৃষ্ট, প্রত্যেক যুগের সবচেয়ে সেরা অংশগুলিকে আত্মস্থ করে এবং সেগুলিকে ঢেলে সাজিয়েই সর্বহারার যে-সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তা-ই তো সর্বোৎকৃষ্ট হবে? বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করাই লক্ষ্য হলেও বুর্জোয়া যুগের মূল্যবান সুকৃতিও বর্জন করেনি, তাকেও

যথাযথ মূল্যে আত্মস্থ করে নিয়ে ঢেলে সাজিয়েছে সর্বহারার সংস্কৃতি। এই সব বাস্তব ও ঐতিহাসিক কারণেই সর্বহারার সংস্কৃতিই সর্বোৎকৃষ্ট।' সর্বহারার সংস্কৃতিই যেমন সর্বোৎকৃষ্ট অথবা ঘুরিয়ে বললে সর্বকালের সর্বদেশের শিল্পসাহিত্য তথা সংস্কৃতির সর্বোৎকৃষ্ট অংশগুলি সামগ্রিকভাবেই যেমন সর্বহারার শিল্প-সাহিত্য তথা সংস্কৃতি—তেমনি সর্বহারার সাহিত্য, প্রগতি সাহিত্য, দলিত সাহিত্য বা ব্রাত্য সাহিত্যও বিভিন্ন দেশকালপাত্রের সৃষ্ট সর্বোৎকৃষ্ট অংশগুলির অনন্য সমাহার।

সর্বহারা, দলিত, ব্রাত্য : আমাদের বিনম্র বিবেচনায় সমার্থবোধক এই শব্দগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। শিল্প-সাহিত্যের উপভোগ্যতা ও মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এই শব্দগুলির একটির মধ্যেও হীনম্মন্যতার লেশমাত্র নেই, যদিও আমাদের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মাঝারি মানের চেতনার স্তরে সর্বহারা দলিত ও ব্রাত্য শব্দগুলি কমবেশি অংশত অপকর্ষের ব্যঞ্জনা বহন করে হয়তো প্রচ্ছন্নরূপে লেগে আছে।

'প্রগতি' শব্দটির মধ্যে অবশ্য উত্তরোত্তর ভালোর ও অগ্রণী চেতনার এবং উৎকৃষ্ট সৃজনশীলতার লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হওয়ার আশাবাদী প্রত্যয়টিই সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। এই শব্দটিতে ধারাবাহিকতার ভাবটি অর্থাৎ ইতিহাসের গতিপথের অভিব্যঞ্জনাও লক্ষণীয়।

'দলিত' বা 'ব্রাত্য' 'কনসেপ্ট' (বা ভাবধারণা) নিয়ে কোনো বিতর্ক বা সংশয়ের অবকাশ নেই। সেই 'কনসেপ্ট' 'সর্বহারা'-র 'কনসেপ্ট'-এর সঙ্গে মূলত অভিন্ন। বিশেযত, 'সর্বহারা'-র আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংজ্ঞার্থও সুবিদিত—সর্বহারা তাঁরাই, শৃঙ্খল ছাড়া যাঁদের হারানোর কিছু নেই কিন্তু জয় করার জন্য পড়ে আছে তামাম দুনিয়া। সর্বহারা বলেই তো তাঁরা শোষিত-লাঞ্ছিত-দলিত। সর্বহারা বলতে স্বতন্ত্র কোনো জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র বোঝায় না। কোনো বিশেষ দেশকাল তথা ভূগোল বোঝায় না। বিশ্বব্যাপী যে-কোনো দেশকালের শোষিত জনগণকেই সর্বহারা বলতে পারি। আত্মপ্রকাশে উন্মুখ কিন্তু অপ্রকাশের বেদনায় বিদ্ধ মূঢ় ম্লান মূক মুখগুলি থেকেই সর্বহারার ঠিকানা জানা হয়ে যায়। বস্তুত, সর্বহারার কোনো দেশও নেই। এই 'সর্বহারা' শব্দটি দিয়েই চরাচরব্যাপী হ্যাভ-নটসদের চিহ্নিত করতে পারি।

তবু লক্ষণীয়, সর্বহারার সাহিত্য বা সংস্কৃতি কথাটা বহুল-প্রচলিত হয়নি, বরং 'প্রলেতারীয়' শব্দটি আন্তর্জাতিক পরিচিতিবশত বহুজনবিদিত। 'ব্রাত্য' ও 'দলিত'-র মধ্যে 'দলিত' শব্দটি অপেক্ষাকৃত দ্রুত দেশের বিভিন্ন রাজ্যে

প্রসারলাভ করেছে। 'দলিত' শব্দটির মধ্যে হীনম্মন্যতা ও অপকর্ষবোধ থাকলেও ('দলিত'-প্রবক্তারা নিজেরাই তা বলেন) অপমানিতের ক্ষোভ-জ্বালা-ক্রোধজনিত প্রতিশোধস্পৃহায় তার একটি আগ্নেয় অঙ্গীকারও অনুভবগম্য। রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণী অভিশাপবর্ষণে গলিত লাভার ভয়ংকরতায় পর্য-বসিত :

চরণে দলিত হয়ে
ধুলায় সে যায় বয়ে
সেই নিম্নে নেমে এসো নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ
অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান।

সেইজন্যই 'দলিত-আন্দোলন' মনে রেখে 'দলিত-সাহিত্য'-এর প্রবক্তারা 'দলিত' শব্দটির সঙ্গেও দুর্মোচ্য মোহজালে জড়িত। শব্দটির প্রেরণাসঞ্চারী তথা প্রণোদনা-সামর্থ্য তীব্র। একই সঙ্গে শব্দটি 'প্ররোচনা'-মূলকও বটে।

তাই দলিত শব্দটি যত-না প্রাণিত ও প্রণোদিত করে, তার চেয়েও বেশি করে প্ররোচিত—কিছুটা কি প্রতিহিংসা-পরায়ণও? বলে না— 'গড়ো', বলতে চায়—'ভাঙো'! গঠনের বা নির্মাণের আগে অবশ্য প্রচলিত শোষণ-কাঠামোটাকে ভেঙেফেলাই দরকার হয়। বিপ্লবের ধ্বংসাত্মক দিকটিই প্রাথমিক স্তরে দলিত-পন্থীদের কাম্য বলে মনে হতেই পারে। জীর্ণ পুরাতন প্রবঞ্চনার জাত-ব্যবস্থাকে আগে আক্রমণ করো, নির্মূল করো : তারপর শুরু হবে নির্মাণের, নব-নির্মাণের, নব-জাগৃতির অধ্যায়।

বস্তুত, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক স্তরের যে-আন্দোলন, সেই আন্দো-লনের ক্ষেত্রে 'দলিত' শব্দটি রণধ্বনি-রূপে যতটা প্রযোজ্য, সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে—যে-স্তরে প্রধানত সৃষ্টি-ই কাজ, যে ক্ষেত্রটি একই অর্থে রণক্ষেত্র নয়, সেখানে শুধু উত্তেজনা-প্ররোচনা-প্রতিহিংসা মূলধ্বনি বা মর্মধ্বনি হতে পারে কি না, 'দলিত' (শব্দ)-পন্থীদের তা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

বিশ্বের ইতিহাসে বিভিন্ন দেশে-কালে নানা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব-প্রেরণায় বহু শিল্প-সাহিত্যের নির্মাণ দেখা গেছে। সেই সব সৃষ্টির দেশকালোত্তীর্ণ আবেদনময় অংশ কতটা? এই ধরনের যাবতীয় সৃষ্টির কমবেশি ঐতিহাসিক মূল্য ও গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু সমকালকে সন্তুষ্ট করেও সেই সময়কে ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে আসতে পারে বিরলসংখ্যক শিল্প ও সাহিত্যের নির্মাণ।

'দলিত' মানুষের আত্ম-আবিষ্কার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন বহুস্তরান্বিত।

সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে তার পথনির্দেশ ও পুষ্টি-সাধনের জন্য শিল্প-সাহিত্যের তথা সাংস্কৃতিক স্তরের কর্মকাণ্ডও পাশাপাশি চালিয়ে যেতে হবে, তবু কান্না-ঘাম-বঞ্চনা ও সংগ্রামের বৃত্তান্ত ছাড়াও 'দলিত' নরনারীর ভাবনাবেদনা, রাগ-অনুরাগ, বিচ্ছেদ-মিলনের সূক্ষ্ম অনুভব-অন্তর্দ্বন্দ্বের কালজয়ী শিল্পরূপ ও মৃত্তিকালগ্ন জীবনের গান ও মহাকাব্যও কি ঈপ্সিত নয়?

সেইসব কালোত্তীর্ণ সৃষ্টিকে তাৎক্ষণিক সমকালীনতা দিয়ে, নিত্যনবীন নরনারীর রসোত্তীর্ণ জীবনসংগীতকে 'দলিত' অভিধার ঘেরাটোপে বেঁধে রেখে লাভ কী? এইভাবে নিজেকে সংকীর্ণ-সীমিত লক্ষ্যের দিকে অটল-অভিমুখী রাখাকে শোচনীয় আত্ম-খণ্ডন ছাড়া আর কী-ই বা বলা যাবে?

শিল্প-সাহিত্যের উজ্জীবনী সামর্থ্য সামাজিক আন্দোলনকেও উজ্জীবিত করতে পারে, করেও থাকে, কিন্তু সেটাই তো আবার শিল্প-সাহিত্যের একমাত্র ও চরম লক্ষ্যরূপে নির্ধারিত হতে পারে না। মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের জীবদ্দশায় রচিত মার্কসীয় সাহিত্যপ্রচেষ্টাগুলির সংকীর্ণ উদ্দেশ্যমূলকতার কঠোরতম সমালোচক ছিলেন। দুজনেরই প্রিয় স্রষ্টাদের মধ্যে ছিলেন কালোত্তীর্ণ সফোক্লিস, গ্যেটে, শেক্‌সপিয়ার প্রমুখ। এই ধরনের মহান স্রষ্টা যাঁরা, মানবমহিমার অন্বেষণ ও প্রতিষ্ঠাই তাঁদের সারা জীবনের সাধনা : অনিশ্চিত পারিপার্শ্বিক বা অদৃষ্টের সঙ্গে পুরুষকার বা ব্যক্তিত্বের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের কবিতাময় নাট্যিক বিশ্লেষণ ও অসহ্য উৎকণ্ঠার চমকপ্রদ শিল্পকীর্তিই তাঁদের প্রতিভার অবিনাশ স্বাক্ষর।

এই মহৎ স্রষ্টাদের কেউ স্বদেশ ও সমকালের প্রতি আদৌ উদাসীন ছিলেন না, বরং তাঁদের সৃষ্টিতেই স্বদেশ ও সমকালের তাৎপর্য গভীরভাবে বিধৃত। তবু তাঁরা দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বপথিক ব্যক্তিত্ব।

সুস্থ, সামাজিক আন্দোলনের, যে-কোনো প্রগতি-আন্দোলনের জয়কামনায় সুস্থ ও প্রগতিশীল মানুষের অণুমাত্র দ্বিধাসংশয়ের কারণ নেই। দলিত-আন্দোলনের তথা অস্পৃশ্যতা-বিরোধী অভিযানের পূর্ণতম বিজয় আমাদের কাঙ্ক্ষিত। সেই আন্দোলনে শিল্প-সাহিত্য তথা সংস্কৃতির হাতিয়ার-ভূমিকাও আমাদের একান্তরূপেই কাম্য। কিন্তু, সেখানেই সর্বহারার সাহিত্য-সংস্কৃতি, প্রগতিসাহিত্য, দলিত বা ব্রাত্য সাহিত্য— যে নামেই তাকে ডাকা যাক, সেই সর্বোৎকৃষ্ট সৃজনমাহাত্ম্যের ভূমিকা নিঃশেষ হতে পারে না।

যে-কোনো ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ব্যক্তিসংস্থা-প্রতিষ্ঠান-পার্টির নামে যে-কোনো ভাবে-ভঙ্গিতে-পদ্ধতিতে জাতপাত-অস্পৃশ্যতা-সাম্প্র-

দায়িকতাকে প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে উস্কানি বা মদতদানের যাঁরা বিরোধী (মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা তো ঘোষিতভাবেই বিরোধী), তাঁরা অবশ্যই দলিত আন্দোলন ও একইসঙ্গে দলিত সাহিত্য-আন্দোলনের মর্মবস্তু ও অভিমুখ সযত্ন সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করে নিতে চাইবেন। 'দলিত' প্রসঙ্গে যাঁরা প্রবক্তা, তাঁদের বিভিন্ন রচনা ও গ্রন্থে 'দলিত' বিষয়ে মত, মন্তব্য ও বক্তব্য পাওয়া যায়। তাঁদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে প্রাসঙ্গিক মূল্যায়নও করা হয়েছে। তবে, ড. কমলাকর গঙ্গাবানে তাঁর একটি প্রবন্ধে 'দলিত' প্রবক্তাগণের বক্তব্য পনেরোটি সূত্রাকারে একত্র-গ্রথিত করায় দলিত-জিজ্ঞাসুর মনঃসংযোগ সেখানে নিবদ্ধ হওয়া উচিত। তা হলে আমাদের প্রাসঙ্গিক মূল্যায়নগুলির গ্রহণযোগ্যতা বিচার করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। তাঁর পঞ্চদশ-সূত্র নিম্নোক্তরূপ :

১. দলিত সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হল দলিত সম্প্রদায়ের সমস্যার অনুধাবন এবং তার কারণের বিশ্লেষণ এবং সমাজের সেই সকল এগিয়ে-থাকা সংগঠনকে প্রেরণা জোগানো যারা এইসব সমস্যার সমাধানে সাহায্য করবে।

২. দলিত সাহিত্য দলিত সম্প্রদায়সমূহকে ঐক্যবদ্ধ করতে চায় এবং উৎসাহ জোগায় সামাজিক বিচলমানতায় ও সামাজিক বিবর্তনে।

৩. এই সাহিত্য দলিত জীবনের মূল্যবোধ ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করে।

৪. এই সাহিত্য সাম্যবাদী মতাদর্শ ও মানবতাবাদী চিন্তার প্রসার ঘটায়।

৫. প্রাথমিকভাবে দলিত সাহিত্য দলিত জনগণের জন্য দলিত জনগণের সাহিত্য এবং যে-কোনো মূল্যে দলিতের স্বার্থ রক্ষা করে।

৬. দলিত সাহিত্য মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে দলিত সম্প্রদায়ের দুঃখ এবং যন্ত্রণা, প্রতিবাদ এবং সংগ্রামের ব্যাখ্যা করে। তাই দলিত সাহিত্য দলিত বিপ্লবেরই ফল।

৭. এটা কেবলমাত্র দলিতের দুঃখ ও যন্ত্রণা-বিষয়ক সাহিত্যই নয়, এই সাহিত্য দলিতের সংঘবদ্ধ ও অসংঘবদ্ধ সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি দেয়। এইজন্য একে দলিতের সামাজিক সংগ্রামের দিশারী বলা যায়।

৮. ড. আম্বেদকরের দর্শনই দলিত লেখকদের ক্ষেত্রভূমি। তাঁর দর্শন সমাজ-পরিবর্তনের দর্শন। সেই কারণে যে-সকল সাহিত্য ও সংস্কৃতি অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করে দলিত সাহিত্য তার বিরোধী। দলিত সাহিত্য আশা প্রকাশ করে—মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এক জাতপাতহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার।

৯. দলিত জনগণই দলিত লেখকদের রচনাক্ষেত্র। কারণ দলিত সম্প্রদায় আজকের সমাজে বিভিন্ন অবদমন এবং অবিচার ভোগ করে চলেছে। এই জাত অসহায় অশিক্ষিত এবং বিভিন্ন প্রথার শিকার। সেইজন্য দলিত সাহিত্য চায় দলিত সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে।

১০. দলিত সাহিত্য বিদ্যমান অভ্রলোকদের গোলকধাঁধার মায়াজাল ছিন্ন করতে চেষ্টা করে।

১১. এই সাহিত্য হিন্দু-মানসিকতা ও হিন্দু-সংস্কৃতির সমালোচনা করে।

১২. এই সাহিত্য সামগ্রিক ভারতীয় সাহিত্যের পরিপূরক।

১৩. দলিত সাহিত্যের লক্ষ্য হল—সাহিত্য ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন। সামাজিক দায়িত্বপালন এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যগঠন এর মূল লক্ষ্য। দলিত সাহিত্য সামগ্রিক স্রোতের একটি অংশ মাত্র। এই সাহিত্য তার সৃজনশীলতায়, গঠনে, আদলে এবং ভাষায় মান বৃদ্ধি করে। একই সঙ্গে গণমাধ্যমেরও মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

১৪. দলিত সাহিত্যের ঝোঁক লক্ষ করা যায় তার অভ্যন্তরীণ দুঃখবাদী উপাদান ও হীনম্মন্যতায়।

১৫. দলিত সাহিত্য ব্যক্তিগত ও আন্তঃসাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলি প্রতিরোধ করে। সেই কারণে এই সাহিত্যকে কখনও কখনও যান্ত্রিক এবং প্রাণহীন মনে হয়।

উদ্ধৃত সূত্রগুলির চতুর্থটি নানা কারণে সর্বাধিক প্রণিধানযোগ্য। কেননা, 'দলিত সাহিত্য' সত্যিই যদি প্রতিশ্রুতিমতো 'সাম্যবাদী মতাদর্শ ও মানবতাবাদী চিন্তার প্রসার' ঘটাতে চায়, তা হলে অবশিষ্ট সূত্রগুলির কিছু কিছু সংশোধন, পরিবর্জন, পরিবর্ধন প্রভৃতি অনিবার্য হয়ে পড়ে।

ইতিপূর্বে দলিত-বিশেষজ্ঞ সুপণ্ডিত ড. অনিল বিশ্বাসের একটি প্রবন্ধের উদ্ধৃতি সহ আমরা যে-মূল্যায়ন যোগ করেছি, তা-ও মনে রাখা ভালো। ড. বিশ্বাস ফয়েরবাখ, মার্কস ও লেনিনের অভিমত উদ্ধৃত করেছেন, গোর্কির 'মা' উপন্যাসটির উল্লেখ করেছেন, সোভিয়েতের সাহিত্যভাবনার সূত্রে 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম'-এর প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন এবং ভারতবর্ষে সোভিয়েত তথা মার্কসবাদী সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বের প্রয়োগ দলিত সাহিত্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যরূপে চিহ্নিত করেছেন বলেই মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত প্রাসঙ্গিক পরিচয় আমাদের জেনে নিতে হয়েছে। তাতে দেখা গেল, দলিত (বা ব্রাত্য) সাহিত্যপন্থীদের মধ্যে মতাদর্শঘটিত বিভ্রমও বিদ্যমান, যা তাঁদের

পরস্পরবিরোধী ঘোষণায় প্ররোচিত করছে।

ড. গঙ্গাবানেও তাঁর প্রদত্ত সূত্রাবলির চতুর্থটিতে 'সাম্যবাদী মতাদর্শ ও মানবতাবাদী চিন্তার প্রসার' দলিত সাহিত্যের লক্ষ্যরূপে নির্দেশ করায় একই ধরনের সমস্যা তৈরি হয়েছে। সাম্যবাদী ও মানবতাবাদী কোনো মনুষ্যগোষ্ঠী কিভাবে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের 'মানসিকতা ও সংস্কৃতি'কে আক্রমণের লক্ষ্যরূপে বেছে নিতে পারেন? কিন্তু একাদশ সূত্রে গঙ্গাবানে লিখেছেন, 'দলিত সাহিত্য হিন্দু মানসিকতা ও হিন্দুসংস্কৃতির সমালোচনা করে'।

হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম, খ্রীস্টান প্রভৃতি কোনো সাম্প্রদায়িক মানসিকতা ও সংস্কৃতির প্রতি একজন সাম্যবাদীর কোনো বিশেষ ক্রোধ বা ঘৃণা থাকার কথা নয়। এক্ষেত্রে যদি ধরে নিই, 'জ্ঞাতিশত্রুই বড়ো শত্রু', তা হলে সেই মানসিকতা ও সংস্কৃতিও আবার কোনোমতেই বস্তুনিষ্ঠ বা বৈজ্ঞানিক হতে পারছে না। যে-কোনো ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও মৌলবাদ, বস্তুত যে-কোনো মনুষ্যত্ববিদ্বেষী কদাচারই ঘৃণার যোগ্য বলে আমরা মনে করি।

তা ছাড়া বিবেকানন্দ, গান্ধী প্রমুখের বক্তব্য অনুসরণ করে আমরা দেখেছি, 'হিন্দু' নামে কোনো ধর্মের উল্লেখই কতদূর যুক্তিসংগত, তা-ও বিতর্কের বিষয়। 'দলিত সাহিত্য' যদি 'মানবতাবাদী চিন্তার প্রসার কামনা' করে, তা হলে বেদ-উপনিষদ-ব্রাহ্মণ থেকে মধ্যযুগের ভারতীয় সন্তগণ সহ বাউলের সাধনা পর্যন্ত মানবতাবাদী চিন্তার যে-ঐশ্বর্য আমরা সংক্ষেপে আভাসিত মাত্র করেছি, তার বিস্তারিত পঠনপাঠন-অনুশীলন-প্রসারের কাজ দলিত সাহিত্যের প্রাথমিক কর্তব্য হয়ে ওঠে। বেদ, উপনিষদ, ব্রাহ্মণ, মহাভারত প্রভৃতি সাহিত্যকর্মের মধ্যে বিশেষভাবে 'হিন্দুত্বে'র কিছু নেই। ভারতীয়তা ও হিন্দুত্ব যে সমার্থক নয়, সেই কথাটা ভুললে চলবে না। আচার-অনুষ্ঠানমূলক অংশ, মন্ত্রাদি প্রভৃতি সম্পূর্ণ বর্জন করলে তো গভীর কবিত্বময় মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া আর কিছুই থাকে না এই সব স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তিতে।

অষ্টম সূত্রে বলা হয়েছে—ড. আম্বেদকরের দর্শনই দলিত লেখকদের ক্ষেত্রভূমি। তাঁর দর্শন সমাজ-পরিবর্তনের দর্শন'।—বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন মনীষীপ্রবর ড. আম্বেদকরের জীবন ও কর্মকাণ্ডের পরিচয় দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক-জনই বা রাখেন? তিনি কোনো সুসম্বদ্ধ দর্শনের প্রবক্তা নন। তেমন দাবিও তিনি করেননি। আমাদের মতো পিছিয়ে-থাকা ও পিছিয়ে-রাখা সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যেই জাতীয় মনীষিবৃন্দ কাজ করে থাকেন। মনীষীপ্রবর ড. আম্বেদকর আমাদের দেশের পটভূমিতে সর্বাধিক জরুরি

কাজগুলির অন্যতম প্রধান একটি কাজে আত্মোৎসর্গ করেন এবং সে-কাজে আত্মোৎসর্গের জন্য সহমর্মী সকলকেই আহ্বান জানান :

'সামাজিক পরিবর্তন প্রয়োজন কিন্তু ব্রাহ্মণ নয় এমন বর্ণহিন্দুরা এখনো যথেষ্ট দুর্বল অবস্থানে রয়েছে। আমরা যদি এদের সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করি তাহলে সেই সমস্যায় পড়ব যে সমস্যায় এক চাষী পড়েছিল, নিজের জমি চাষের জন্য প্রতিবেশীর ওপর নির্ভর করার ফলে। পাঠ্যবইতে ভরতপাখি এবং তার ছানার গল্পে আমরা তা পড়েছি।

'অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং সমতা প্রতিষ্ঠার যে কাজ আমরা হাতে নিয়েছি তা আমাদেরই করতে হবে, অন্যেরা করে দেবে না। আমাদের জীবন অর্থময় হয়ে উঠবে যদি আমরা মনে করি এই কাজের জন্যই আমাদের জন্ম হয়েছে এবং এই কাজে সৎভাবে নিযুক্ত হই। আসুন সকলে এই কাজে নিজেদের উৎসর্গ করি।'

ড. আম্বেদকরের নামে সমাজ ও সাহিত্যের কোনো অংশেই বিচ্ছিন্নতাবাদী ধারণাকে প্রশ্রয়দান তাঁর সমগ্র জীবনসাধনার বিরুদ্ধেই চরম অসম্মান। জাতীয় সংহতি কথাটা বহুব্যবহারে জীর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু 'অপমানিত'কে সম্মানিত করার লক্ষ্যে তাঁর কর্মকাণ্ড নিয়োজিত হলেও তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ড সমগ্র দেশের স্বার্থেই—'একদিকে হিন্দু-সমাজের এই অসমতায় ব্যক্তি বিশেষের উন্নতি যেমন ব্যাহত হয় তেমনই সমাজের প্রগতিও থমকে যায়। আবার অন্যদিকে মানুষের ভেতরের শক্তিকে উদ্দীপিত হতে দেয় না, আড়াল করে রাখে। দুভাবেই, চতুর্বর্ণ প্রথার জন্য উদ্ভূত এই অসমতা হিন্দু সমাজকে দুর্বল করেছে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।

'অতএব, হিন্দু সমাজকে যদি দৃঢ় করতে হয়, তাহলে এই চতুর্বর্ণ প্রথাকে ও অস্পৃশ্যতাকে নির্মূল করতে হবে এবং সমাজকে একটি বর্ণ এবং সমতা, এই দুটি নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অস্পৃশ্যতা দূর করার পথই হলো হিন্দু সমাজকে উজ্জীবিত করার পথ। অতএব আমি বলতে চাই এই কাজ শুধু আমাদের নিজেদের জন্যই নয় সমগ্র দেশের স্বার্থেই।'

এ-বিষয়ে দেশের মার্কসবাদীদের তথা বামপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ আম্বেদকর জন্মশতবার্ষিক অনুষ্ঠানের একটি ভাষণে বলেছিলেন :

'The authorities provided reservation, the other aspects of socio-economic and political and cultural oppression was

not get rid of the way in which this whole century's long oppression and the resultant backwardness of the majority of people can be ended in multi pronged attack. Here we of the left movement have a clear prescription of an integrated attack on the precapitalistic society of which caste is a very important bar, but only a bar. The staggering caste oppression can not be singled out, cannot be separated from the attack on the economic aspects, the political aspects and cultural aspects. A multi pronged attack against the old society, against the caste dominated, the landlord dominated and anti-democratic full scale is done. Such an approach should be adopted. This is what we of the left movement have proposed. '

অন্যত্র ই. এম. এস. লিখেছেন :

'মানবসভ্যতার অগ্রগতি সাধনে দাসপ্রথার ভূমিকা সম্পর্কে মার্কসের প্রাজ্ঞ সহযোগী ফ্রেডারিক এঙ্গেলস যে সুনিপুণ বিশ্লেষণ রেখেছেন এ প্রসঙ্গে তার উল্লেখ হবে এক শিক্ষণীয় বিষয়। এঙ্গেলসের মতানুসারে গ্রামীণ গোষ্ঠী ব্যবস্থার বাইরে উন্নয়নশীল গোষ্ঠীগুলির মধ্যেই দাসপ্রথার উৎপাদনে অধিকতর বৈচিত্র্য ও শিল্প-সূক্ষ্মতা এনে উৎপাদনের মূল অঙ্গ হয়ে উঠলো। যদিও শেষে তাদের ধ্বংসের অন্যতম কারণও হলো এই দাসপ্রথাই। দাসসমাজের যে ধ্বংস সম্পর্কে এঙ্গেলস ইঙ্গিত করেছেন তা তীব্র সংঘর্ষের মধ্য থেকে দাসসমাজের অবলুপ্তি ঘটিয়ে সামন্তসমাজের আবির্ভাব ত্বরান্বিত করলো : আবার সামন্ততন্ত্রেও তিক্ত সংগ্রামের ভিতর দিয়ে সামন্তবাদ থেকে সমাজের পুঁজিবাদে উত্তরণ ঘটল।'

মার্কসের প্রতিভাধর বন্ধু সতর্কতার সঙ্গে বলেছেন :

'যতই আপাত-বিরোধী এবং প্রচলিত ধ্যানধারণায় বিরোধী উক্তি বলে মনে হোক না কেন, আমরা বলতে বাধ্য যে, সেযুগের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-বিকাশের একটি পর্যায়ে দাসব্যবস্থা ছিল একটি উন্নতস্তর। কারণ একথা সত্য যে মানুষ মানুষ হয়েছে পশুত্বের পর্যায় অতিক্রমণ করে, বর্বরতার বন্ধন থেকে নিজেকে সে মুক্ত করেছে পশুশক্তি প্রয়োগ করেই। যেখানেই প্রাচীন গ্রামীণ গোষ্ঠীগুলি অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছে সেখানেই তারা যুগ যুগ ধরে নির্মমতার পাশবশক্তির দানবীয় ক্রীড়ার ভিত্তিভূমি রচনা করেছে স্বেচ্ছাচারী স্বৈরতন্ত্রের এ চিত্র সর্বত্র-প্রাচ্যের ভারত থেকে রাশিয়া কোথাও বাদ নেই।'

ভারতেও দেখা যায়, তার প্রাগৈতিহাসিক বর্বর সমাজ ভেঙে গিয়েছিল।

এখানেও মানুষ 'নিজেকে বর্বরতা থেকে মুক্ত করার জন্য প্রায় পশুশক্তির উপায় ব্যবহার করেছিল'। কিন্তু এখানে ইয়োরোপ থেকে ভিন্নভাবে সেটাকে ব্যবহার করা হয়েছিল ; ইয়োরোপে পশুশক্তির উপায় দাসত্বের রূপ গ্রহণ করেছিল ; ভারতে আমরা দেখতে পাই জাত সমাজের আত্মপ্রকাশ।

প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজ ও শাসকদের হাতে সেই সমাজের ধ্বংসসাধন সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণকালে মার্কস লিখেছেন :

'ঐসব লক্ষ লক্ষ শ্রমপরায়ণ পিতৃতান্ত্রিক ও নিরীহ সামাজিক সংগঠনগুলি অসংগঠিত হয়ে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, ডুবছে দুর্দশার এক সমুদ্রে, সে সংগঠনের সদস্যদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে যুগপৎ তাদের প্রাচীন সভ্যতা ও জীবিকা অর্জনের বংশানুক্রমিক উপায়—দেখতে এটা মানবিক অনুভূতির কাছে যতই পীড়াদায়ক হোক না কেন, একথা যেন না ভুলি যে, এইসব শান্ত সরল (আইডিলিক) গ্রামগোষ্ঠীগুলি যতই নিরীহ মনে হোক, প্রাচ্য ও স্বৈরাচারের তারাই দৃঢ়ভিত্তি হয়ে এসেছে চিরকাল, মনুষ্যমানসকে তারাই যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে বানিয়েছে কুসংস্কারের অবাধ ক্রীড়নক, তাকে করেছে চিরাচরিত নিয়মের ক্রীতদাস—হরণ করেছে তার সমস্ত মহিমা ও ঐতিহাসিক কর্মদ্যোতনা। যে বর্বর আত্মপরতা কোনো একটা শোচনীয় ভূমি খণ্ড আঁকড়ে শান্তভাবে প্রত্যক্ষ করে গেছে সাম্রাজ্যের পতন, অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান, বড় শহরের অধিবাসীগণের হত্যাকাণ্ড, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর চাইতে বেশি কিছু ভাবেনি এদের এবং দৈবাৎ আক্রমণকারীর লক্ষ্য পথে পড়লে যা নিজেও হয়ে উঠেছে আক্রমণকারীর এক অসহায় শিকার, সে আত্মপরতার কথা যেন না ভুলি। যেন না ভুলি যে এই হীন অচল ও উদ্ভিদ সুলভ জীবন, এই নিষ্ক্রিয় ধরনের অস্তিত্বের থেকে অন্যদিকে তার পাল্টা হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে বন্য লক্ষ্যহীন এক অপরিসীম ধ্বংস শক্তি এবং হত্যা ব্যাপারটিকেই হিন্দুস্থানে পরিণত করেছে এক ধর্মীয় প্রথায়। যেন না ভুলি যে, ছোট ছোট এই গোষ্ঠী ছিল জাতিভেদ প্রথা ও ক্রীতদাসত্বের দ্বারা কলুষিত অবস্থায়, প্রভুরূপে মানুষকে উন্নত না করে তাকে বানিয়েছে বাইরের অবস্থার পদানত, স্বয়ং-বিকশিত এই সমাজব্যবস্থাকে তারা পরিণত করেছে অপরিবর্তমান প্রাকৃতিক নিয়তিরূপে এবং এইভাবে আমদানী করেছে প্রকৃতির এমন পূজা—যা পশু করে তোলে লোককে, প্রকৃতির প্রভু যে মানুষ তাকে হনুমানদেবরূপী বানর ও সবলাদেবীরূপী গোরুর অর্চনায়

ভূলুণ্ঠিত করে অধঃপতনের প্রমাণ দিয়েছে।'

বিপ্লবী মার্কস এই ভারতের 'প্রাচীন' সভ্যতার ধবংসপ্রাপ্তির জন্য এক-ফোঁটাও চোখের জল ফেলেননি, অন্যদিকে মানবিকতাবাদী মার্কস ব্রিটিশদের হাতে যারা সবকিছু হারিয়ে ছিলেন সেই কোটি কোটি লোকের জন্য পূর্ণ সহানুভূতি ও সংহতির মনোভাব জ্ঞাপন করেছিলেন। বিপ্লবী চিন্তাবিদ মার্কসের এটা দেখার উপলব্ধি ছিল যে, এই শহর ধবংস, দুঃখকষ্ট, এই লক্ষ লক্ষ পুরুষ ও নারী ছিল এক নতুন সভ্যতার ইঙ্গিত—এই সভ্যতার আত্মপ্রকাশ ঘটবেই।

যীশুখ্রীস্ট উপদেশ দিয়েছেন, 'প্রতিবেশীকে ভালোবাসো' ('Love thy neighbour') 'কে প্রতিবেশী'—এই জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি একটি গল্প বলেন। গল্পটি থেকে যে-হিতোপদেশ বেরিয়ে আসে, তার মর্মার্থ : 'বিপন্ন মানুষমাত্রেই আমাদের প্রতিবেশী'।—শোষিত-লাঞ্ছিত মানুষমাত্রেই তো কার্যত দলিত। শোষিতদের মধ্যে নতুন শ্রেণীবিভাজন নতুন সমস্যা তৈরি করবে, এই আশঙ্কা অমূলক নয়।

বস্তুত, একই সঙ্গে শোচনীয় ও ঘৃণ্য জাতব্যবস্থায় আমাদের দেশ ও জাতি বিপর্যস্ত। বিদ্রোহী কবির ভাষায়, 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াত খেলছে জুয়া'।

এই বজ্জাতির কথা লিখে শেষ করা যায় না।

কোরআন শরিফ-এ আছে (আমার পঠিত সংস্করণের ৮৭০ পৃষ্ঠায়)—

'যদি পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ লেখনী হয় এবং সমুদ্র যদি হয় কালি,
তারও পরে আরো সপ্ত সমুদ্র তাকে সহায়তা করে—
তবু আল্লাহ-র বাণী সমাপ্ত হবে না।'

তথাকথিত 'হিন্দু'দের বর্ণাশ্রমের কুফলের কথাও বলে শেষ করা যায় না।

তার বিরুদ্ধে ফলভোগকারী 'অন্ত্যজ' অপমানিত মানুষের ক্ষোভ-জ্বালা ও প্রতিবাদ উত্তরোত্তর সংগঠিত আন্দোলনের চেহারা ও চরিত্র ধারণ করছে। সামগ্রিক শোষণমুক্তির আন্দোলনেরই এ-ও একটি দিক। কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবোধের চেতনা এই আন্দোলনকে স্পর্শ না-করুক। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে দলিতদের ব্যবহার করার প্রবণতাও ক্রমবর্ধমান। দলিতদের তথা-কথিত নেতারাও কি সত্যিই দলিত? তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান কী? এই সব প্রশ্ন মনে রেখেই দলিত-প্রবক্তাদের বক্তব্য বিচার্য।

marginal farmers, women and all these who are exploited politically and by, religion. By that token certainly Kanshi Rams, Mayavatis, Paswans, Jagjivan Rams, Shibu Sorens, Suraj Mandals and the NRIs of New York demonstrating for Ambedkar could not be called Dalits, given their lifestyle and riches ! The vagaries of Dalit politics suffer from the same lacuna which plagues Hinduism and Hindu Society.

আর, জন্মাবধি বাংলা সাহিত্য প্রতিবাদী স্বভাবেই দীপ্যমান। ভারতীয় সাহিত্যের মূল স্রোতের সঙ্গেও তা যুক্ত। বাংলা সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট অংশগুলি তো দলিত শ্রেণীর মানুষেরই সংগীত। সেই গানে যেমন আছে ভালোবাসার সুর, তেমনই আছে তার রণধ্বনিও। দলিত বা ব্রাত্য বা আর কোনো আলাদা নামে তাকে চিহ্নিত করাটাই কি অবান্তর নয়?

বিশেষত, দলিত আন্দোলনের অন্তর্নিহিত ‘প্যারাডক্স’-সন্ধানও যখন থেমে নেই—

'The paradox of the Dalit movement lies in its acceptance of the caste system of Hindu society on the one hand and the rejection of Manu's Varnashram on the other. You reject the ancient Vedas, Ramayana and Mahabharat but use their characters in works and speeches to highlight the age-old exploitation and oppression of the Dalits and the OBCs by the upper caste Hindus.'